রবীন্দ্রনাট্যধারার প্রথম পর্যায়

(১৮৮১ খ্রী: — ১৮৯০ খ্রী:)

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ, ডি [বাংলা]
উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

শাশ্বতকুমার ভট্টাচার্য

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং
২০০১

145867

0 7 JAN 2002

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১
প্রথম অধ্যায়	
রবীন্দ্রনাটকের অভিব্যক্তির ধারা	৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	
রবীন্দ্রনাথ কবি ও নাট্যকার	৯১
তৃতীয় অধ্যায়	
রবীন্দ্রনাটকের প্রথম পর্যায়ে পরিণত পর্যায়ের বীজানুসন্ধান	১৫১
চতুর্থ অধ্যায়	
রবীন্দ্রনাটকের প্রথম পর্যায় ও সমকালীন বাংলা নাটক	১৬৫
উপসংহার	১৯৮
গ্রন্থপঞ্জী ও পত্রপত্রিকা	২০১

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাট্য ধারার প্রথম পর্যায় হিসেবে আমরা ১৮৮১ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত সময়কালকে চিহ্নিত করেছি। অর্থাৎ 'রুদ্রচন্ড' থেকে 'বিসর্জন' পর্যন্ত আমাদের বিবেচনায় রবীন্দ্রনাট্য ধারার প্রথম পর্যায়। এই প্রথম পর্যায়ের নাটক গুলি অপরিণত নাটক বলে অবহেলিত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নাট্যাদর্শের কি কোনই আভাস মেলে না এই পর্যায়ের নাটক গুলিতে? আমরা জানি যে 'শারদোৎসব' (১৯০৮) রচনার মধ্যদিয়েই রবীন্দ্রনাথ নাট্যরচনার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব জগতে প্রবেশ করেছেন। সৃষ্টি করেছেন নিজস্ব রীতি। কিন্তু এই নিজস্ব রীতি তো হঠাৎ করে দেখা দেয়নি, এর পিছনে রয়েছে নিজেকে প্রস্তুত করার ক্রম প্রচেষ্টা। আমাদের চিহ্নিত রবীন্দ্রনাট্য ধারার প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যদর্শের পথ অনুসন্ধান করেছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং প্রস্তুত করেছেন নিজেকে। এই পর্বেই দেখা দিয়েছে তাঁর নিজস্ব নাট্যাদর্শের কোরক। রবীন্দ্রনাট্য ধারার প্রথম পর্যায়ে পরিণত পর্যায়ের বীজানুসন্ধান আমাদের এই অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য। এই সন্ধান চালাতে গিয়ে আমরা নাটকগুলিকে Form এবং Content দু'দিক থেকেই বিশ্লেষণ করেছি। এই বিশ্লেষণে উঠে এসেছে অপরিণতির মধ্যেও পরিণতনাট্যের কিছু চিহ্ন। বিশেষ করে আমাদের মতে 'প্রকৃতির পতিশোধ' নাটকেই রবীন্দ্রনাথ গেঁথে তুলতে পেরেছিলেন তাঁর নিজস্ব নাট্যাদর্শ।

রবীন্দ্রনাথের নাটক শুরু থেকেই একটি বিষয়বস্তুরই প্রকাশ ঘটিয়ে চলেছে আর তা হচ্ছে বন্ধনমুক্তির কথা অথবা আত্ম-অহং-এর অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তির কথা। এর পাশাপাশি দেখা দিয়েছে নাট্যচরিত্রগুলির মানসিক উত্তরণ এবং মানবিক উত্তরণের কথা। বিষয়বস্তুর এই প্রকাশ ক্ষীণভাবে শুরু হয়েছে প্রথম নাটক 'রুদ্রচন্ড' থেকেই। সূক্ষ্মভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় এই পর্বের কাহিনীকাব্যগুলিতেও ছড়িয়ে আছে তার ঈষৎ আভাস। এ কারণে আমরা কাহিনী কাব্যগুলিরও আলোচনা করেছি।

রবীন্দ্রনাট্য ধারার প্রথম পর্যায়ের বিশ্লেষণের সুবিধার্থে আমরা আলোচনাকে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত

করেছি। প্রথম অধ্যায় 'রবীন্দ্রনাটকের অভিব্যক্তির ধারা'। এই অধ্যায়ে 'রুদ্রচন্ড' থেকে 'বিসর্জন' পর্যন্ত নাটক গুলির আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে কাহিনীকাব্য গুলির। দ্বিতীয় অধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ কবি ও নাট্যকার'। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছে প্রথম পর্যায়ের কাব্য ও নাটক গুলির কথা। কবি রবীন্দ্রনাথ ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা কি কোন ভেদরেখা টানতে পারি? আমরা কি তাঁর কাব্যিক ভাবমন্ডল থেকে তাঁর নাটক সমূহকে সম্পূর্ণ পৃথক এক ভাবমন্ডলের ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করতে পারি? নাকি একটি ঐক্য নিরূপন করতে পারি রবীন্দ্রকাব্য আর রবীন্দ্রনাটকের মধ্যে? কাব্যবিষয় ও নাট্যবিষয় কি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে নাকি দু'টি ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুও হয়ে গেছে দু'রকম? প্রথম পর্যায়ের নাটক ও কাব্যের তুলনামূলক আলোচনায় এসবেরই মীমাংসা আমাদের কাছে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় 'রবীন্দ্রনাটকের প্রথম পর্যায়ে পরিণত পর্যায়ের বীজানুসন্ধান'। এই অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি যে প্রথম পর্বের নাটক গুলিতে পরিণত পর্বের বীজ কতটুকু এবং কিভাবে রয়েছে। চতুর্থ অধ্যায় 'রবীন্দ্রনাটকের প্রথম পর্যায় ও সমকালীন বাংলা নাটক'। রবীন্দ্রনাটকের প্রথম পর্যায়ের সমকালে অন্যান্য যে সমস্ত নাটক রচিত হয়েছে সেই সব নাটক থেকে রবীন্দ্রনাটক কতটুকু স্বতন্ত্র, সমকালীন নাট্যচর্চার সঙ্গে রবীন্দ্রনাটকের কোন যোগসূত্র আছে কিনা, যদি থাকে তবে যোগসূত্র কোথায় এবং যদি না থাকে তবে কোথায় রবীন্দ্রনাথের ভিন্নতা এইসবই আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র নাট্যকর্মের আলোকে আমরা তাঁর প্রথম পর্যায়ের নাটক গুলির পর্যালোচনা করেছি। এই পর্যালোচনার মধ্যদিয়ে আমরা দেখাতে চেয়েছি রবীন্দ্রনাট্য ধারার প্রথম পর্যায়ের নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথের পরিণত নাট্যের বীজ কতটুকু নিহিত রয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভ আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড: অঙ্কুশ ভট্ট-এর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। তাঁর প্রতিমুহূর্তের সহযোগিতা আমার কাজে প্রেরণা জুগিয়েছে। ড: অশ্রুকুমার সিকদার অভিসন্দর্ভের পান্ডুলিপি পাঠ করে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীভূদেব চৌধুরী, রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল, শান্তিনিকেতন পাঠভবনের শিক্ষক অনাথনাথ দাস, রবীন্দ্রগবেষক রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সর্বজিৎ সেনগুপ্ত, অধ্যাপক মৃণাল দাসগুপ্ত আমাকে বিভিন্ন সময় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করেছেন। তাঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের এবং শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের প্রতিটি কর্মীকে আমি ধন্যবাদ জানাই। তাঁরা সবাই আমাকে অকৃপণ ভাবে সাহায্য করেছেন। কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী, এখানে মূল্যবান কিছু গ্রন্থ দেখার সুযোগ পেয়েছি।

বিভিন্ন গ্রন্থ এবং পত্রিকার প্রতিলিপি সংগ্রহ করে দিয়ে সাহায্য করেছে বিশ্বভারতী সংগীতভবনের ছাত্রী সুস্মিতা গোলাম তন্বী। তার সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। আমার কলেজের অধ্যক্ষ মো: মোফাজ্জল হোসেনকে এবং কলেজ পরিচালনা পর্ষদের প্রতিটি সদস্যকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের প্রচেষ্টায় শিক্ষাকালীন ছুটি অনুমোদন হওয়ার কারণে আমার গবেষণার পথ সুগম হয়েছে। আমি আমার পরিবারের সকলের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আমার মা এবং বড়ভাই সুব্রত ভট্টাচার্যের অনুপ্রেরণা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এছাড়া আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে আমার বন্ধুবর আব্দুল কাদের সাফিলী, খয়বর আলী মিয়া, আরিফুল হক রুজু এবং রঞ্জন শর্মা। তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমাকে গবেষণা করার সুযোগ দেবার জন্য সর্বোপরি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাটকের অভিব্যক্তির ধারা

ক. রুদ্রচন্ড

রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক 'রুদ্রচন্ড'-এর রচনা কাল নিয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মন্তব্য আমরা দেখতে পাই। রবীন্দ্র রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের প্রথম খন্ডে(বিশ্বভারতী) গ্রন্থ পরিচয় অংশে উল্লেখ করা হয়েছে " 'রুদ্রচন্ড' কবির প্রথম নাটক (গীতিনাট্য নহে)। ইহা ১৮০৩ শকে (২৫ জুন ১৮৮১) প্রকাশিত হয়।" বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগে 'রুদ্রচন্ড' প্রকাশের যে তারিখ উল্লেখ আছে [25 June 1881 (শনি ১২ আষাঢ়)] প্রশান্তকুমার পালের মতে সে তারিখটি ভুল। তিনি মনে করেন গ্রন্থটি আষাঢ় মাসে নয় "বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়"।[১] ১৮৮১ সালে প্রকাশিত হলেও 'রুদ্রচন্ড' লেখা হয়েছিল অনেক আগেই। এর রচনাকাল নির্ধারণ করতে গিয়ে সমালোচকেরা দুটিভাগে বিভক্ত হয়েছেন। এই বিভাজনের সূত্রটি মিলেছে নাটকের 'উপহার' অংশ থেকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম নাটকটি উপহার দেন 'ভাই জ্যোতি দাদা'কে। 'উপহার' শিরোনাম দিয়ে লেখেন —

ভাই জ্যোতিদাদা

যাহা দিতে আসিয়াছি কিছুই তা নহে ভাই!
কোথাও পাই নে খুঁজে যা তোমারে দিতে চাই!
আগ্রহে অধীর হ'য়ে ক্ষুদ্র উপহার ল'য়ে
যে উচ্ছ্বাসে আসিতেছি ছুটিয়া তোমারি পাশ,
দেখাতে পারিলে তাহা পূরিত সকল আশ।
ছেলেবেলা হ'তে, ভাই, ধরিয়া আমারি হাত
অনুক্ষণ তুমি মোরে রাখিয়াছ সাথে সাথ।
তোমার স্নেহের ছায়ে কতনা যতন ক'রে
কঠোর সংসার হ'তে আবরি রেখেছ মোরে।
সে স্নেহ আশ্রয় ত্যজি যেতে হবে পরবাসে

তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে।
যতখানি ভালবাসি, তার মত কিছু নাই --
তবু যাহা সাধ্যছিল যতনে এনেছি তাই!

'সে স্নেহ আশ্রয় ত্যজি যেতে হবে পরবাসে' অর্থাৎ বিলেত যাত্রার পূর্বে 'রুদ্রচন্ড' রচিত হয় এই ধারণা সমালোচকদের। প্রশ্ন হচ্ছে কোনবার বিলেত যাত্রার পূর্বে 'রুদ্রচন্ড' রচিত? প্রথমবার না দ্বিতীয়বার? আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮-এ প্রথমবার বিলেত যাত্রা করেন।[১] দ্বিতীয়বার যাত্রা করেন ২২ এপ্রিল ১৮৮১।[২] যদিও এই দ্বিতীয়বার যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ বিলেত পৌঁছাতে পারেননি, ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের প্ররোচনায় মাদ্রাজ থেকেই ফিরে এসেছিলেন।

প্রথমবার বিলেত যাত্রার পূর্বে 'রুদ্রচন্ড' এর রচনার পক্ষে মত প্রদান করে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখেছেন, ''প্রবাসে যাইবার কথা উল্লেখ থাকায় মনে হয় যে ইহা বিলেত যাত্রা করিবার পূর্বে লেখা। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথমবার বিলেত যাত্রা করেন তখন তাঁহার বয়স সতেরো বৎসর, তাহার পূর্বে লেখা হইয়া থাকিলে, 'রুদ্রচন্ড' নাটিকাটিকে ষোল সতেরো বৎসর বয়সের লেখা বলা যায়।''[৩] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ''রুদ্রচন্ডের মুদ্রণকাল জানি, কিন্তু তাহার রচনা কাল সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।''[৪] ড: সুকুমার সেন- এর মতে, ''ইহা রবীন্দ্রনাথের আমেদাবাদ থাকাকালে প্রথমবার বিলেত যাত্রার আগে লেখা এমন অনুমান অপরিহার্য নয়। দ্বিতীয়বার বিলেত যাত্রার প্রারম্ভে ইহা রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল।''[৫] এছাড়া প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রুদ্রচন্ড' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বোলপুরে আসিয়া 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে যে কাব্য রচনা করেন (মার্চ ১৮৭৩) এই 'রুদ্রচন্ড' তাহারই নাট্যরূপ। নাটকের ভাষা অপরিণত। আমাদের মনে হয় বিলাত যাইবার পূর্বে তাড়াতাড়িতে নূতন কিছু সৃষ্টি-প্রেরণার অভাবে পুরাতন রচনাটিকে নূতন কলেবরে সাজাইয়া 'জ্যোতিদাদা'কে উপহার দিলেন।[৬]

প্রশান্তকুমার পাল এই মন্তব্যগুলো আলোচনা করে লিখেছেন—

> রবীন্দ্রজীবনী-কার 'নূতন কিছু সৃষ্টি-প্রেরণার অভাবে পুরাতন রচনাটিকে নূতন কলেবরে সাজানোর যে কথা লিখেছেন, আমাদের কাছে সেটিও খুব গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার অব্যবহিত পূর্বের কয়েকটিমাস রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সৃষ্টিশীল সময়। সন্ধ্যাসংগীত-এর প্রাথমিক কয়েকটি

> কবিতা, মাঘোৎসবের গান, বাল্মীকি প্রতিভা এবং 'সঙ্গীত ও ভাব' প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর সৃজনশক্তিকে এই সময়ে তিনি বিশেষভাবে অনুভব করেছেন। সুতরাং অন্যতম প্রিয়জন 'জ্যোতিদাদা'কে উপহার দেবার জন্য তাড়াহুড়োয় পুরোনো রচনাকে নূতন রূপ দিলেন এমন কথা মেনে নেওয়া শক্ত। সেই জন্যই উপহার কবিতায় পরবাসে যাওয়ার উল্লেখটিকে অবলম্বন করে প্রথমবার বিলাতযাত্রার কথাই ভাবতে হয়।[৮]

'রুদ্রচন্ড'-এর দুটি গানের ('বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল' এবং 'তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল') কথা উল্লেখ করে (যে গান দুটি রয়েছে 'মালতী পুঁথি'র 15/ ৮ক, 16/৮খ এবং 13/৭ক পৃষ্ঠায়) প্রশান্তকুমার পাল মন্তব্য করেছেন, ''মালতী পুঁথি-র ওই বিশেষ পৃষ্ঠা গুলিতে লেখা রুদ্রচন্ড-এর গানদুটি উক্ত নাটিকার রচনাকালের অন্যতম ইঙ্গিতবাহী।... গান দুটির রচনার সময়কালেই রুদ্রচন্ড গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল প্রথমবার বিলাতযাত্রার পূর্বেই এবং সম্ভবত 'উপহার' কবিতা-সহ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে প্রেরিত হয়েছিল।''[৯] প্রশান্তকুমার পালের এই যুক্তি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তাঁর সঙ্গে আমরাও একমত যে 'রুদ্রচন্ড'-এর রচনাকাল প্রথমবার বিলাতযাত্রার পূর্বে অর্থাৎ ১৮৭৮ এর ২০ সেপ্টেম্বরের পূর্বে।

'রুদ্রচন্ড' চৌদ্দটি দৃশ্যের একটি ছোট্ট নাটিকা। প্রথম দৃশ্য পর্বতগুহা, সময় রাত্রি। এই দৃশ্যে রুদ্রচন্ড তার মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার জন্য কাল ভৈরবের প্রতিমার সামনে প্রার্থনা করছে। রুদ্রচন্ডের . মনের আকাঙ্ক্ষাটি কি? আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে পৃথ্বীরাজকে হত্যা করা। কারণ, পৃথ্বীরাজ তাকে রাজ্যচ্যুত করেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য, অরণ্য। পিতা রুদ্রচন্ড তার কন্যা অমিয়াকে সাবধান করে দিয়ে বলছে চাঁদকবি যেন এই অরণ্যে না আসে। কারণ, চাঁদকবি পৃথ্বীরাজের সভাসদ। কিন্তু চাঁদকবি অমিয়ার ভাই-এর মত। তাই অমিয়ার করুণ আকূতি --

সে আমার আপনার ভায়ের মতন --
বল মোরে বল পিতা কেন দেখিবনা তারে!
কেন তার সাথে আমি কহিব না কথা!

রুদ্রচন্ড-এর অন্তরে রাজ্য হারানোর যন্ত্রণা। পৃথ্বীরাজের কারণেই আজ তার এই অরণ্যে নির্বাসন। আর তাই প্রতিশোধ নেবার জন্য রুদ্রচন্ড দৃঢ় সংকল্প --

এই বাহু যদি নাহি হয়গো অসাড়,
রক্তহীন যদি নাহি হয় এ ধমনী,

তবে এই ছুরিকাটি এই হস্তে ধরি
উরসে খোদিব তার মরণের পথ।

তৃতীয় দৃশ্য, অরণ্য। চাঁদকবি এসেছে অমিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। অমিয়া শঙ্কিত কখন পিতা রুদ্রচন্ড এসে পড়ে। দু'জনের কথোপকথনের মধ্যে রুদ্রচন্ড এসে উপস্থিত হয়। এরপর চাঁদকবির সঙ্গে রুদ্রচন্ডের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ এবং যুদ্ধে রুদ্রচন্ডের পরাজয়। এ সময় এক অশ্বারোহী দূতের প্রবেশ। এই দূত এসে জানায় রাজ্যে ভীষণ বিপদ উপস্থিত। এই খবর শুনে দূতের সঙ্গে চাঁদকবির প্রস্থান করে।

চতুর্থ দৃশ্যে কোন স্থানের উল্লেখ নেই। এই দৃশ্যে রুদ্রচন্ড ভীষণভাবে উত্তেজিত এবং অমিয়ার প্রতি ক্ষিপ্ত। এই উত্তেজনা এবং ক্ষিপ্ততা পূর্ববর্তী দৃশ্যের সূত্র ধরেই এসেছে। চাঁদকবির প্রতি অমিয়ার আকর্ষণের কারণেই অমিয়ার প্রতি রুদ্রচন্ড ক্ষিপ্ত। অমিয়াকে সে বলে, "দূর হ রাক্ষুসি, তুই এখনি দূর হ।" অমিয়া বুঝতে পারেনা কি তার অপরাধ। "চাঁদের সহিত দুটি কথা কয়েছিনু" তার জন্য এত শাস্তি ভোগ করতে হবে কেন? প্রতিশোধ স্পৃহার আগুনে রুদ্রচন্ড জ্বলছে তাই অমিয়ার করুণ মিনতি "ক্ষমা কর, ক্ষমা কর পিতা" তাকে তার সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারে না। কন্যাকে সে আদেশ করে, "-- শোন শেষ আদেশ আমার-- / দূর হ রে --।" পিতার এই নির্মম আচরণ কোমলপ্রাণ অমিয়া সহ্য করতে পারে না, সে মূর্চ্ছা যায়। এই দৃশ্যে স্থানের উল্লেখ না থাকলেও অমিয়ার একটি সংলাপে আমরা বুঝতে পারি দৃশ্যটি কোথায় এবং কখন সংঘটিত হচ্ছে --

অমিয়া। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর পিতা!
আজ রাতে দূর ক'রে দিওনা আমারে,
এক রাত্রি তরে দাও কুটীরে থাকিতে।

এই সংলাপই প্রমাণ করে যে স্থান হচ্ছে অরণ্যে রুদ্রচন্ডের কুটির এবং সময় রাত্রি।

পঞ্চম দৃশ্যে অমিয়া একা। স্থান রাজপথে প্রাসাদের সম্মুখে। রুদ্রচন্ড তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। অমিয়া 'শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবর', সারাদিন পথে পথে ঘুরছে "চাঁদ, চাঁদ, কোথা গেলে ভাইটি আমার" বলে। চাঁদকবির সন্ধানে সে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে চায় কিন্তু দ্বাররক্ষক তাকে ঢুকতে দেয় না। একজন পথিকের সঙ্গে অমিয়ার দেখা হয় পথিক তাকে বনের মধ্যে তার কুটীরে নিয়ে যায়।

ষষ্ঠদৃশ্য, স্থান শিবির, চাঁদকবি একা। এখানে চাঁদকবি অমিয়ার কথা ভাবছে, যুদ্ধ শেষ হলে নিষ্ঠুর পিতার হাত থেকে অমিয়াকে উদ্ধার করে তার নিজের কাছে রাখবে। একদিন রাজপুত ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে অমিয়ার বিয়ে হবে। এই চিন্তার মাঝে একজন দূতের প্রবেশ। দূত জানায় শত্রু খুব নিকটে চলে এসেছে।

এরপর শুরু হয় যুদ্ধের আয়োজন।

সপ্তম দৃশ্য, স্থান বন। একজন দূতের সঙ্গে রুদ্রচন্ডের কথোপথন। দূত জানায় 'রাজ রাজ মহারাজ মহম্মদ ঘোরী' তাকে প্রেরণ করেছে। পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করতে তিনি আসছেন। সৈন্যরা ক্লান্ত, এক রাত্রির জন্য তারা এই অরণ্যে আশ্রয় নিতে চায়। দূতের এই কথায় রুদ্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কারণ তস্করের মত আক্রমণে রুদ্রচন্ড বিশ্বাস করে না। তাই সে বলে যে, নগরে নগরে গিয়ে আমি ঘোষণা করে দেব --

ম্লেচ্ছ সেনাপতি এক মহম্মদ ঘোরী
তস্করের মত আসে আক্রমিতে দেশ।

শুধু 'তস্করের মত' অথবা 'ম্লেচ্ছ সেনাপতি'র কারণেই নয় রুদ্রচন্ডের ক্ষিপ্ততার পিছনে মূল কারণটি অন্য। যখন আমরা রুদ্রচন্ডকে বলতে শুনি —

মহম্মদ ঘোরী ?
কেন, আমার কি কাছে ছুরি নাই মূঢ়!
এতদিন বক্ষে তারে করিনু পোষণ,
প্রতি দন্ডে দন্ডে তারে দিয়েছি আশ্বাস।
আজ কোথা হতে আসি মহম্মদ ঘোরী
তাহার মুখের গ্রাস লইবে কাড়িয়া?

তখনই আমরা বুঝিতে পারি রুদ্রচন্ডের দীর্ঘদিনের যে লালিত আকাঙ্ক্ষা তা সে একাই পুরণ করতে চায়। পৃথ্বীরাজকে হত্যা করার তার যে সুদীর্ঘ বাসনা সেই বাসনা চরিতার্থ করার জন্য সে কারও সাহায্য নিতে প্রস্তুত নয়। এ আকাঙ্ক্ষা তার একান্ত আপনার। রাজ্য হারানোর নিদারুণ যন্ত্রণা যা রুদ্রচন্ডকে তিলে তিলে সংকল্পে দৃঢ় করেছে, প্রস্তুত করেছে তা সে অন্যকারও দ্বারা সংঘটিত হতে দিতে চায় না। রুদ্রচন্ডের এই সংকল্পের দৃঢ়তা সংগ্রাম মুখর মানুষের যা মানব সভ্যতা সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকেই বর্তমান তার কথা স্মরণ করায়। প্রতিটি মানুষ অন্তরে কিছু না কিছু আকাঙ্ক্ষা লালন করে যা সে একক শক্তিতে পুরণ করতে চায়, সেই চিরায়ত আকাঙ্ক্ষার এক ভিন্ন মাত্রিক রূপ রুদ্রচন্ডের চরিত্রের মধ্যে আমরা পেয়ে যাই। সপ্তম দৃশ্যটি রুদ্রচন্ডের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের এক চরম অবস্থান বলে আমরা মনে করি

অষ্টম দৃশ্য, পথ দিয়ে চলেছে পৃথ্বীরাজের সৈন্য, সেনাপতি এবং চাঁদকবি। নেপথ্য থেকে অমিয়ার গান ভেসে আসে, "তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল/ মুদিয়া আসিছে আঁখি তার।" চাঁদ কবির

কাছ থেকেই অমিয়া এ গান শিখেছে (তৃতীয় দৃশ্য)। এ প্রসঙ্গে তৃতীয় দৃশ্যের অন্য একটি গানের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। গানটি হচ্ছে, "বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল / প্রথম মেলিল আঁখি তার,/ চাহিয়া দেখিল চারিধার"। এই গানটিও অমিয়া শিখেছিল চাঁদ কবির কাছ থেকে। এই দুটি গানের দুই 'মালতীর ফুল'-এর অবস্থা দু'রকমের। তৃতীয় দৃশ্যের গানটিতে রয়েছে বসন্ত প্রভাতে একটি মালতী ফুল চোখ মেলে দেখছে জগতের সৌন্দর্য। চোখে প্রথম দেখার বিস্ময় - "একি হর্ষ - হর্ষ আজি গো"! -

আকাশ সুনীল আজি কিবা
অরুণ নয়নে হাস্যবিভা
বিমল শিশির ধৌত তনু
হাসিছে কুসুমরাজি গো -
একি হর্ষ - হর্ষ আজি গো !

অষ্টম দৃশ্যে সেই মালতীর ফুল 'তরু তলে ছিন্ন বৃন্ত'। আঁখি তার বন্ধ হয়ে আসছে। চারিদিকে চেয়ে দেখল—

শুষ্ক তৃণরাশি-মাঝে একেলা পড়িয়া,
চারিদিকে কেহ নাই আর,
নিরদয় অসীম সংসার।

এই মালতী ফুল অমিয়া নিজেই। তার জীবনের আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়েছে। আনন্দময় সংসার 'নিরদয় অসীম সংসারে' রূপান্তরিত। রূপক ব্যবহার পরবর্তী রবীন্দ্রনাটকের একটি ধর্ম, এখানে আমরা খুব প্রাথমিকভাবে তার ব্যবহার লক্ষ করি। চাঁদকবি অমিয়ার এই গান শুনতে পায় কিন্তু যুদ্ধযাত্রার কারণে থামতে পারে না। অমিয়া শুধু "চাঁদ, চাঁদ ভাই মোর" এটুকুই বলতে পারে। সৈন্যরা তাকে তাড়িয়ে দেয়। যুদ্ধযাত্রার এই নির্মম মুহূর্তে যে কেউ কারো নয় এই সত্যটি এই দৃশ্যে প্রস্ফুটিত। যেতে যেতে চাঁদকবি শুধু বলে যায় "অমিয়ারে ফিরে এসে -।" এই দৃশ্যটিতে পথের গতিশীল তার একটি বৈশিষ্ট্য চকিতে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। নাট্যদৃশ্যের গতিশীলতাও এরই মাধ্যমে ফুটে ওঠে।

নবম দৃশ্য, স্থান — নগর। এই দৃশ্যে রুদ্রচন্ডকে আমরা নগরের মধ্যে দেখতে পাই। রুদ্রচন্ডের মুখেই আমরা শুনতে পারি, "বেধেছে তুমুল রণ"। রুদ্রচন্ড খুঁজছে পৃথ্বীরাজকে। প্রার্থনা করছে —

ওরে সংগ্রাম দৈত্য শোণিত পিপাসী
সমস্ত হস্তিনা তুই করিস রে গ্রাস,
পৃথ্বীরাজকে রেখে দিস এ ছুরিকা তরে

কারণ পৃথ্বীরাজকে রুদ্রচন্ড নিজ হাতে হত্যা করতে চায়। সমস্ত নগরে যুদ্ধের ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়েছে, মানুষ ছুটছে। কোলাহলের মধ্যে রুদ্রচন্ড খুঁজছে পৃথ্বীরাজকে। এই দৃশ্যে নাট্যগতি আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

দশম দৃশ্য, পথ। এই পথের দৃশ্যে শুধু অমিয়া একা। তার একটি মাত্র সংলাপের মাধ্যমে এই দৃশ্যের সমাপ্তি। এই দৃশ্যে অমিয়ার মনের ভাব প্রকাশ পেয়েছে—

চলে গেল! — সকলেই চলে গেল গো!
দিন রাত্রি পথে পথে করিয়া ভ্রমণ
এক মুহূর্তের তরে দেখা হল যদি,
চলে গেল? একবার কথা কহিল না?
একবার ডাকিল না 'অমিয়া' বলিয়া?

অষ্টম দৃশ্যে চাঁদকবির যুদ্ধে যাওয়া, অমিয়ার সঙ্গে দেখা হওয়া, কথা বলতে না পারা- তারপর দশম দৃশ্যে অমিয়ার এই সংলাপ। এই সংলাপে উঠে এসেছে অমিয়ার যন্ত্রণাময় একাকী জীবনের কথা।

একাদশ দৃশ্য। এখানে স্থানের উল্লেখ নেই। কিন্তু ধারণা করে নিতে অসুবিধা হয় না যে দৃশ্যটি নগর পথেই সংঘটিত হচ্ছে। এই দৃশ্যটি ছোট। প্রথম নাগরিকের সংলাপের মাধ্যমে আমরা যুদ্ধের ফলাফল জানতে পারি—

সমাচার দাও সবে ঘরে ঘরে গিয়া
শুনিতেছি পরাজয় হয়েছে মোদের।

এ পরাজয় মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক পৃথ্বীরাজের। দ্বিতীয় নাগরিক আহ্বান জানাচ্ছে সবাইকে অস্ত্র হাতে নিয়ে নগর রক্ষা করার। তৃতীয় নাগরিক ঘরে ঘরে চিতানল জ্বালাতে বলছে, কারণ—

নগরশ্মশানে আজ রমণীরা যত
প্রাণ বিনিময়ে মান রাখিবে তাহারা।

বিজাতীয় রাজা মহম্মদ ঘোরীর হস্তিনা নগর দখল করার কারণে এই আহ্বান। জাত-ধর্ম খোয়ানোর চেয়ে এ আয়োজন সাধারণ মানুষের কাছে শ্রেয়তর বলে মনে হচ্ছে। চতুর্থ নাগরিককে তাই আমরা বলতে শুনি—

মরণ-উৎসব আজ হইবে নগরে।
চিতার মশাল জ্বালি শোণিতমদিরা
যমরাজ আজ রাত্রে করিবেন পান।

এসময় দূত এসে খবর দেয় যে পৃথ্বীরাজ বন্দী হয়েছেন। দূতের এ খবরে নাগরিকগণ আরও বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা বলে, ''লাগাও আগুন তবে নগরে নগরে।'' ''ভেঙ্গে ফেল অট্টালিকা''! ''ভস্ম কর গ্রাম''! সমবেত কণ্ঠে তারা বলে ওঠে, ''সমভূমি ক'রে ফেল হস্তিনা নগরী''। ছোট এই দৃশ্যটিতে গতিশীলতা রয়েছে চমৎকার ।

দ্বাদশ দৃশ্যে স্থানের উল্লেখ নেই । ধারণা করা যায় যে দৃশ্যটি অরণ্যে রুদ্রচন্ডের কুটীরে সংঘটিত হচ্ছে। এই দৃশ্যে রুদ্রচন্ডের আশা ধুলিসাৎ হয়ে যেতে দেখি আমরা । দীর্ঘদিনের লালন করা আকাঙ্ক্ষা ভেঙে যায় যখন রুদ্রচন্ড দূতমুখে শুনতে পারে পৃথ্বীরাজ বন্দী অবস্থায় হত হয়েছেন । কিন্তু সে বিশ্বাস করতে চায় না, ''মরেনি সে, মরেনি, মরেনি পৃথ্বীরাজ''। এখন পরাজিত রুদ্রচন্ড । রাজ্য হারানোর পরাজয়ের চেয়ে আশাভঙ্গের পরাজয় আরও তীব্র হয়ে ওঠে । রুদ্রচন্ডের সকরুণ আর্তনাদ -

মুহূর্তে জগত মোর ধ্বংস হয়ে গেল ।
শূন্য হয়ে গেল মোর সমস্ত জীবন !
পৃথ্বীরাজ মরে নাই, মরেছে যে জন
সে কেবল রুদ্রচন্ড, আর কেহ নয় ।
যে দুরন্ত দৈত্যশিশু দিনরাত্রি ধ'রে
হৃদয়মাঝারে আমি করিনু পালন,
তারে নিয়ে খেলা শুধু এক কাজ ছিল,
পৃথিবীতে আর কিছু ছিল না আমার,
তাহারি জীবন ছিল আমার জীবন -
এ মুহূর্তে মরে গেল সেই বৎস মোর !
তারি নাম রুদ্রচন্ড, আমি কেহ নই ।

এখানে এসে রুদ্রচন্ডের করুণ পরিণতি লক্ষিত হয় । রুদ্রচন্ডের আকাঙ্ক্ষার মৃত্যুর ফলে তার এই করুণ পরিণতি । এখানে আমরা এক রুদ্রচন্ডের ভিতর আরেক রুদ্রচন্ডের বেড়ে ওঠার সন্ধান পাই । যে বেড়ে উঠলো সে প্রতিশোধ স্পৃহার আগুনে অগ্নিময় 'দুরন্ত দৈত্য শিশু'। এই 'দুরন্ত দৈত্য শিশু' তার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি । এই প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি যা দীর্ঘদিনের লালনে পরিপুষ্ট হয়েছে, ভয়ঙ্কর হয়েছে ''তাহারি জীবন ছিল আমার জীবন''। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে তারও মৃত্যু সংঘটিত হ'ল। আর যার মৃত্যু হল, ''তারই নাম

রুদ্রচন্ড, আমি কেহ নই''। রয়ে গেল অস্তিত্বহীন রুদ্রচন্ড। যার মধ্যে আর কখনো প্রতিশোধের আগুন প্রজ্জ্বলিত হবে না। কারণ যাকে ঘিরে এই প্রজ্জ্বলন সেই তো মৃত। সুতরাং বেঁচে থাকার কোন রকম ইচ্ছা আর রুদ্রচন্ডের থাকে না । তাই সে নিজ বক্ষে ছুরি বিদ্ধ করে আত্মঘাতী হয়। পিতার অন্তিম মুহূর্তে অমিয়া প্রবেশ করে। অমিয়াকে দেখে রুদ্রচন্ড বলে ওঠে -

আয় মা অমিয়া মোর, কাছে আয় বাছা !
এত দিন পিতা তোর ছিলনা এ দেহে,
আজ সে সহসা হেথা এসেছে ফিরিয়া।

প্রতিশোধ স্পৃহায় রুদ্রচন্ড এতদিন অন্ধ হয়েছিল, মরে গিয়েছিল তার পিতৃত্ব। আজ সেই পিতৃত্ব 'সহসা' ফিরে এল। অমানবিকতার অন্ধকার ভেদ করে ফুটে উঠলো মানবিকতার আলো। রুদ্রচন্ডের ঘটলো মানবিক উত্তরণ। আমরা একে মানসিক উত্তরণ হিসেবেও চিহ্নিত করতে চাই। রবীন্দ্রনাট্যে এই মানবিকতা এবং অমানবিকতার দ্বন্দ্ব পরিণামে মানবিকতার জয় যা তাঁর পরিণত অর্থাৎ নিজস্ব ধারার নাটকে আরও বেশি ভাবে প্রকাশিত তার বীজ আমরা তার প্রথম নাটক 'রুদ্রচন্ড'-এর মধ্যেই খুঁজে পাই। অশ্রুকুমার সিকদারের মতে, ''রবীন্দ্রনাট্যে তত্ত্বগত বিচারে বিষয়বস্তু একটি মাত্র, জড়শক্তির সঙ্গে প্রাণশক্তির বিরোধ এবং পরিণামে প্রাণের অবশ্যম্ভাবী জয়লাভ।''[১০] 'রুদ্রচন্ড'-এ এই বিরোধেরই আভাস ক্ষীণভাবে দেখা দিয়েছে । অশ্রুকুমার সিকদার আরও জানাচ্ছেন, ''জড়ত্ব ও প্রাণের বিরোধ তাই বন্ধন ও মুক্তির বিরোধে রূপান্তরিত এবং সেই বিরোধের ফল বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তির মহৎ প্রকাশে''[১১] । ''আজ সে সহসা হেথা এসেছে ফিরিয়া''— এই ফিরে আসা বন্ধন ও মুক্তির দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে 'মুক্তির মহৎ প্রকাশে'রই এক ভিন্ন মাত্রিক রূপ। সমগ্র 'রুদ্রচন্ড'-এ এই বিরোধ কোনখানেই পরিলক্ষিত হয় না। আমরা রুদ্রচন্ডকে দেখি একরোখা, জেদি, প্রতিহিংসার আগুনে প্রজ্জ্বলিত। তার ধ্যান-জ্ঞান শুধু পৃথ্বীরাজকে হত্যা করা, শুধু এক সরল রৈখিক অগ্রসরতা। যেখানে পৃথ্বীরাজকে হত্যা করার বাসনা ছাড়া আর অন্য কোন মাত্রা যুক্ত হয়নি। কিন্তু এই সরল রেখাই যেন কাহিনীর শেষে এসে সামান্য পরিমান বেঁকে গিয়ে অন্য এক আলোর সন্ধান দিয়ে যায়, মানবিক মুক্তির সন্ধান দিয়ে যায়। এই পথই রবীন্দ্রনাট্যের প্রকৃত পথ।

ত্রয়োদশ দৃশ্য, স্থানের উল্লেখ নেই। শুধু চাঁদকবি সন্ন্যাসী বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।পৃথ্বীরাজ ও অমিয়ার কথা স্মরণ করছেন। চতুর্দশ দৃশ্যে চাঁদকবিকে দেখা যায় বনে রুদ্রচন্ডের কুটীরে। তার সামনে মৃত রুদ্রচন্ড ও মৃতপ্রায় অমিয়া এবং কিছুক্ষণ পর অমিয়া মৃত্যু বরণ করে।

'রুদ্রচন্ড'-এ দুটি ধারা। একদিকে রুদ্রচন্ড একা, অন্য দিকে চাঁদকবি ও অমিয়া। এক ধারায় প্রতিহিংসার আগুন অন্যধারায় ভালবাসার পবিত্র আলো। 'রুদ্রচন্ড'-এ প্রেমের স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী রচনা যেমন 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' এবং 'ভগ্নহৃদয়' থেকে ভিন্ন। সুকুমার সেনের মতে, ''পূর্ব্ববর্ত্তী গাথা কাব্যের সঙ্গে রুদ্রচন্ডের পার্থক্য হইতেছে প্রেম রসের স্থানে সৌভ্রাত্ররসের প্রবর্ত্তনে।''[১২] নরনারীর প্রেমের গদ্‌গদ ভাবের থেকে অমিয়া এবং চাঁদকবির অবস্থান স্বতন্ত্র। এই দুইজনকে আমরা জীবনের সুস্থদিক, স্বাভাবিক দিকের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি আর রুদ্রচন্ডকে জীবনের অসুস্থদিক, অস্বাভাবিক দিকের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি । এই দুই ধারার সংঘাত এই নাট্যকাহিনীর মধ্যে আমরা পেয়ে যাই, যদিও এর গাঢ়ত্ব খুবই সামান্য। রুদ্রচন্ডের আলোর দিকে নিষ্ক্রমণ অথবা বন্ধন মুক্তি ঘটে তার আকাঙ্ক্ষার মৃত্যুর মধ্যদিয়ে। এ আকাঙ্ক্ষা বীভৎস এবং প্রতিশোধমূলক। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রচন্ডের আকাঙ্ক্ষারও মৃত্যু ঘটে। বেরিয়ে আসে মানুষ রুদ্রচন্ড, স্নেহবৎসল পিতা রুদ্রচন্ড।

'রুদ্রচন্ড'কে সুকুমার সেন গাথা কাব্যের সগোত্র বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩] গাথা-কাব্যের ধারাবাহিকতায় 'রুদ্রচন্ড'-এ গাথা কাব্যের বৈশিষ্ট্য হয়তো সামান্য পরিমাণ থাকতে পারে কিন্তু তাই বলে ''ইহাই রবীন্দ্রনাথের শেষ গাথা-কাব্য'' জাতীয় মন্তব্য করে 'রুদ্রচন্ড'-এর নাট্যদাবী খারিজ করা সম্ভব নয়। কারণ ''বিলেতে আর একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল''[১৪] এবং 'ভগ্নহৃদয়' নামে যা ছাপান হয়েছিল তার মধ্যেই নাট্যের আভাস পরিলক্ষিত হয়। 'ভগ্নহৃদয়' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাবধানবাণী ''এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন''[১৫] তা স্মরণে রেখেও আমরা ভাবতে বাধ্য হই যে, 'ভগ্নহৃদয়' নাট্যলক্ষণাক্রান্ত। এই নাট্যলক্ষণ শুধু 'ভগ্নহৃদয়'-এ নয় 'কবি কাহিনী' এবং'বনফুল'-এর সংলাপ ধর্মিতার মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের এ কথার সমর্থন মেলে শেখর সমাদ্দারের লেখায়। তিনি লিখেছেন, ''ভগ্নহৃদয় ছাড়াও তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গকাব্য 'বনফুল' ('জানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব ' পত্রের অগ্র - আশ্বিন - কার্তিক ১২৮৩ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ, গ্রন্থ প্রকাশ ৯ মার্চ ১৮৮০)-কে কবি নিজে বলেছেন 'কাব্যোপন্যাস'। এই কাব্যেও নাট্য উপাদান আছে, কাহিনীর গতি এই কাব্যেও নাট্যময় সংলাপ ধর্মে নির্ভর খুঁজছে। প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কবিকাহিনী' (৫নভেম্বর ১৮৭৮) এবং 'শৈশব- সংগীত' কাব্যের টুকরো কবিতাগুলিতেও আছে নাট্য লক্ষণ।''[১৬] এসমস্ত কিছু বিবেচনায় এনে তাই 'রুদ্রচন্ড'কে রবীন্দ্রনাথের শেষ গাথা কাব্য বলে আমরা মেনে নিতে পারি না। নাটক হিসেবে 'রুদ্রচন্ড'-এর সার্থকতা কতটুকু তা বিশ্লেষণের আগে 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' এবং 'ভগ্নহৃদয়'-এর ধারাবাহিকতার পর্যালোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা বলে আমাদের বিশ্বাস।

বনফুল

'কবিকাহিনী' প্রথম প্রকাশিত হলেও 'বনফুল' রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম কাব্য। ৯ মার্চ ১৮৮০ সালে 'বনফুল' প্রকাশিত। কিন্তু 'বনফুল' রচিত হয়েছিল আগেই। ''এই কাব্যের রচনা কাল অন্তত: আরো চার বৎসর পূর্বে। কারণ, 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নামক মাসিক পত্রে (সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ দাস) ১২৮২ সালের অগ্রহায়ন হইতে ১৮৮৩ সালের আশ্বিন-কার্তিক পর্যন্ত ইহা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।''[১৭] সুতরাং চার বছর পিছিয়ে নিলে 'বনফুল' রবীন্দ্রনাথের ১৫ বছর বয়সের রচনা। রবীন্দ্রনাথ একে 'কাব্যোপন্যাস' বলে উল্লেখ করেছেন। 'বনফুল' কমলা, নীরদ, বিজয় এবং নীরজার কাহিনী। কমলা পিতার সঙ্গে বনে বাস করত। পিতার মৃত্যু হলে বিজয় তাকে বন থেকে তার সংসারে নিয়ে আসে। এতদিন কমলা লোকালয় থেকে এবং পিতা ভিন্ন অন্য মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে কমলার ভিতরে সংসার এবং মানুষ সম্পর্কিত কোন বোধ জন্ম লাভ করতে পারেনি। লোকালয়ে মানুষের সংস্পর্শে আসার পর তার মানবিক অনুভূতিগুলি বিকাশ লাভ করে। এখানে এসে নীরদের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। নীরদ বিজয়ের বন্ধু। কমলা নীরদকে ভালবাসতে শুরু করে। কমলা বিজয়ের স্ত্রী হলেও বিজয় তার মন পায় না। বিজয়ের ভালবাসাকে কমলা প্রত্যাখ্যান করে। তার কাছে নীরদ —

যেমন দেখিতে গুণও তেমন,
দেখিতে শুনিতে সকলি ভালো-
রূপে গুণে মাখা দেখিনি এমন,
নদীর ধারটি করেছে আলো!
আপনার ভাবে আপনি কবি
রাতদিন আহা রয়েছে ভোর।

নীরদ কবি, আপন মনে গান করে। গান শুনে মনে হয় তার অন্তরে প্রচুর বেদনা জমা রয়েছে। ''মোহিনী কল্পনে''কে সে তার বেদনার কথা শোনাচ্ছে— ''কি জানি লো বালা! কিসের তরে/ হৃদয় আজিকে কাঁদিয়া ওঠে।'' হৃদয়ের এই কেঁদে ওঠার কারণ গানের পরবর্তী কথায় পরিষ্কার হয়। নীরদ ভেবেছিল প্রকৃতির শোভায় হৃদয় ভরবে, নদীর কলতানে শ্রবণ পূর্ণ করবে, 'বাণীর সুধায়' হৃদয় ভরবে, ''ভুলিব প্রেম যে আছে এ ধরায়,/ ভুলিব পরের বিষাদ ব্যথায় / ফেলে কিনা ধরা নয়ন বারি।'' কিন্তু বিস্মৃতি কিছুতেই আসছেনা । নীরদ যাকে ভালবেসেছিল তাকে ভুলতে পারছে না এবং তাকে ভুলতেও চাচ্ছে না, ''পরাণ থাকিতে যাবনা ভুলে।'' নীরদ সম্পর্কে কমলার মনেও প্রশ্ন—

কিসের লাগিয়া মরমে মরিয়া

করিছে অমন খেদের গান?

কারে ভাল বাসে? কাঁদে কার তরে?

কমলার মনও চঞ্চল হয়ে ওঠে। মনে হয় সে যেন অন্তরে কার সাড়া পেয়েছে। আর তাই সে যত্ন করে নিজেকে নানা আভরণে সাজায় । কিন্তু কমলা যখন নীরদকে শুধিয়েছে সে কমলাকে ভালবাসে কিনা তার উত্তরে নীরদ তাকে বলেছে—

বিজয় তোমার স্বামী বিজয়ের পত্নী তুমি

সরলে! ও কথা তবে শুধাও কেমনে ?

কিন্তু কমলা বিবাহ, স্বামী, পত্নী কাকে বলে জানে না এবং 'কারে বলে ভালবাসা' আজও শেখেনি। কারণ যে এতদিন বনে বাস করেছে তার পক্ষে লোকালয়ের এইসব মানবিক বৃত্তি সম্পর্কে পরিচয় না থাকারই কথা। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসের কপালকুন্ডলার কথা। অধিকারীর মুখে বিয়ের কথা শুনে "বি-বা-হ" কথাটি কপালকুন্ডলা ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেছিল। তারপর বলেছিল, "বিবাহের নাম তো তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানিনা।" (অষ্টম পরিচ্ছেদ: আশ্রয়ে) এই কথারই হুবহু প্রতিধ্বনি শোনা গেল কমলার মুখে "বিবাহ কাহারে বলে জানি না তা আমি।" (রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনাগুলোতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচুর প্রভাব লক্ষ করা যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শ্রী অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য)।[১৮] পরে কমলা ভেবেছে সে বিজয়কে তিরস্কার করবে না। কারণ বিজয় তাকে সংসারে নিয়ে এসে তার অন্তরের দ্বার খুলে দিয়েছে। আর সে কারণেই "হৃদয়ের অস্ফুটিত কলি" প্রস্ফুটিত হয়েছে। এই প্রস্ফুটনের কারণেই কমলার ভিতরে প্রেম-ভালবাসা সম্পর্কিত মানবিক বোধের উন্মেষ ঘটেছে। বনে যা ছিল পশুপাখীর জন্য, গাছপালার জন্য লোকালয়ে এসে তা মানুষের জন্য রূপান্তরিত হয়েছে। এই পরিবর্তন মানবিকতারই এক ভিন্নমাত্রিক রূপান্তর বলে আমাদের ধারণা। কমলা বিজয়কে জানায় এক হৃদয়ে দুজনের স্থান হতে পারে না, "নীরদেই ভালবাসা দিব চিরকাল,/ প্রণয়ের করিবনা কভু অপমান।" কমলার এই আত্মপ্রত্যয় পূর্ণ ঘোষণা আরও সুসংবদ্ধ রূপে প্রকাশিত হয় যখন সে বলে-- "এত পাপ নয় বিধি ! পাপ কেন হবে?/ বিবাহ করেছি বলে নীরদে আমার ভালবাসিব না?" এদিকে নীরজা বিজয়ের মন পায় না। আর সে কারণেই কমলাকে উদ্দেশ্য করে নীরজা বলে--

বনে ছিলি বনবালা সে ত বেশ ছিল--

জ্বালালি ! জ্বলিলি বোন! --

0 2 JAN 2002 158677

এরপর ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে বিজয় নীরদকে খুন করে। এ কারণে কমলা নিজেকে বিধবা মনে করে। নীরদের মৃত্যুর পর কমলার অন্তরে আক্ষেপ দেখা দেয়, ''বেশ ছিনু বনবালা বেশ ছিনু বনে।'' তার সংসারে আগমন তো জ্বালাতে এবং জ্বলতে। এরপর নীরদের দুঃখে ''কমলার জীবনের হল অবসান।''

'বনফুল' -- এর কাহিনী বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা যে চারটি চরিত্রের দেখা পাই তাদের সবারই একটা সাধারণ ধর্ম রয়েছে। এই সাধারণ ধর্মটি হচ্ছে বিষাদ। বিষাদের আবরণে এই চারজনই আচ্ছাদিত। বিষাদময়তা রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের প্রতিটি লেখার মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই। বলা যায় তাঁর প্রথম পর্যায়ের সাধারণ ধর্মই হচ্ছে বিষাদময়তা। প্রতিটি চরিত্রই ভীষণ নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গতার নিদারুণ এক যন্ত্রণা নিয়ে সবাই চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। প্রায় প্রতি লেখাতেই একজন করে থাকছে কবি চরিত্র। 'বনফুল'-এর নীরদ ''আপনার ভাবে আপনি কবি''। বিষন্ন, একাকী। বিষাদময় এই কবি চরিত্রের উন্মেষ আরও ভালভাবে দেখা যাবে 'কবিকাহিনী'তে। কমলা চরিত্রের ক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় একজন বনবালা কি ভাবে মানুষের সংসারে এসে মানবিক কোমল প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে পড়ে। কিভাবে হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়ে মানবিকতার আলো সেখানে প্রবেশ করে। কমলা মানুষ হয়ে ওঠে। মানুষের জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা তাকে স্পর্শ করে। যদিও তার মাত্রা ভাবময়, বস্তুময় নয়। কিন্তু তবুও নীরজার উক্তি ''জ্বালালি! -- জ্বলিলি বোন!'' এই সংসারে মানুষের অবস্থানটি চিহ্নিত করতে আমাদের সাহায্য করে। 'বনফুল'-এ সংলাপময়তার মধ্যে আমরা নাটকের ফর্মের আভাস পাই।

কবিকাহিনী

'কবিকাহিনী' প্রকাশিত হয় ৫ নভেম্বর ১৮৭৮। 'ভারতী' পত্রিকার ১২৮৪ সালের পৌষ থেকে চৈত্র সংখ্যায় 'কবিকাহিনী' প্রকাশিত হয়।[১৯] এক কল্পনাবিলাসী কবির কথা বর্ণিত হয়েছে এ কাব্যে। কবির শৈশব - কৈশোর - যৌবন প্রকৃতির রূপ মাধুর্য অন্বেষণ করে অতিবাহিত। কিন্তু কবির মনে শান্তি নেই। কবি ভেবেছে মহাপ্রকৃতির সঙ্গে অনন্ত প্রণয়ে মজে গিয়ে ''হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা'' মিটাবে। (এই আকাঙ্ক্ষা 'বনফুল'- এর কবি নীরদের মধ্যেও জেগেছিল, ''প্রকৃতি শোভায় ভরিব নয়নে,''...)। কিন্তু এই মহাপ্রকৃতিও কবির হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা মেটাতে পারল না। কারণ, ''মানুষের মন চায় মানুষেরই মন।'' 'গম্ভীর নিশীথিনী', 'সুন্দর ঊষাকাল', 'তটিনীর কলধ্বনি', 'নির্ঝরের ঝরঝর' ইত্যাদি ''পারে না পুরিতে তারা বিশাল মনুষ্যহৃদি।'' সুতরাং ''মানুষের মন চায় মানুষেরই মন।'' কবির এই বাসনা পুরণ হতে বিলম্ব হ'ল না। ''কে গো তুমি পথশ্রান্ত বিষন্ন পথিক''- বলে এক বালিকার আবির্ভাব ঘটলো। নলিনী নামের এই

বালিকা আরও জিজ্ঞাস করল, "কী দুঃখে উদাস হয়ে করিছ ভ্রমণ"? উত্তরে কবি জানায়, "প্রাণের শূন্যতা কেন ঘুচিল না বালা"? প্রাণের শূন্যতা পূরণের জন্য নলিনী কবিকে বনের মধ্যে তার কুটীরে নিয়ে গেল। মানুষের মন খুঁজে পেল মানুষের মন। জীবনে জীবন যোগ হ'ল। কবির মনে হ'ল, "আজ যেন একটু আশ্রয় পাইল হৃদি"। কিন্তু এই নলিনীও শেষ পর্যন্ত কবির হৃদয় পূরণ করতে পারল না। কবি বলছে, "আরো ঢালো ভালবাসা হৃদয়ে আমার।" কারণ, "এখনও পুরিল না প্রাণের শূন্যতা"। কিন্তু নলিনীর আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, সে সবই দিয়েছে কবিকে । কবির ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা মিলিয়েছে, কবির সুখের সঙ্গে নিজের সুখ মিলিয়েছে। কিন্তু তবুও সে কবির প্রাণের শূন্যতা ঘুচাতে পারল না। তবে একি শুধু দু:খ বিলাস? কবি নিজেই বলেছে, "কাল্পনিক দু:খে এত কেন ম্রিয়মান?"

আমাদের মনে হয় এখানে রবীন্দ্রনাথের মানুষ ব্যক্তিমানুষ মাত্র নয় তা অসীম মানবতা, তা একটি ideal । কোন ব্যক্তির সীমাবদ্ধ সত্তা সেই ideal মানবতার আস্বাদ পূর্ণ করতে পারে না। সেজন্য এই কাতরতা এবং ideal - এর সন্ধানে পৃথিবী ভ্রমণ। " অনন্ত অতৃপ্তি তৃষ্ণা জ্বলিছে সদাই," তাই পরিমিত কিছু তার হৃদয় জুড়াতে পারে না । এ কারণে নলিনীকে রেখে কবিকে পুনরায় পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তে হয় শান্তির অন্বেষায় কিন্তু তবুও শান্তি মেলে না। নলিনীবিহীন প্রকৃতি, অর্থাৎ মনুষ্যহীন প্রকৃতি কবির কাছে অর্থহীন মনে হয়। মনে হয় "নাইক দেবতা যেন মন্দির মাঝারে।" কবি পুনরায় ফিরে আসে কিন্তু এদিকে নলিনী কবির প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে মৃত্যুবরণ করেছে। কবির কাছে সব কিছু স্বপ্নের মত মনে হয়, যেন সব কিছু মিলিয়ে গেছে নিদ্রার সমুদ্রে। কবি এখন বৃদ্ধ। গিরিশৃঙ্গে বসে ভাবে মানুষে-মানুষে হিংসা, হানা- হানি, রক্তপাত কবে বন্ধ হবে। ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ কবে লুপ্ত হবে। কবে, "অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে, দেব,/ একগান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি।" কবে কেউ কারো প্রভু থাকবেনা, কেউ কারো দাস থাকবে না।

নাই ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন ভাষা
নাই ভিন্ন দেশ, ভিন্ন আচার ব্যাভার!
সকলেই আপনার আপনার লয়ে
পরিশ্রম করিতেছে প্রফুল্ল-অন্তরে।

মানব কল্যাণকর এই চিন্তার মধ্য দিয়েই কবির জীবন শেষ হয়ে আসে। অশ্রুকুমার সিকদার এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "তিনি (কবি) এক শুভরাষ্ট্র কল্যাণময় সমসমাজের ইউটোপিয়ার স্বপ্ন দেখেন।"[২০] প্রকৃতির অন্তররহস্য উন্মোচনের আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি ধর্ম। প্রকৃতি সত্তা থেকে মানবজগৎ এবং

মানব জগৎ থেকে আবার প্রকৃতিতে ভ্রমণ যেন সেই সন্ধানেরই পরিচয় দেয়। এর মধ্যে আর একটি জিনিস পাই। কবি নলিনীকে পেয়ে ভেবেছিল হৃদয়ের শূন্যতা ঘুচবে। ঠিকই ভেবেছিল। কিন্তু অচিরে তার মনে হয়েছে শূন্যতা গেল না। তখন সে আবার বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। অর্থাৎ Particular-এর মধ্যে বা মানুষের মধ্যে অসীমতাকে পাওয়া যায় না। তাই অসীম রহস্যকে বুঝতে তাঁকে যেতে হয়েছে প্রকৃতির মধ্যে। কিন্তু শুধু প্রকৃতির মধ্যেও মানবহীন অবস্থায় সম্পূর্ণতা আসে না। তাই আবার কবিকে মানুষের জগতে ফিরে আসতে হয় নলিনীর কাছে। এখনো রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের মনের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ করে বোঝেন নি। তাই এ রচনার পরিণতি এ রকম একটা ইউটোপিয়ায়। এই স্বপ্ন দেখার মধ্য দিয়েই হয়তো কবি খুঁজে পান তার মনের প্রশান্তি। এই প্রশান্তির অন্বেষণ পরবর্তী আত্মিক মুক্তির অন্বেষণের ঈষৎ আভাস। আত্মা বিষাদের অন্ধকারে আবদ্ধ, মুক্তির আলোতে নিয়ে আসাই কবির মূল লক্ষ। একদিকে প্রকৃতি আর এক দিকে মানুষ, দুই জগতেই কবি পরিভ্রমণ করলেন কিন্তু শান্তি কোথাও মিলল না। কবির জীবন প্রবাহ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা একটি পরিণতি লক্ষ করি, - যে পরিণতি মানব কল্যাণের কামনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। একে আমরা কবির মানসিক উত্তরণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

ভগ্নহৃদয়

'ভগ্নহৃদয়' ২৩ জুন ১৮৮১ মুদ্রিত হয়। 'ভগ্নহৃদয়' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''বিলাতে আর একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকটা ফিরিবার পথে কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া সমাধা করি। ভগ্নহৃদয় নামে ইহা ছাপান হইয়াছিল।''[২১] রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই থেকে ''20 Sep 1878 [শুক্র ৫ আশ্বিন] তারিখে ইংলন্ড যাত্রা করেন।''[২২] আর ইংলন্ড থেকে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন ১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে। প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন ''দ্বিতীয় সর্গটি বিলেত প্রবাস কালেই লিখিত হয়েছিল।''[২৩] অর্থাৎ ভগ্নহৃদয়ের কিছু অংশ বিলেতে, কিছু অংশ ফিরিবার পথে জাহাজে এবং বাকী অংশ দেশে ফিরে লেখা হয়। এই তিন ধাপে 'ভগ্নহৃদয়' লিখিত হয়। প্রশান্তকুমার পাল এ প্রসঙ্গে আরও জানিয়েছেন, ''কিন্তু এই সমস্ত স্থান কালের বিবরণ প্রকৃতপক্ষে ভগ্নহৃদয়ের উক্ত পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য। কারণ এই কাব্যের প্রকৃত সূচনা বহুপূর্বে-- সম্ভবত আমেদাবাদে থাকার সময় কিংবা আরও আগে।''[২৪] তিনি মনে করেন 'ভগ্নহৃদয়'-এর একটি 'অস্পষ্ট ধারণা' অনেক আগেই কবির মনে দানা বেঁধেছিল। আমাদের মতে বহুপূর্বে দানাবাঁধা 'অস্পষ্ট ধারণা'টি প্রস্ফুটিত হওয়ার ক্ষেত্রে আরও অনেক ধরনের ঘটনার অভিঘাত সংযোজিত হয়েছিল। বিশেষ করে বিলেত যাওয়ার প্রাক্কালে বোম্বাই-এ আত্মারাম পাণ্ডুরঙ-এর পরিবারে

ইংরেজী আদব-কায়দা শিখতে যাওয়া এবং সেই পরিবারের বিদূষীকন্যা আন্না তড়খড়-এর সান্নিধ্যলাভ, বিলেতে স্কট পরিবারে অবস্থান ইত্যাদি বিষয়গুলো 'ভগ্নহৃদয়'-এর ভাববস্তুকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে সহায়ক বলে আমাদের ধারণা।

'ভগ্নহৃদয়'-এর কাহিনী এক ভাবময় রাজ্যের কাহিনী। এ প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'-এর একটি অংশ স্মরণ করা যেতে পারে—

> আমার এই আঠারো বছর বয়সের কবিতা সম্বন্ধে আমার ত্রিশ বছর বয়সের পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম এইখানে উদ্ধৃত করি—
>
> ভগ্নহৃদয় যখন বিলেতে আরম্ভ করেছিলাম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয়, যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই। একটু একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মতো কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগবি পৃথিবী হয়ে ওঠে। মজা এই, তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয় - আমার আশপাশের সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল। আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম । সেই কল্পনালোকের খুব তীব্র সুখ দু:খও স্বপ্নের সুখ দু:খের মত । অর্থাৎ , তার পরিমান ওজন করবার কোন সত্য পদার্থ ছিল না , কেবল নিজের মনটাই ছিল, তাই আপন মনে তিল তাল হয়ে উঠত ।[২৫]

এই বয়স সন্ধিকালে অস্পষ্ট সত্যালোকে বস্তুহীন, ভিত্তিহীন কল্পনায় রচিত হ'ল 'ভগ্নহৃদয়'। এর পাত্র-পাত্রীরা সকলেই ভাবময় রাজ্যের বাসিন্দা । হৃদয় ঘটিত সমস্যায় প্রত্যেকেই জর্জরিত। ননিলীকে ঘিরে একটি ভালবাসার বলয়। একদিকে কবি ও মুরলার হৃদয়ঘটিত সমস্যা, আরেক দিকে অনিল ও ললিতা । নলিনীকে ভালবাসে অনেকেই কিন্তু নলিনী সকলের ভালবাসা নিয়ে খেলতে ভালবাসে কাউকে সে ধরা দেয় না । কবি ভালবাসে নলিনীকে আবার মুরলা ভালবাসে কবিকে । অনিল-ললিতার বিয়ে হলেও ললিতা পারে না পূরণ করতে অনিলের অন্তরের তীব্র প্রণয়াকাঙ্ক্ষাকে এবং এরই কারণে অনিলও একসময় নলিনীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। কবির ভালবাসা না পেয়ে মুরলা এক সময় দেশ ত্যাগ করে এবং ললিতাও অনিলের অবহেলা সহ্য করতে না পেরে দেশ ত্যাগ করে যায়। নলিনীকে ঘিরে যে ভালবাসার

বলয় তৈরী হয়েছিল তা ভেঙ্গে যায়। নলিনী হয়ে পড়ে একা। কবি ও অনিল তাদের ভুল বুঝতে পেরে মুরলা ও ললিতার কাছে ফিরে যায়। কিন্তু ততদিনে মুরলা মৃত্যু পথযাত্রী এবং ললিতা উন্মাদিনী । মৃত্যু পথযাত্রী মুরলার সাথে কবির মিলন ঘটে। একই স্থানে বাসর ও চিতা রচিত হয় । হৃদয়ের কারবারিরা শেষ পর্যন্ত সবাই ব্যর্থতার অন্ধকারে ঢেকে যায়

আমাদের মনে হয় নলিনী চরিত্রের ক্রমবিকাশের মধ্যে 'মায়ার খেলা'র মূলতত্ত্ব প্রস্ফুটিত হয়েছে। নলিনী 'বসন্ত সমীরন'-এর মত, 'কি বা দিবা কি বা রাতি পরিমল মদে মাতি' কাননে বিচরণ করে বেড়ানোই তার কাজ। সকলের হৃদয়ের তন্ত্রীতে সে ভালবাসার সুর বাজিয়ে দেয় কিন্তু কাউকেই সে ধরা দেয় না। তবে শুধু এখানে এসেই নলিনী চরিত্রটি থেমে যায়নি , পরিবর্তনের মধ্যদিয়েই এগিয়ে যায় সত্য উপলব্ধির দিকে । কবি, "মুরলা কোথায় ?/ সে বালা কোথায় গেল ? কোথায় ? কোথায় ?" বলে আক্ষেপ করে এবং নলিনীর থেকে দূরে সরে যায় । তখন নলিনীও বুঝতে পারে—

একে একে সবে তারে তেয়াগি যেতেছে হা রে -
কেন, সখি, হতেছে এমন !

নলিনীর মনে প্রশ্ন জাগে , "সংসার কেবলি তবে রূপের কাঙাল সবে ?" এ প্রশ্ন পূর্বেও জেগেছে নলিনীর মনে । সুরেশ যখন বলেছে—

যাইতে বলিছ বালা , কোথা যাব আর ?
দিগ্বিদিক হারাইয়া ও রূপ অনলে গিয়া
এ পতঙ্গ পাখা দুটি পুড়ায়েছে তার !
রূপসী, ক্ষমতা আর নাই উড়িবার । (দ্বাদশ সর্গ)

এর উত্তরে নলিনী বলছে—

রূপ কিছু মোর না যদি থাকিত
বড় হইতাম সুখী,
দেখিতাম যত পতঙ্গ তোমরা
আসিতে কি লোভ দেখি !
রূপ - রূপ -রূপ- পোড়া রূপ ছাড়া
আর কিছু মোর নাই ?
তোমাদের মত পতঙ্গের দল

চারিদিকে ঘিরে করে কোলাহল,
দিবস রজনী করে জ্বালাতন,
ঝাপায়ে পড়ে গো, না মানে বারণ -
পোড়া রূপ থেকে এই যদি হল
হেন রূপ নাহি চাই !
হেন কেহ নাই হায়
শুধু ভালবাসে ননিলী বালারে,
আর কিছু নাহি চায় ! (ঐ)

শ্রী প্রমথনাথ বিশী নলিনী চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, '' নলিনীকে প্রণয় বিলাসিনী বলা যাইতে পারে। অনেক গুলি মুগ্ধ হৃদয়কে সে নিজের চারিদিকে ঘুরাইয়া মারিতেছে; কাহাকেও ছাড়িবেনা, কাহাকেও ভালবাসিবেনা ।''[১৬] কিন্তু শেষ পরিচয়ে নলিনীকে আর শুধু মাত্র প্রণয়বিলাসিনী বলা যায় না । যখন নলিনী বলে, ''হেন কেহ নাই হায় / শুধু ভালবাসে নলিনী বালারে ...।'' তখন কি মনে হয় না যারা নলিনীকে ঘিরে ভালবাসার বলয় তৈরী করেছিল তারা শুধুই নলিনীর স্তুতিকার ছিল, রূপজ মোহের দাস ছিল ? প্রণয় নিয়ে বিলাসিতা করলেও অন্তরে অন্তর যোগের একটি কামনাও নলিনীর মধ্যে ছিল । ''হৃদয়ের দুয়ারের বাহিরে বসিয়া'' প্রণয়ের খেলার অবসান হ'লে নলিনীকে বলতে হ'ল—

নিতান্ত ভিখারী আজি দীন হীন বেশে সাজি
দুয়ারে দুয়ারে ভ্রমি আশ্রয়ের তরে,
সবাই ফিরায় মুখ উপেক্ষার ভরে।

আর তখনই নলিনীর সাধ জাগে কাউকে ভালবাসবার জন্য। আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেকে সে সত্যালোকে আবিষ্কার করতে পেরেছে। নিতান্ত একাকী নলিনী একাকিত্বের তীব্র অন্তর জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে উপলব্ধি করেছে প্রকৃত ভালবাসার। যে ভালবাসা রূপের অনলে পোড়ায় না, পোড়ে না। যেখানে হৃদয়ের দুয়ারের বাইরে বসে শুধু খেলা নয়, তার আকাঙ্ক্ষা 'খেলা ছাড়া সত্যকার' জীবনের। যেখানে ''মনেতে মিশায়ে মন সচেতন অচেতন/ জগত হইয়া আসে মৃদু ছায়াময়,/ দুটি মন চেয়ে থাকে, দোঁহে দোঁহা ঢেকে রাখে--''। এই আত্ম উপলব্ধিতেই নলিনীর মুক্তি, নলিনীর মানসিক উত্তরণ। আরেকদিকে কবি ও অনিল আত্ম উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পৌঁছে যায় মুরলা ও ললিতার কাছে। 'ভগ্নহৃদয়' এ দুটি ধারা— একদিকে নলিনী - অন্য দিকে কবি-মুরলা, অনিল- ললিতা। নলিনীর ক্রম প্রকাশের যে ভাঙচুর তা কবি বা

অনিলের ক্ষেত্রে তেমন তীব্র নয়। নলিনী চরিত্রের মধ্যে নাটকীয় সংঘাতময়তাও লক্ষিত হয়। মুরলা ও ললিতার সঙ্গে নলিনীর প্রকাশময়তায় তফাৎ এইখানে-- মুরলা ও ললিতা যেন একটি সরল রেখা, কোথাও বাঁক নেয় না, আর নলিনী একটি বাঁকাচোরা রেখার অগ্রসরমানতা।

Alfred Tennyson (1809 - 1892) - এর একটি কবিতা রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন। কবিতাটির নাম Lilian (Airy, fairy Lilian)। রবীন্দ্রনাথ এর নাম দেন 'নলিনী'। অনুবাদটি ছাপা হয় ১২৮৬ সালের কার্তিক মাসের 'ভারতী'তে। লক্ষ করবার বিষয় এর ঠিক এক বছর পর অর্থাৎ ১২৮৭ সালের কার্তিক থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত 'ভগ্নহৃদয়' -এর প্রথম ছয় সর্গ 'ভারতী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ভাবগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই Tennyson -এর Lilian-এর অনুবাদ 'নলিনী'র সঙ্গে 'ভগ্নহৃদয়'-এর মূল চরিত্র নলিনীর অপূর্ব সাদৃশ্য রয়েছে। আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের অনূদিত কবিতাটি সম্পূর্ণ তুলে দিলাম।

নলিনী

লীলাময়ী নলিনী,
চপলিনী নলিনী,
শুধালে আদর করে
ভালো সে কি বাসে মোরে,
কচি দুটি হাত দিয়ে
ধরে গলা জড়াইয়ে,
হেসে হেসে একেবারে
ঢলে পড়ে পাগলিনী!
ভালোবাসে কিনা, তবু
বলিতে চাহেনা কভু
নিরদয়া নলিনী!
যবে হৃদি তার কাছে,
প্রেমের নিঃশ্বাস যাচে
চায় সে এমন করে
বিপাকে ফেলিতে মোরে

হাসে কত, কথা তবু কয় না!

এমন নির্দোষ ধূর্ত

চতুর সরল,

ঘোমটা তুলিয়া চায়

চাহনি চপল

উজল অসিত - তারা- নয়না!

অমনি চকিত এক হাসির ছটায়

ললিত কপোলে তার গোলাপ ফুটায়,

তখনি পালায় আর রয় না।''

Tennyson -এর এই কবিতায় একটি নারী চরিত্র রয়েছে, যার রবীন্দ্র অনূদিত নাম নলিনী। সে 'লীলাময়ী', 'চপলিনী', 'নিরদয়া'। ভালোবাসে কিনা জিজ্ঞাসা করলে কচিহাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে, হেসে ঢলে পড়ে কিন্তু ''ভালোবাসে কিনা, তবু / বলিতে চাহেনা কভু।'' কবির কাছে তাই সে 'নিরদয়া'। Tennyson -এর এই নলিনীর (Lilian)-এর সঙ্গে আমরা 'ভগ্নহৃদয়'-এর নলিনীর সাদৃশ্য খুঁজে পাই। 'ভগ্নহৃদয়'-এর নলিনী সম্পর্কে অশোক যে মন্তব্য করেছে তা যেন Tennyson-এর নলিনীর কথাই স্মরণ করায়। অশোক বলেছে, ''কপট রমণী এক, অধম, চপল,/ নির্দ্দয়, হৃদয়হীন...'' (পঞ্চম সর্গ)। নলিনী সম্পর্কে চপলার মন্তব্য, ''পাষাণ হতেও মন তার সুকঠোর'' (অষ্টম সর্গ)। সে আরও বলেছে—

শুনেছি সে জ্যোতি আলেয়ার চেয়ে

কপট, চপল নাকি —

পথিকের পথ ভুলাবারি তরে

জ্বলি উঠে থাকি থাকি! (ঐ)

চপলা আরও শুনেছে—

শুনেছি সে বালা সারাটি জীবন

চড়িয়া পাষাণ রথে

চাকায় দলিয়া চলিবারে চায়

হৃদয় বিছানো পথে! (ঐ)

Tennyson-এর নলিনীও লীলাময়ী হৃদয়ের কারবারী। প্রেমিকের অন্তরে প্রেম তৃষ্ণা উস্‌কে দিয়ে পালিয়ে

যায়। আমাদের মতে তাই দুই নলিনী একই গোত্রের। Tennyson -এর Lilian কবিতার ছায়া 'ভগ্নহৃদয়'-এর নলিনীর মধ্যে পড়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয় ও রুদ্রচন্ড

'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়' ও' রুদ্রচন্ড' -এর মধ্যে আমরা কিছু সাদৃশ্য দেখতে পারি। প্রতিটি কাহিনীর মধ্যে রয়েছে একটি করে কবি চরিত্র। 'বনফুল'-এর নীরোদ একজন কবি, 'কবি কাহিনী' শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একজন কবিরই কাহিনী। 'ভগ্নহৃদয়'-এ একজন কবি আছেন আর রুদ্রচন্ড'-এ আছেন চাঁদকবি। 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়'-এর তিনটি কবি চরিত্র একই গোত্রের। এরা নি:সঙ্গ, একাকী, হৃদয়গত যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত। ' রুদ্রচন্ড'-এর চাঁদকবি এই তিনজনের থেকে স্বতন্ত্র। এছাড়া এ কাহিনীগুলির প্রতিটি পাত্র-পাত্রীই বিষণ্নতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, ''বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয় ও রুদ্রচন্ড সবই একছাঁচে ঢালা; সবগুলি তপ্ত উচ্ছ্বাসে ভারাক্রান্ত। প্রায় সকলগুলিরই নায়ক একজন কবি।''[২৮] সুখহীন, শান্তিহীন এক হৃদয়গত সমস্যার জটাজালে সবাই জড়িয়ে। 'বনফুল'-এর কবি নীরদ, 'কবিকাহিনী'র কবি এবং 'ভগ্নহৃদয়'-এর কবির বিষণ্নতার স্বরূপ একই রকম। এদের নিজেদের কাছে পরিষ্কার নয় কেন তাদের অন্তরে এত বিষণ্নতা। তারা স্পষ্টভাবে জানেনা তারা কি চায়। নীরদ সম্পর্কে কমলা প্রশ্ন করেছিল ''কিসের লাগিয়া/ মরমে মরিয়া করিছে এমন খেদের গান?'' এই প্রশ্ন এই তিন কবি চরিত্র সম্পর্কেই প্রযোজ্য। 'বনফুল' থেকে 'ভগ্নহৃদয়' পর্যন্ত কবি চরিত্র তিনটির আমরা কোন বিবর্তন দেখি না। কাহিনীর মধ্যেও যেমন রয়েছে সাদৃশ্য তেমনি কবি চরিত্রও তিনজন না হয়ে যেন একজন। 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়' থেকে 'রুদ্রচন্ড' কিছুপরিমান স্বতন্ত্র। এখানে রবীন্দ্রনাথ হৃদয়গত ভাবোচ্ছ্বাসের গদগদ্ ভাব থেকে সরে এসে ইতিহাস ও কল্পনার মিশেলে কাহিনী রচনা করলেন। প্রেমের চরিত্রও গেল বদলে। নর-নারীর হৃদয়গত প্রেম রূপান্তরিত হ'ল ভাই-বোনের স্নিগ্ধ ভালবাসায়। কিন্তু এরও আভাস আমরা এর পূর্বে ' ভগ্নহৃদয়'-এর অনিল ও মুরলার মাঝে পেয়ে গেছি। এই সরে আসা সম্ভব হয়না পুরোপুরি ভাবে। কাহিনী ইতিহাসকে আশ্রয় করলেও ''তপ্ত উচ্ছ্বাসে ভারাক্রান্ত।।''[২৯] চাঁদকবি অন্যান্য কাহিনীকাব্যের কবি চরিত্র থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। চাঁদ কল্পনা বিলাসী নয়। সে পৃথ্বীরাজের সভাসদ। মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক পৃথ্বীরাজ আক্রান্ত হলে চাঁদকবি যুদ্ধে যায়। যুদ্ধে যোগদান করাকেই সে আপন কর্তব্য বলে জ্ঞান করে। আবার অমিয়ার জন্য রুদ্রচন্ডের সঙ্গে লড়াই করতে পিছপা হয়না। এখানেই চাঁদকবির সঙ্গে অন্যান্য কবি চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু

তবুও চাঁদ পূর্ববর্তী কবি চরিত্র গুলি থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি। একজায়গায় তারা মিলে যায়, সে জায়গাটি হচ্ছে তাদের একাকিত্ব। শেষ পর্যন্ত এরা সবাই একা, নিঃসঙ্গ। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর চাঁদ কবি হয়ে পড়ে একা , তাকে বলতে হয় , ''ভ্রমিব সন্ন্যাসীবেসে শ্মশানে শ্মশানে'' (ত্রয়োদশ দৃশ্য) এবং অমিয়ার মৃত্যুর পর চাঁদকবির একাকিত্ব আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়' এবং' রুদ্রচন্ড'-এর নারী চরিত্র গুলির মধ্যেও সাদৃশ্য রয়েছে। কবি চরিত্রের মত এরাও নিঃসঙ্গ। 'বনফুল'-এর কমলা বিজয়ের স্ত্রী হওয়ার পরও নীরদকে সে ভালবাসে। কারণ ''বিবাহ কাহারে বলে'', ''কারে বলে পত্নী আর কারে বলে স্বামী'' তার জানা নেই । সে জানে ''এত পাপ নয় বিধি! পাপ কেন হবে?/ বিবাহ করেছি বলে নীরদে আমার/ ভালবাসিব না?'' কিন্তু কমলা নীরদের ভালবাসা পায় না। বিজয় নীরদকে হত্যা করে। কমলা হয়ে পড়ে একা। 'মর্মদ্বার' খুলবার মূল্য তাকে দিতে হয় মৃত্যুর মধ্যদিয়ে। যন্ত্রণার আগুনে পুড়তে পুড়তে, একা হতে হতে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মধ্যে কমলার মুক্তি লাভ ঘটে। 'কবি কাহিনীর'র কবিকে নলিনী ভালবাসা দিয়ে আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু নলিনীর ভালবাসা পেয়েও কবির প্রাণের শূন্যতা পুরণ হয়নি। কবি শান্তির অন্বেষায় নলিনীকে পরিত্যাগ করে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। নলিনী পড়ে থাকে একা। কবির প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে একদিন নলিনী মৃত্যুবরণ করে। 'ভগ্নহৃদয়'-এর নলিনীও ''হৃদয়ের দুয়ারের বাহিরে'' বসে প্রণয়ের খেলা খেলতে খেলতে একসময় একা হয়ে পড়ে। মুরলা কবির ভালবাসা না পেয়ে সংসার ত্যাগ করে। মৃত্যুর মধ্যদিয়ে তার হৃদয়গত যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি ঘটে। অনিলের সঙ্গে ললিতার বিয়ে হলেও ললিতা পায় না অনিলের ভালবাসা। একাকিত্বের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে তারও জীবনের বেদনা বিধুর পরিসমাপ্তি ঘটে। নিঃসঙ্গতার শ্রোতধারায় 'রুদ্রচন্ড'-এর অমিয়াও রেহাই পায় না। পিতৃস্নেহ বঞ্চিত অমিয়ার মনে হয়েছিল '' আঁধার ভ্রূকুটিময় এই কানন'', মনে হয়েছিল ''শাসন—শকুনি এক দিনরাত্রি যেন/ মাথার উপরে আছে পাখা বিছাইয়া'', এর থেকে মুক্তির প্রয়োজন। তাই মনের আকাঙ্ক্ষা ''পাখী যদি হইতাম'', তা হলে 'সুনীল আকাশে' 'ঊষার আলোকে' প্রাণ ভরে সাঁতার দেওয়া যেত। বিষাদের অন্ধকারে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় আবর্তিত অমিয়ার মুক্তি লাভ ঘটে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

'বনফুল' থেকে 'রুদ্রচন্ড' পর্যন্ত ভাবগত যে ঐক্য রয়েছে সেই ঐক্য বিষাদময়তায়। 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' এবং 'ভগ্নহৃদয়'-এর কাহিনী মর্তের কর্কশতা ছেড়ে ডানা মেলে উড়ে গেছে কল্পনার আকাশে। 'রুদ্রচন্ড'-এর কাহিনী ইতিহাস এবং কল্পনার মিশেলে মর্তের মাটি স্পর্শ করতে চাইছে। কিন্তু দীর্ঘদিনের ডানা মেলার অভ্যাস এ কাহিনীতেও এসে আশ্রয় নিয়েছে চাঁদকবি ও অমিয়ার মাঝে। একারণেই 'রুদ্রচন্ড' কাহিনী কাব্যগুলি থেকে স্বতন্ত্র হ'তে গিয়েও রসগত বিচারে তাদের সমগোত্র হ'য়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক 'রুদ্রচন্ড'-এ মানসিক উত্তরণ অথবা মানবিক উত্তরণের অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা এই পর্বের প্রতিটি কাহিনী কাব্যেই এই মানসিকউত্তরণের বীজ খুঁজে পেয়েছি। আমাদের মনে হয়েছে এই উত্তরণ রবীন্দ্রনাট্যে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যদিও এই পর্বে মানবিক উত্তরণ অপেক্ষা অন্য কিছুর জন্য অনিবার্য তৃষ্ণা চরিত্র গুলির মধ্যে বেশি প্রকটিত কিন্তু তবুও এই অনিবার্য তৃষ্ণায় মানবিকতারই অনুষঙ্গ প্রকাশ পায়। এই উত্তরণ কোন দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয় না, শুধু এক মানবিকতারই উন্মেষ মাত্র। আমরা এই উন্মেষের ধারাবাহিকতার বীজ অনুসন্ধান করেছি কাহিনীকাব্য 'বনফুল' থেকে। প্রকৃতি কন্যা কমলা মানুষ, সংসার কাকে বলে জানতো না কিন্তু সেও এক সময় বলে—

এখন মানুষে বেসেছি ভালো
হৃদয় খুলি মানুষ কাছে।

'কবিকাহিনী'র কবি স্পষ্টতই ঘোষণা করে ''মানুষের মন চায় মানুষেরই মন।'' মানুষের জন্য কল্যাণময় রাষ্ট্রের কল্পনার মধ্যদিয়েই তার মানবিকতার উন্মেষ ঘটে। তার কামনা—

অযুত মানবগণ এককণ্ঠে ,দেব,
একগান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণকরি!

'ভগ্নহৃদয়'- এর প্রতিটি চরিত্রই শেষ পর্যন্ত নিজ নিজ অবস্থান চিহ্নিত করার মধ্যদিয়ে খুঁজে নেয় উত্তরণের পথ। কবি খুঁজে নেয় মুরলাকে, অনিল খুঁজে নেয় ললিতাকে আর নলিনী 'হৃদয়ের দুয়ারের' বাইরে বসে প্রেমের খেলা পরিত্যাগ করে, অনুতাপে দগ্ধ হ'তে হ'তে সত্যিকার ভালবাসার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। এই উন্মুখতা আমাদের বিবেচনায় মানসিক উত্তরণেরই বহি:প্রকাশ। ' রুদ্রচন্ড'-এ পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে রুদ্রচন্ডের প্রতিশোধ স্পৃহার মৃত্যু ঘটে এবং ঘটে মানসিক উত্তরণ।

'ভগ্নহৃদয়' কি নাটক ? এই বিষয়টির মীমাংসার প্রয়োজন আছে বলে আমাদের মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, ''বিলেতে আর একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল।''[৩০] অথবা ''এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন।''[৩১] কিন্তু কেন এই সাবধান বাণী ? রবীন্দ্রনাথ কি একখানি নাটক রচনা করারই চেষ্টা করেছিলেন? যা শেষ পর্যন্ত কাঠামোগত ভাবে নাটক হয়ে পড়ে সত্যি কিন্তু ভাবগতভাবে রয়ে যায় পূর্ববর্তী কাহিনী কাব্যগুলোর মতোই আবেগ-ঘন? আমরা এমনটাই ধারণা করে নিতে পারি।

ফুলের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ নাটককে ফুলের গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যে গাছ ''মূল,কান্ড, শাখা, পত্র এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত'' [৩২] সঙ্গে করে ফুল ফোঁটায় সেই ফুলের গাছই হচ্ছে নাটক। কিন্তু 'ভগ্নহৃদয়' শুধুমাত্র ফুল। সম্পূর্ণ একটি গাছকে সংগ্রহ না করে শুধুমাত্র একটি মালাগাঁথবার জন্য

''কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে।'' কিন্তু ফুল গাছ থেকে বিযুক্ত করে নিলেও সে তো গাছেরই অংশ এবং পূর্ণাঙ্গতার একটি অংশ আর এই অংশে আমরা পূর্ণাঙ্গতার সামান্য আভাস নিশ্চয়ই লাভ করতে পারি। শ্রী প্রমথনাথ বিশী 'ভগ্নহৃদয়' প্রসঙ্গে লিখেছেন,''নাটক ও গীতিকবিতার সীমান্ত প্রদেশের রচনা ভগ্নহৃদয়; তাহার খানিকটা নাটকী য়, খানিকটা কাব্যীয়; বহির্লক্ষণ নাটকের, অন্তর্লক্ষণ কাব্যের;... কাহিনী-কাব্য, নাটক ও গীতিকাব্যের মিশ্র প্রভাবে ভগ্নহৃদয় সৃষ্টি। ইহা রবীন্দ্র কাব্যের তেমাথার মোড়।''[৩৪] এই মিশ্র রূপায়ণের কারণে রবীন্দ্র রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের প্রথম খন্ডের গ্রন্থ পরিচয় অংশে একে 'বিচিত্র নাট্যকাব্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অশ্রুকুমার সিকদারের মতে, ''ভগ্নহৃদয় বস্তুত নাট্যাকারে লিখিত কাব্য।''[৩৫] একই কথা বলেছেন ড: সুশীলকুমার গুপ্ত, '' বাহ্যিক রূপে ভগ্নহৃদয়কে নাটক রূপে ভ্রম হলেও অন্তর রূপের বিচারে এটিকে নাটকাকারে কাব্য বা নাট্যকাব্য বলা উচিত।''[৩৬] সুতরাং এসব কিছু মিলিয়ে আমরা 'ভগ্নহৃদয়' কে নাট্যরূপাপন্ন কাব্য বলে চিহ্নিত করতে পারি। সংস্কৃ ত নাটক যেমন দৃশ্যকাব্য রবীন্দ্রনাথ যেন এখানে নিজেরও অজ্ঞাতে নাটক আর কাব্যের ভেদ মুছে দিতে চেয়েছেন।

'ভগ্নহৃদয়'-এ পাত্র-পাত্রীর পরিচয় প্রদান করা হয়েছে নাটকের মত করে। প্রথম দু'টি কাহিনী কাব্যের ধারায় ('বনফুল', 'কবিকাহিনী') 'সর্গ' উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নতুন সংযোজন হয়েছে দৃশ্য বর্ণনা। যেমন - প্রথম সর্গ / দৃশ্য—বন। চপলা ও মুরলা , অথবা দ্বিতীয় সর্গ/ ক্রীড়া কানন। নলিনী ও সখীগণ। এই সংযোজন নাট্যকাঠামোর আভাস দিয়ে নাটক রচনার দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়াকেই বোঝায়। পাত্র-পাত্রীদের সংলাপের মধ্যেও নাট্যলক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

চারু। তোর সাজ ফুরাইবে কবে?

লীনা। সখি, আবার কিসের সাজ!

সুরুচি। দেখ, এসেছে হইয়া সাঁঝ! (দ্বিতীয় সর্গ)

বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশ প্রদানও আঙ্গিকগত ভাবে নাটকের আভাস দিয়ে যায়। যেমন—

দামিনী। (হাসিয়া) এসেছে বিনোদ!

লীলা। (হাসিয়া) এসেছে প্রমোদ!

বিনো। (হাসিয়া) এসেছে সেথা অশোক!

মাধবী। (হাসিয়া) এসেছে বিজয়!

চারু। (চিবুক ধরিয়া) সুরেশ রয়েছে

পথ চেয়ে তোর তরে! (দ্বিতীয় সর্গ)

শ্রী ভূদেব চৌধুরী কবিতা ও নাটকের পার্থক্য উল্লেখ করে 'ভগ্নহৃদয়'—এর অবস্থান চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, ''কবিতা ও নাটক নির্বিশেষে সাহিত্য মাত্রই বাস্তব জীবন-সম্ভব; কিন্তু নাটকের রস-স্ফুরণ ঘটে বস্তু-সংঘাত-মন্থনে; অন্য পক্ষে কবিতার বিকাশ বস্তু-সার-সুর ভির সংকলনে।''[৩৭] 'ভগ্নহৃদয়'-এ এই 'বস্তু-সংঘাত-মন্থনের' কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে শ্রী ভূদেব চৌধুরী আরও লিখেছেন, '' 'ভগ্নহৃদয়ে' নাটকীয় পাত্রপাত্রীর সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য নিঃসন্দেহে প্রচুরতর, তাদের অনুভূতিতে স্বাতন্ত্র্য এবং ক্রমপরিণতির সংকেতও অস্ফুট নয়; তবু জীবনের বাস্তবিক সংঘাতের পূর্ণায়ত রূপ-রেখা দূরতম আভাসেও তাতে ধরা পড়েনি।''[৩৮] কিন্তু তার পরও 'ভগ্নহৃদয়' নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনার সূচনার সূচনা, ''সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো।''[৩৯]

আমরা নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনার সূত্রপাতের স্থানটি চিহ্নিত করার জন্য 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' হয়ে 'ভগ্নহৃদয়'-এ পৌঁছেছি। এরই সূত্র ধরে আমরা বিচার করতে চাই পূর্ববর্তী কাহিনী কাব্যগুলি থেকে 'রুদ্রচন্ড' কতটুকু সরে এসে নাটক হিসেবে দাঁড়াতে পেরেছে। 'রুদ্রচন্ড' প্রকাশিত হওয়ার পর মাসিক বান্ধব পত্রিকায় এর একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে লেখা হয়েছিল, ''তাঁহার সমগ্র কবিতাতেই একটুকু অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ নূতনত্ব আছে। রুদ্রচন্ডের রচনাতেও সেই নূতনত্ব স্পষ্টত পরিলক্ষিত হইতেছে। কবিতাগুলি যেন আধ আধ ভাঙ্গা গলায় নিরবিচ্ছিন্ন মধু ঢালিতেছে। কিন্তু নাটকাংশে ইহা অসম্পূর্ণ।''[৪০] আসলে 'রুদ্রচন্ড' নাটক তৈরীর আদিরূপ। তাই এখানে নেই কোন জটিল নাট্যকৌশল। কাহিনী সরল এবং একমুখী। কাহিনীতে রয়েছে ইতিহাসের ছায়া। ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করার কারণে কাহিনীর শরীর থেকে কিছু পরিমান ভাবালুতা ঝরে পড়েছে। পূর্ববর্তী কাহিনী কাব্যগুলির কাল্পনিকতার আকাশচারী প্রবণতা থেকে ঈষৎ সরে এসে 'বস্তু-সংঘাত-মন্থনের' ক্ষেত্রে সামান্য প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। একারণেই কবি চরিত্রটি হয়েছে স্বতন্ত্র। রুদ্রচন্ডের ভিতরে দেখা যাচ্ছে সংঘাত (conflict)। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, ''কাঁচা লেখা হইলেও এরই মধ্যে সর্বপ্রথম নাটকীয়তার সমারোহ দেখা গেল।''[৪১] আমাদের মতে 'নাটকীয়তার সমারোহ' ব্যাপক অর্থে ধরা পড়েনি, তার আভাস রয়েছে মাত্র। নাটক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে যে দুটো জিনিস অপরিহার্য গতিবেগ (action) এবং সংঘাত (conflict) তার আভাস আমরা লাভ করতে পারি 'রুদ্রচন্ড'-এ। যেমন নাটকের অষ্টম দৃশ্য এবং একাদশ দৃশ্যে গতিশীলতার আভাস আমরা চকিতে পেয়ে যাই কিন্তু সমগ্র নাটকে সংঘাত ময়তার মধ্যদিয়ে গতিবেগের অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের ব্যর্থ হ'তে হবে। রুদ্রচন্ডের ভিতরে দীর্ঘদিনের লালিত আকাঙ্ক্ষা এবং সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণকরার চেষ্টা অথবা পূর্ণ না হওয়া এই দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত রুদ্রচন্ড অনেক বেশি জীবন্ত। জীবনকৃষ্ণ শেঠ রুদ্রচন্ডের চরিত্রের মধ্যে পৌরুষ লক্ষ করেছেন। তাঁর মতে, '' 'রুদ্রচন্ড'

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রতিশোধমূলক নাটক (Revenge Drama)। তিনি এর মধ্যে সেকস্‌পীয়র পড়েছেন। এনাটক তার অক্ষম অনুকরণ। কিন্তু চন্ডের চরিত্রে যে পৌরুষ লক্ষ করা যায় তা রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি।''[৪২] রবীন্দ্রনাটকে এই পৌরুষ পরবর্তী পর্যায়ে আমরা 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতির মধ্যেও লক্ষ করি। আমাদের এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে ড: সুশীলকুমার গুপ্ত এবং প্রশান্তকুমার পালের লেখায়। ড: সুশীলকুমার গুপ্ত লিখেছেন, '' 'বিসর্জন' নাটকে প্রতিশোধ তৃষ্ণা মিটাবার জন্য অহংকারোদ্ধত রঘুপতিও একদিন গোবিন্দমানিক্যের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলেন, রুদ্রচন্ডের মধ্যে রঘুপতির পূর্বাভাস দেখা যায়।''[৪৩] প্রশান্তকুমার পালও একই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জানাচ্ছেন, ''বিসর্জন-এর রঘুপতির সঙ্গে রুদ্রচন্ডের অধিকতর সাদৃশ্য দেখতে পাই।''[৪৪] চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এই দুটি চরিত্র কাছাকাছি। দু'জনেই একরোখা, জেদি। একজন রাজ্য হারিয়ে প্রতিশোধ স্পৃহায় অন্ধ অন্যজন ক্ষমতা হারিয়ে উন্মত্ত। দুটি চরিত্রের মধ্যে আবার ভিন্নতাও লক্ষিত হয়। রুদ্রচন্ড পৃথ্বীরাজকে হত্যা করার জন্য কোন ধরণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়নি। নিজ হাতে সে পৃথ্বীরাজকে হত্যা করবে এই ছিল তার বাসনা। এই কারণে সে মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে কোন রকম সন্ধি করতে রাজী হয়নি, কিন্তু রঘুপতি গোবিন্দমানিক্যকে হত্যা করার জন্য নক্ষত্র রায়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে এবং নক্ষত্র রায়কে উদ্বুদ্ধ করেছে নিজ ভাইকে হত্যা করার জন্য। এই দুটি চরিত্রের পরিণতির দিক থেকে সামান্য পরিমান সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে রুদ্রচন্ডের সংকল্পের অবসান ঘটে। আত্মঘাতী হওয়ার মুহূর্তে প্রতিশোধ স্পৃহার অন্ধকারে তলিয়ে থাকা পিতা রুদ্রচন্ডের নিষ্ক্রমণ ঘটে, কন্যাকে ভালবেসে উত্তরণ ঘটে। রঘুপতিরও উত্তরণ সাধিত হয় একটি মৃত্যুর মধ্যদিয়ে সে মৃত্যুটি হচ্ছে তার প্রাণপ্রিয় , সন্তানসম শিষ্য জয়সিংহের।

আমাদের মতে 'রুদ্রচন্ড', 'রাজা ও রানী' ও 'বিসর্জন'-এর মধ্যে একটি সাধর্ম্য রয়েছে। 'রুদ্রচন্ড'-এর রুদ্রচন্ড , 'রাজা ও রানী'র বিক্রমদেব এবং 'বিসর্জন'-এর রঘুপতি প্রকৃতিগত দিক থেকে একই রকমের। রুদ্রচন্ড তার রাজ্য থেকে স্থানচ্যুত হয়ে ক্রোধে অন্ধ, বিক্রমদেব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে রাণীর কাছ থেকে তাই প্রেম পরিণত হয়েছে প্রতিহিংসায় এবং রঘুপতিও রাজার আদেশে অধিকারচ্যুত হওয়ার কারণে ক্রোধোন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে। তিনটি চরিত্রই কোন কিছু হারিয়ে প্রতিশোধ-স্পৃহার অনলে জ্বলছে। আবার কাহিনীর শেষে এসে তিন জনের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর স্ফুরণ ঘটেছে। মানসিক উত্তরণ ঘটেছে। সবগুলিতে প্রতিহিংসার উপরে প্রেমের জয় বর্ণিত হয়েছে। সুমিত্রার মৃত্যুজনিত আঘাতের ফলেই বিক্রমদেবের প্রতিশোধ স্পৃহার অনল থেকে নিষ্ক্রমণ ঘটেছে। অনুশোচনায় দগ্ধ হ'তে হ'তে বিক্রমদেব উচ্চারণ করেছে —

দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের
তাই বলে মার্জনাও করিলেনা? রেখে
গেলে চির-অপরাধী করে? ইহ জন্ম নিত্য
অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমাতব; তাহারও দিলে না অবকাশ?
দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,
অমোঘ তোমার দন্ড, কঠিন বিধান। (পঞ্চম অঙ্ক/ নবম দৃশ্য)

এই তিনটি নাটকে মৃত্যুজনিত কারণের দ্বারাই তিনটি প্রধান চরিত্রের অন্ধকার থেকে নিষ্ক্রমণ ঘটেছে। তবে 'বিসর্জন' - এ জয়সিংহের মৃত্যু এবং 'রাজা ও রানী' তে সুমিত্রার মৃত্যু প্রকৃতিগত দিক থেকে এক রকম হলেও 'রুদ্রচন্ড'-এ পৃথ্বীরাজের মৃত্যু আলাদা রকমের। সেক্সপীয়ার পাঠের ফলশ্রুতি হিসাবে 'Revenge Drama'-র যে ছায়া জীবনকৃষ্ণ শেঠ [৭] 'রুদ্রচন্ড'-এ প্রত্যক্ষ করেছেন সেই ছায়াই আমাদের মতে প্রলম্বিত হয়েছে 'রাজা ও রানী' হয়ে 'বিসর্জন'-এ।

'রুদ্রচন্ড' পূর্ববর্তী কাহিনী কাব্যের ধারাবাহিকতা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেনি। Edward Thompson একে বলেছেন, "The piece is poor melodrama."[৮] কিন্তু তারপরও নাটকীয়তার বীজ কিছু পরিমাণে আমরা 'রুদ্রচন্ডে'-এ খুঁজে পাই। সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "এই করুণ রসের মধ্যদিয়েই নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।... আসলে নাটকটিতে নাটকের আঙ্গিকগত দুর্বলতা কিছু কিছু রয়ে গেছে। তৎকালীন কাব্যগুলির ভাষাগত প্রবণতা নাটকটিতে মাঝে মাঝেই দেখা যায়।... আঙ্গিকের দিক থেকে তা স্বভাবতই 'অপরিণত' ও অসম্পূর্ণ কিন্তু ভাবের দিক থেকে নাটকটি তাঁর পরিণত চিন্তাধারারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশ বলে পরিগণিত হবার যোগ্য।"[৯] রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারার নাটকের বীজ 'রুদ্রচন্ড'-এ কতটুকু রয়েছে সে বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করবো। এ পর্যায়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাই যে 'রুদ্রচন্ড'- এর নাট্যদাবী একেবারে বাতিল করে দেওয়া সম্ভব নয়।

খ. বাল্মীকি প্রতিভা

অভিনয়ের প্রয়োজনে রচিত হ'ল 'বাল্মীকি প্রতিভা'। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে 'বিদ্বজ্জন সমাগম' নামে একটি সভা স্থাপিত হয়েছিল। এই সভায় অভিনয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন

'বাল্মীকি প্রতিভা'। অভিনয়ের তারিখ প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, ''বিদ্বজ্জন সমাগম-এ বাল্মীকি প্রতিভা প্রথম অভিনীত হয় শিবরাত্রির দিন ১৬ ফাল্গুন ১২৮৭ শনিবার (26 Feb 1881) - এ''।[৪৮] তবে 'বাল্মীকি প্রতিভা' প্রকাশিত হয় অভিনয়ের কিছুদিন আগে। এ প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন ''বাল্মীকি প্রতিভা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৮০২ শক (১২৮৭) - এ; বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় প্রকাশের তারিখ 12 Feb 1881 (শনি ২ ফাল্গুন)...।''[৪৯]

'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনার আগে রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৮ সালে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেত গিয়েছিলেন এবং ১৮৮০ সালে বিলেত থেকে ফিরে আসেন । এর এক বছর পর রচিত হয় 'বাল্মীকি প্রতিভা'। আর এই রচনায় আপতিত হয় বিলেত বাসের অভিজ্ঞতার ছায়া। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আমরা জেনে নিতে চাই 'বাল্মীকি প্রতিভা'র কাহিনী বিন্যাস।

রামায়ণের কাহিনী থেকে রবীন্দ্রনাথ গেঁথে তুলেছেন 'বাল্মীকি প্রতিভা'। তবে এর রচনার পিছনে বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদা মঙ্গল' কাব্যের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, ''তখন বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল সংগীত আর্যদর্শনে বাহির হইতেছিল এবং আমরা তাহাই লইয়া মাতিয়াছিলাম। এই সারদা মঙ্গলের আরম্ভ সর্গ হইতেই বাল্মীকি প্রতিভার ভাবটা আমার মাথায় আসে এবং সারদামঙ্গলের দু'একটি কবিতাও রূপান্তরিত অবস্থায় বাল্মীকি প্রতিভায় গান রূপে স্থান পাইয়াছে।''[৫০]

'সারদা মঙ্গল'-এর আরম্ভ সর্গ থেকে যে ভাবটি মাথায় এল সেই ভাবকেই রবীন্দ্রনাথ ছয়টি দৃশ্যে লিপিবদ্ধ করলেন। প্রথম দৃশ্যে বনদেবীগণের কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে—

সহেনা সহেনা কাঁদে পরাণ।
সাধের অরণ্য হল শ্মশান।
দস্যুদলে আসি শান্তি করে নাশ,
ত্রাসে সকল দিক কম্পমান।

এই দস্যুদলের দলপতি বাল্মীকি। বাল্মীকি কালী উপাসক।

ত্রিভুবন - মাঝে আমরা সকলে কাহারে করিনা ভয় -
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়। (প্রথম দৃশ্য)

এই কালী পূজার জন্য বাল্মীকি অন্যান্য দস্যুদের আদেশ দিলেন, ''সবে মিলি তোরা / বলি নিয়ে আয়।''।

দস্যুরা পূজার বলির জন্য এক বালিকাকে ধরে নিয়ে আসে, যে বালিকা অরণ্যে পথ হারিয়ে ঘুরছিল। এসময় বনদেবীরা গেয়ে ওঠে—

মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়।
আহা ওই করুণ চোখে ও কার পানে চায়!
বাঁধা কঠিন পাশে,অঙ্গ কাঁপে ত্রাসে,
আঁখি জলে ভাসে, এ কী দশা হায়!
এ বনে কে আছে, যাব কার কাছে, কে ওরে বাঁচায়। (প্রথম দৃশ্য)

দ্বিতীয় দৃশ্যে কালীপ্রতিমার সামনে বাল্মীকি স্তবে আসীন। দস্যুরা বালিকাকে বাল্মীকির সামনে নিয়ে আসে। বাল্মীকি দস্যুদের আদেশ করে, 'নিয়ে আয় কৃপাণ...' বাল্মীকির এই কথা শুনে বালিকা বলে ওঠে, "পথহারা একাকিনী বনে অসহায় -/ রাখো রাখো রাখো, বাঁচাও আমায়!" নেপথ্য থেকে বনদেবীগণ গেয়ে ওঠে—

"দয়া করো অনাথেরে দয়া কর গো—"

বালিকার এই কাতর আকৃতি এবং বনদেবীগণের মিনতিতে বাল্মীকির 'পাষাণ হৃদয়' গলে যায়। বাল্মীকির মনে করুণার জাগরণ ঘটে। বাল্মীকি বলে ওঠে—

এ কেমন হল মন আমার!
কী ভাব এযে কিছুই বুঝিতে যে পারিনে—
পাষাণ হৃদয়ও গলিল কেন রে,
কেন আজি আঁখি জল দেখা দিল নয়নে!
কী মায়া এ জানে গো,
পাষাণের বাঁধ এ যে টুটিল,
সব ভেসে গেল গো, সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে।

বালিকার কাতর আকূতির কারণে বাল্মীকির হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে যায়। বাল্মীকি এই পরিবর্তনে বিস্মিত। এমনতো হওয়ার কথা ছিল না। পাষাণ হৃদয়ও যে গলে যেতে পারে, মরুভূমিও যে করুণার রসে সিক্ত হতে পারে তা বাল্মীকি এতদিন উপলব্ধি করতে পারেনি। ক্ষণিকের একটি ঘটনা সবকিছু আলোড়িত করে ফেলে। এতদিনের নিষ্ঠুরতার মাঝে নেমে আসে পেলবতার জলধারা। একারণেই বাল্মীকিকে আদেশ করতে হয়—

শোন্, তোরা শোন্ এ আদেশ
কৃপাণ খর্পর ফেলে দে দে!
বাঁধন কর্ ছিন্ন, মুক্ত কর্ এখনি রে।

এ বাঁধন শুধু বালিকারই ছিন্ন হয় না, দস্যুদের হাত থেকে শুধু বালিকাই মুক্তি লাভ করেনা পাশাপাশি দস্যুবৃত্তির নির্মমতার হাত থেকে বাল্মীকি নিজেই মুক্তি লাভ করে।

তৃতীয় দৃশ্যে বাল্মীকির মনের শূন্যতার কথা প্রকাশ পেয়েছে। 'ব্যাকুল হয়ে বনে বনে' বাল্মীকি একা শূন্যমনে ঘুরছে। বাল্মীকির এই হাহাকার কিসের জন্য? এতদিন যে কাঠিন্যের আবরণে তার হৃদয় পাষাণ হয়েছিল এই পাষাণ হৃদয় গলে যাওয়ার কারণে কি এই শূন্যতা? নাকি কোন কিছু হারিয়ে ফেলার কারণে? অথবা নিজের অভ্যস্তজীবন থেকে বিযুক্ত হওয়ার কারণে এই শূন্যতা? রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের রচনায় অনির্দেশ্য শূন্যতার ভাব প্রকট। এই অনুভূতির মূলে আছে কবির রোমান্টিক মনোভঙ্গি। জগৎ ও জীবনের বাস্তব সৌন্দর্য ও প্রেমে তাঁর মন তৃপ্তি পাচ্ছে না বলে একটা হতাশা ও শূন্যতার বোধ তাঁর মনে দেখা দিচ্ছে। রবীন্দ্র প্রতিভার যা সাধারণ ধর্ম নিত্যকার জীবনের অতিরিক্ত কোন সৌন্দর্য সন্ধান—সুদূর ও অপ্রাপনীয়ের যে বেদনা—তাই এসব শূন্যতার মূল। কালী বাল্মীকির এতদিনকার দেবী। আজ বাল্মীকির মনে করুণার নূতন ভাব এবং নূতন অনুভূতির জাগরণ ঘটেছে এবং এই জাগরণের ফলে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়েছে পূর্ববর্তী অভ্যস্তজীবনের সঙ্গে, একারণেই এই শূন্যতা। পাশাপাশি লক্ষ করা যাচ্ছে এই শূন্যতা পুরণের জন্য আকুলতা —

কে পুরাবে মোর কাতর প্রাণ,
জুড়াবে হিয়া সুধা বরিষণে।

এই দৃশ্যে দেখা যায় পুনরায় দস্যুরা বালিকাকে ধরে নিয়ে আসে। কিন্তু বাল্মীকি তো এখন আর এই বলি হতে দিতে পারে না। তাই সে বাধা দিয়ে বলে, "এসব কাজ আর না, এ পাপ আর না।" বাল্মীকির কাছে এখন পাপ-পুন্যের ধারণাটি পরিষ্কার। তার পাপ জগতের অন্ধকারে বালিকা এসে আলো জ্বেলে দিয়েছে। তাই বাল্মীকিকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে হয়, "এ পাপ আর না,/ আর না, আর না—ত্রাহি সব ছাড়িনু!" এই দৃশ্যের শেষে বালিকার উদ্দেশ্যে বাল্মীকি কে বলতে শোনা যাচ্ছে, "আয় মা আমার সাথে, কোন ভয় নাহি আর।" 'রুদ্রচন্ড' নাটকেও মৃত্যু পথযাত্রী রুদ্রচন্ড. এতদিন নিজ সন্তান অমিয়াকে যে অবহেলা করেছে, সেই সন্তানের উদ্দেশ্যে বলছে, "আয় মা অমিয়া মোর কাছে আয় বাছা" (দ্বাদশ দৃশ্য)। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে সন্ন্যাসী যে বালিকাকে এতদিন অবহেলা করেছে নাটকের শেষ দৃশ্যে এসে সেই বালিকার উদ্দেশ্যে

বলছে, ''স্নেহের প্রতিমা, ওগো, মা, আমি এসেছি/ ধুলায় পড়িয়া কেন,—ওঠ মা, ওঠ মা-'' (ষোড়শ দৃশ্য)। 'বিসর্জন' নাটকে জয়সিংহের মৃত্যুর পর রঘুপতিও অপর্ণাকে মা বলে সম্বোধন করছে, ''আয় মা অমৃতময়ী!'' (৫ম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)।

তৃতীয় দৃশ্যে 'এ পাপ আর না' বলে ঘোষণা দিলেও চতুর্থ দৃশ্যে প্রাণের কান্না থামানোর জন্য অথবা নিঃসঙ্গতা ঘোচানোর জন্য বাল্মীকি কে দলবল নিয়ে শিকারে মেতে উঠতে দেখা যায়, ''ধরি ধনু আনি বান, গাহিব ব্যাধের গান,/ দলবল নিয়ে মাতিব।'' দস্যুবৃত্তি রূপান্তরিত হয় ব্যাধবৃত্তিতে। কিন্তু সেখানেও তো হত্যা রয়েছে, রয়েছে রক্তপাত। করুণার সঞ্চার যার অন্তরে হয়েছে সে তো আর রক্তপাত ঘটাতে পারে না। তাই বাল্মীকিকে বলতে হয়—

রাখ্ রাখ্, ফেল্ ধনু, ছাড়িস নে বাণ।
হরিণ শাবক দুটি প্রাণ ভয়ে ধায় ছুটি,
চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণ নয়ান।
কোনো দোষ করে নি তো, সুকুমার কলেবর—
কেমনে কোমল দেহে বিঁধিব কঠিন শর!
থাক্ থাক্ ওরে থাক্, এ দারুণ খেলা রাখ্,
আজ হতে বিসর্জিনু এ ছার ধনুক বাণ।

শ্রী বার্ণিক রায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, '' প্রাণ করুণার লীলা প্রত্যক্ষ করে সে দিনই ধনুকবাণ বিসর্জন করেছেন।''[৫১] 'বিহারী লাল' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণ যোগ্য, ''কবি যে সরস্বতীর বন্দনা করিতেছেন তিনি নানা আকারে নানা ভাবে নানা লোকের নিকট উদিত হন। তিনি কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী, কখনো কন্যা। তিনি সৌন্দর্য রূপে জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, এবং স্নেহ প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহ বিচলিত করিতেছেন।''[৫২] এই হরিণ শাবক দুটির মধ্যেও যেন সৌন্দর্য রূপে সেই সরস্বতী বিরাজিত। প্রথমবার বালিকার রূপ ধরে বাল্মীকির মধ্যে তিনি করুণার সঞ্চার করলেন। দ্বিতীয়বার দুটি হরিণ শাবকের রূপ ধরে তিনি সেই করুণাধারাকেই বেগবান করলেন এবং এই করুণার প্রবাহমানতায় ভেসে গিয়ে বাল্মীকি বিসর্জন দিলেন ধনুকবাণ, যে ধনুকবাণ শুধু রক্তাক্ত মৃত্যুর মধ্যদিয়ে মানবতার পতন ঘটায়।

পঞ্চম দৃশ্যের শুরুতেই দেখা যায় ''জীবনের কিছু হলনা হায়''—বলে বাল্মীকিকে আক্ষেপ করতে। সহচর যারা ছিল সকলেই তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। এখন কোন কাজ নেই, ''কী করিব জানিনা

যে!" এরপর ব্যাধগণের পাখি শিকার, বাল্মীকির নিষেধ এবং নিষেধ না মানার কারণে বাল্মীকির অজ্ঞাতসারে তার মুখ থেকে "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং..." শ্লোক বেরিয়ে আসা। এই শ্লোক উচ্চারণ করে বাল্মীকি বিস্মিত হয়ে ওঠে—

কী বলিনু আমি! এ কী সুললিত বাণী রে!
কিছু না জানি কেমনে যে আমি প্রকাশিনু দেবভাষা,
এমন কথা কেমনে শিখিনু রে!
পুলকে পুরিল মন প্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে,
এ কী! হৃদয়ে এ কী এ দেখি!—
ঘোর অন্ধকার-মাঝে, এ কী জ্যোতি ভায়!
অবাক্!—করুণা এ কার!

এর পর সরস্বতী আবির্ভূত হন। সরস্বতীর এই আবির্ভাবের মধ্যদিয়ে, "ধন্য হল দস্যুপতি, গলিল পাষাণ।" এই দৃশ্যের শেষে কালী প্রতিমার প্রতি বাল্মীকির সংলাপ বিশেষ তাৎপর্যময়—

শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা!
পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি মা!
এতদিন কি ছল করে তুই, পাষাণ করে রেখেছিলি—
আজ আপন মায়ের দেখা পেয়ে, নয়ন জলে গলেছি মা!
কালো দেখে ভুলিনে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন—
আমায় তুমি ছলেছিলে, এবার আমি তোমায় ছলেছি মা!
মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার মায়ের কোলে চলেছি মা!

এই ছেড়ে আসার মধ্য দিয়েই বাল্মীকির পুরোপুরি উত্তরণ ঘটে যায়। এ উত্তরণ কালো থেকে আলোর দিকে, নিষ্ঠুরতা থেকে কারুণ্যে। আর এই উত্তরণের ফলে তার অন্তরে হঠাৎ জাগা শূন্যতাও গেল ঘুচে। উপরের সংলাপের সঙ্গে 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতির শেষ সংলাপের আমরা মিল খুঁজে পাই। প্রায় একই কথা রঘুপতি বলছে, "পাষাণ ভাঙ্গিয়া গেল-জননী আমার/ এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা!/ জননী অমৃতময়ী!" (৫ম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য)।

পঞ্চম দৃশ্যে হৃদয়ে যে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটলো, শুভ্র জ্যোতির্ময় সরস্বতীর যে আবির্ভাব ঘটলো, ষষ্ঠ দৃশ্যে দেখা গেল বাল্মীকি তারই অনুসন্ধান করছে —

কোথা লুকাইলে !

সব আশা নিবিল, দশ দিশি অন্ধকার,

সবে গেছে চলে ত্যেজিয়ে আমারে -

তুমিও কি তেয়াগিলে !

এই দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে লক্ষ্মী এসে বাল্মীকিকে প্রলোভন দেখাচ্ছে, ''কমলা দিতেছে আসি, রতন রাশি রাশি,/ ফুটুক তবে হাসি মলিন মুখে।'' কিন্তু বাল্মীকি লক্ষ্মীর রাশি রাশি রতনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলছে, '' দেবী গো, চাহিনা, চাহিনা,মনিময় ধুলিরাশি চাহিনা।'' এই দৃশ্যের শেষে পুনরায় সরস্বতীর আবির্ভাব ঘটে। সরস্বতী বাল্মীকিকে জানায় যে, আমি দীন হীন বালিকা সেজে তোর পাষাণ হৃদয় গলাতে এসেছিলাম, 'আমি বীনাপাণি' তোকে গান শেখাতে এসেছি।

এই নে আমার বীনা, দিনু তোরে উপহার,

যে গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তার।

বিহারীলালের 'সারদা মঙ্গল'-এর প্রথম সর্গের ভাব থেকে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র ভাবনা এলেও রবীন্দ্রনাথ দস্যু রত্নাকরের কবি বাল্মীকিতে উত্তরণের কাহিনীটি রামায়ণ থেকে সংগ্রহ করেছেন। যদিও 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় রত্নাকরের উল্লেখ নেই তবুও আমরা ধরে নেব এ দস্যু রত্নাকরেরই কাহিনী। 'বাল্মীকি প্রতিভা'তে আমরা দু'জন বাল্মীকির সন্ধান পাই। একজন দস্যু বাল্মীকি আরেকজন কবি বাল্মীকি। রামায়ণ থেকে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র কাহিনী প্রসঙ্গে শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাল্মীকি প্রতিভায়' বাল্মীকি রচিত মূল রামায়ণ অনুসরণ করেন নি। তিনি অনুসরণ করেছেন কৃত্তিবাসী রামায়ণ। সে জন্য বাল্মীকিকে দস্যু নায়ক রূপে বর্ণনা করেছেন।... এখানে রবীন্দ্রনাথ কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত দস্যু বাল্মীকির কবি বাল্মীকিতে রূপান্তরের ঘটনাকে গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে রত্নাকর দস্যু হলেও কালীপূজক নয়।... কৃত্তিবাস রত্নাকর দস্যুর যে বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন বাল্মীকি রামায়ণে তা পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাস এ কাহিনী কোথা থেকে পেলেন? ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্ভূক্ত বলে স্বীকৃত 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গ আছে। সেখানে কৃত্তিবাস কথিত 'চ্যবন ঋষির পুত্র নাম রত্নাকর' নেই। সেখানে ঋষি বাল্মীকি স্বমুখে পূর্বজীবন বৃত্তান্ত রামচন্দ্রের কাছে বর্ণনা করেছেন।''[৫১] কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র কাহিনী গৃহীত হলেও কালী উপাসক হিসেবে বাল্মীকির রূপদান পুরোপুরি ভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসারে বাল্মীকিকে দস্যু হিসেবে উপস্থাপন করা হ'ল ঠিকই কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাল্মীকি কালী উপাসক নয়। তবে কেন রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকিকে কালী উপাসক হিসেবে রূপদান করলেন? দস্যুরা সাধারণত কালী উপাসক হয়ে থাকে এই বিবেচনা থেকেই হয়তো

রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকিকে কালী উপাসক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

'বিসর্জন' নাটকের সঙ্গে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র দুটি জায়গাতে সাদৃশ্য রয়েছে বলে আমাদের ধারনা। প্রথমত 'বিসর্জন' নাটকে কালী প্রতিমা বিসর্জনের মধ্যদিয়ে রঘুপতি যেমন মিথ্যা বিশ্বাসকে বিসর্জিত করে সত্যের পথে বেরিয়ে আসে তেমনি 'বাল্মীকি প্রতিভা'তেও বাল্মীকি কালী প্রতিমার প্রতি ''শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা''! বলে কালী প্রতিমাকে পরিত্যাগ করে নতুন জীবনের পথে, সত্যের পথে বেরিয়ে আসে। দ্বিতীয় সাদৃশ্য হচ্ছে দু'টি নাটকেই রয়েছে একটি করে বালিকা চরিত্র। 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় বালিকা রূপী সরস্বতী এবং 'বিসর্জন'-এর অপর্ণা দুজনেই নাটকের প্রধান চরিত্র দুটির মানসিক উত্তরণ ঘটানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় বালিকা বাল্মীকির অন্তরে করুণার উদ্রেক করে বাল্মীকির মানসিক উত্তরণ ঘটিয়েছে এবং 'বিসর্জন'-এ অপর্ণা রঘুপতির অন্তরে করুণার উদ্রেক করে রঘুপতির মানসিক উত্তরণ ঘটিয়েছে।

'বাল্মীকি প্রতিভা'র বিষয়বস্তু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''বাল্মীকি প্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হল তার অন্তরগূঢ় করুণা। এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক মানবত্ব যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে।''[৫৪] 'বাল্মীকি প্রতিভা'র এই 'অন্তর্গূঢ় করুণা'র আভাস আমরা পেয়েছিলাম 'রুদ্র চন্ড' নাটকে। 'অভ্যাসের কঠোরতায়' রুদ্রচন্ডেরও মানবত্ব ঢাকা পড়েছিল। একদিন সেখানে আঘাত এল এবং সেই আঘাতে অন্তরের পাষাণ ভেঙে চূর্ণ- বিচূর্ণ হ'ল। করুণা ধারায় সিক্ত হয়ে রুদ্রচন্ডের ঘটলো নিষ্ক্রমণ। 'বাল্মীকি প্রতিভা'তে এই ভাব আরও সংঘবদ্ধভাবে, পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পেল। সংসারের দেউড়ি পার হয়ে ভিতর মহলে পা দিয়ে অনুভূত হয়েছিল ''মানুষে মানুষে সম্বন্ধের জাল বুনোনি''র কথা। এই বুনন কিভাবে অথবা কিসের সাহায্যে সম্ভব? এই সম্বন্ধের অনুসন্ধান করতে গিয়েই বোঝা গেল 'অভ্যাসের কঠোরতায়' যে মানবত্ব ঢাকা পড়ে থাকে তার উন্মোচন প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তার দিকে নজর রেখেই রচনা হয় 'বাল্মীকি প্রতিভা'। মানবত্বের উপর থেকে কঠোরতার কালো পর্দা উন্মোচনের পথ খোঁজা হ'ল 'অন্তর্গূঢ় করুণা'র উৎসারণের মধ্য দিয়ে। নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন, ''এই গীতিনাট্যটির (বাল্মীকি প্রতিভা) বিষয় বস্তু অথবা ভাবপ্রকাশের মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই, ইহার যাহা কিছু রস-মাধুর্য তাহা ইহার গানগুলির মধ্যে। বিষয়বস্তুর ভিতর কোনও সত্য অথবা তত্ত্ব আবিষ্কারের উদগ্র চেষ্টাও কোথাও নাই।''[৫৫] নীহাররঞ্জন রায়ের এই মন্তব্যকে মেনে নেওয়া যায় না। 'অভ্যাসের কঠোরতা'য় মানবিক বৃত্তি ঢাকা পড়ে থাকলেও তারও উন্মোচন সম্ভব হতে পারে, এই সত্য 'বাল্মীকি প্রতিভা'র বিষয়বস্তু। বাল্মীকির চিত্তের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে একটি বালিকার কাতর আকুতিতে। এ প্রসঙ্গে শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''বাল্মীকির চিত্তে এই পরিবর্তন

এনেছে শাস্ত্র নয়, যজ্ঞ নয়, দৈবাদেশ নয়—একটি নিরাশ্রয়া ভীতা বালিকার কাতর আকুল আবেদন।"[৫৬]
'বাল্মীকি প্রতিভা'র ভাবসত্য আরও দৃঢ় ভাবে প্রকাশিত হবে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে।

বাল্মীকির অন্তরে করুণার উদ্রেক ঘটার পর থেকেই তার মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। এই দ্বন্দ্ব পূর্বতন প্রথাবদ্ধ জীবনবোধের সঙ্গে নবলব্ধ চেতনার দ্বন্দ্ব। রবীন্দ্রদর্শনে সীমা ও অসীমের যে প্রকাশ তা রবীন্দ্র নাট্যের ভাববস্তুর একটি মৌলিক উপাদান বলে আমাদের ধারনা। সীমার মাঝে অসীমের প্রকাশ, সীমার মধ্যেই খুঁজে নিতে হয় অসীমকে—এই তত্ত্ব প্রথম পর্যায়ের নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের ধারণা 'বাল্মীকি প্রতিভা'তেও এই সীমা-অসীমের তত্ত্বরূপ ক্ষীণভাবে প্রকাশিত। বাল্মীকি তার জীবনাভ্যাসের সীমাবদ্ধতার মধ্যে হঠাৎ এক বৃহত্তর জীবনের স্পর্শ অনুভব করল তার চিত্তকরুণার জাগরণে। এই জাগরণ যেন সীমার মাঝে অসীমের ঈষৎ আভাস দিয়ে যায় ।

এই পর্যায়ের প্রতিটি রচনার (বনফুল , কবিকাহিনী , ভগ্নহৃদয় , রুদ্রচন্ড) মধ্যেই আমরা একটি করে কবিচরিত্র পেয়েছি। 'বাল্মীকি প্রতিভা'তে এই কবি চরিত্রের সমাপ্তি। পূর্ববর্তী কবিচরিত্র গুলি থেকে বাল্মীকি স্বতন্ত্র। আমরা মনে করি মহাকাব্যের কাহিনী অবলম্বন করে 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচিত হলেও এর কবিচরিত্র পুরোপুরি স্বতন্ত্র। এ রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রক্ষেপ নয়। কিন্তু পূর্ববর্তী কবি চরিত্র গুলির মধ্যে আমরা যেমন এক বিষণ্ণতার ছায়া দেখতে পাই তেমনি ভাবে বাল্মীকি চরিত্রের মধ্যেও এই বিষণ্ণতার ছায়া পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দৃশ্যে বিষণ্ণতার আভাস আমরা পেয়ে যাই।

'জীবনস্মৃতি'র পাঠক মাত্রই আমরা জানি যে, রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে চিত্র-বিচিত্র করা কবি ম্যূরের রচিত একখানি আইরিশ মেলডিস ছিল। অক্ষয়বাবুর কাছে 'সেই কবিতা গুলির মুগ্ধ আবৃত্তি ' রবীন্দ্রনাথ অনেকবার শুনেছিলেন। তিনি মনে মনে আশা পোষণ করতেন একদিন এই কবিতাগুলি তিনি সুরে শিখে এসে অক্ষয়বাবুকে শেখাবেন। বিলেতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত গান কিছু শিখেছিলেন, সেই সঙ্গে অন্যান্য বিলেতি গানও শিখেছিলেন। এই বিলেতিগান শিখে আসার পর রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনায় হাত দেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> এই দেশী ও বিলাতি সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি প্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে।... সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই।[৫৭]

পূর্ববর্তী নাটক 'রুদ্রচন্ড'- এর কাব্য নাট্যের ফর্ম থেকে সরে এসে রবীন্দ্রনাথ সংগীতকে 'নাট্যকার্যে নিযুক্ত' করে গীতিনাট্যের ফর্মে লিখলেন 'বাল্মীকি প্রতিভা'। ফর্মের এই বদল কেন ঘটলো? আমাদের ধারণা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সংগীত চর্চা এই গীতিনাট্য রচনার পিছনে অনেকটা প্রভাব বিস্তার করেছে এবং পাশাপাশি বিলেতে বসবাসের সময় সেখানকার শেখা সংগীত এবং তা প্রয়োগ ঘটানোর আগ্রহের ফলেই 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচিত হল সংগীতে। এই গীতিনাট্য রচনার পিছনে কার কার প্রভাব রয়েছে তা আলোচনা করে দেখা যেতে পারে। কবি মূরের আইরিশ মেলডিজ- এর কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এ প্রসঙ্গে Edward Thompson-এর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে, "The tunes of the Genius of Valmiki are half Indian, half European, inspired by Moore's Irish Melodies."[৫৮] রবীন্দ্রনাথ যে দেশী-বিদেশী সুরের চর্চার মধ্যে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র জন্মের কথা বলেছেন Thompson তাকেই 'half Indian, half European' বলে উল্লেখ করেছেন। গানের সুরের ক্ষেত্রে এই দেশী-বিদেশীর মিলিত রূপ নাটকের কাঠামোগত রূপেরও পরিচয় বহন করে কিনা অর্থাৎ 'বাল্মীকি প্রতিভা' অপেরা ধর্মী না দেশীয় কথকতা ধর্মী তা আলোচনার পূর্বে আমরা এর সংগীতের বিষয়টি আলোচনা করে নিতে চাই। 'জীবনস্মৃতি'র দ্বিতীয় পান্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছিলেন, "অক্ষয়বাবুর রচিত দুই-তিনটি গান বাল্মীকি প্রতিভার মধ্যে আছে।"[৫৯] রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকারোক্তির সূত্র ধরে ড: সুকুমার সেন মনে করেন, " পিলু/ এখন কর্ব্ব কি বল," "রাগিনী বেলাবতী / তবে আয় সবে আয়", "জংলা ভূপালী / কালী কালী বলরে আজ"- এই তিনটি গান অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা।[৬০] তবে প্রশান্তকুমার পাল 'কালী কালী বলরে আজ' গানটি প্রসঙ্গে ভিন্নমত দিয়েছেন। তাঁর মতে, "গানটি Stephen Adams-এর Nancy Lee-র সুরে বসানো। মূল গানটি রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, সুতরাং ভাঙা গানটিও তাঁরই রচনা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। গানটির কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃতি করছি :

Of all the wives as ever you know
Yes ho ! Lads Ho ! yes ho ! yes ho !
There's none like Nancy Lee, I trow
Yes ho ! Lads Ho ! yes ho !"[৬১]

এ প্রসঙ্গে সুধীর চক্রবর্তীর মতটিও স্মরণ যোগ্য, "তাঁর বাংলা গান ভাব ও ভাষা কোন দিক থেকে মূর কে অনুসরণ করেনি।... এ ক্ষেত্রে সুরের উদ্দীপনাটুকু দস্যুদলের মনের উত্তেজনার ভাব প্রকাশে কাজে লেগেছে।... কিন্তু সতর্ক পাঠক লক্ষ্য করবেন yes ho এবং 'বলো হো' এই ধ্বনি নির্মাণের সমতাটুকু। বলা বাহুল্য, 'বল হো' ধ্বনি বাঙালী বা ভারতীয় দস্যুদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। ধ্বনিটি এসেছে

মূলের প্রভাবে।''[৬২] সুতরাং 'কালী কালী বলরে আজ' গানটি Stphen Adams-এর Nancy Lee-র সুরে বসানো রবীন্দ্রনাথের রচিত গান। অন্য গান দুটি, 'এখন কর্ব্ব কি বল ' এবং ' তবে আয় সবে আয়' অক্ষয় চৌধুরীর রচনা হতে পারে। আমাদের হাতে কোন তথ্য-প্রমাণ না থাকার কারণে আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না।

'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের 'সারদা মঙ্গল' থেকে ঋণ গ্রহণের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, ''এই সারদা মঙ্গলের আরম্ভ সর্গ হইতেই বাল্মীকি প্রতিভার ভাবটা আমার মাথায় আসে এবং সারদা মঙ্গলের দু'একটি কবিতাও রূপান্তরিত অবস্থায় বাল্মীকি প্রতিভায় গানরূপে স্থান পাইয়াছে।''[৬৩] এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অন্য আর এক জায়গায় লিখেছেন, ''সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন-কি, স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্যন্ত বিহারীলালের সারদা মঙ্গলের আরম্ভ ভাগ হইতে গৃহীত।''[৬৪] 'সারদা মঙ্গল' থেকে ভাব গ্রহণ করা হলেও শেষ পর্যন্ত ভাবগত বিচারে 'বাল্মীকি প্রতিভা' পুরোপুরি ভাবে স্বতন্ত্র। 'সারদা মঙ্গল'-এ মানবিক সম্বন্ধের জাল বুননির কোন আভাস মেলে না। শুধুই কবিত্ব প্রাপ্তির এক কাব্যিক বিন্যাস। যা ''কান পাতিয়া শুনিলে একটি স্বর্গীয় সংগীত সুধায় হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া ওঠে।''[৬৫] কিন্তু 'বাল্মীকি প্রতিভা' ''মানব সম্পর্ক ও মনস্তত্ত্বের ক্রমবিকাশের''[৬৬] চিত্র প্রস্ফুটিত করে মানবিক অনুভূতিতে আমাদের হৃদয় অভিষিক্ত করে দেয়। শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, '''বাল্মীকি প্রতিভা'য় রবীন্দ্রনাথের আজীবন কবি ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখা দিল হিংসার পরাজয় ও প্রেমের জয় তথা মানব ধর্মের জয়। সেখানে তিনি কৃত্তিবাস ও বিহারীলালকে অতিক্রম করে গেছেন সেই তরুণ বয়সে।''[৬৭]

''সে-যুগের ভাঙনপন্থী যুবকদের গুরুস্বরূপ''[৬৮] হার্বার্ট স্পেনসরের The origin and Function of Music প্রবন্ধটি পাঠ করার মধ্য দিয়েই সংগীত সম্পর্কে একটি নতুন ধারণা 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ লাভ করেন এবং এই ভাবনারই প্রয়োগ ঘটান 'বাল্মীকি প্রতিভা'য়। ''এই ভাবনা হইতে 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্যের জন্ম। এই সময়ে তাঁহার ভাবনাকে রূপদানের সুযোগও মিলিল।''[৬৯] এ প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আমরা উদ্ধৃত করলাম—

> হার্বার্ট স্পেনসরের একটা লেখার মধ্যে পড়েছিলাম যে, সচারাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনি কিছুনা কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত, রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবল মাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষসাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেনসরের এই কথাটা মনে

> লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন। আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেষ্টা আছে; তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তাহা তাল মান সংগত রীতিমত সংগীত নহে।[৭০]

'বাল্মীকি প্রতিভা'য় যেমন 'দেশী ও বিলেতি সুরের চর্চা' হল তেমনি নাট্য আঙ্গিকের ক্ষেত্রে স্পেনসরের মতটিকে গ্রহণ করে "আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয়" করা হ'ল। সংগীতের এই পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনার সমসাময়িক কালে রবীন্দ্রনাথ সংগীত বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ রচনা করেন। 'সংগীত ও ভাব' মেডিকেল কলেজ হলে পাঠ করলেন ১২৮৮-র ৮ বৈশাখ, ১২৮৮-র জৈষ্ঠ্য সংখ্যার ভারতীতে তা ছাপা হ'ল। স্পেনসরের The Origin and Function of Music প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখলেন 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' (হার্বার্ট স্পেনসরের মত), ১২৮৮ আষাঢ় সংখ্যা ভারতীতে তা ছাপা হ'ল। 'সংগীত ও কবিতা' শিরোনামে প্রবন্ধটি ছাপা হ'ল ১২৮৮ মাঘ সংখ্যা ভারতীতে। এই প্রবন্ধ গুলি রচনার পিছনে স্পেনসরের প্রভাব প্রবল ভাবে কাজ করেছিল বলে আমাদের ধারণা। তবে স্পেনসর পাঠের আগেই রবীন্দ্রনাথ 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন। " 'সংগীত ও ভাব' - প্রবন্ধ রচনার পর হার্বার্ট স্পেনসরের রচনাবলী পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম 'The Origin and Function of Music'- নামক প্রবন্ধে যে-সকল মত অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা আমার মতের সমর্থন করে,.. ।"[৭১] মানুষের মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সংগীত এই বক্তব্যটিই রবীন্দ্রনাথ The Origin and Function of Music অবলম্বনে লিখিত 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' প্রবন্ধে উপস্থাপন করেছেন। সংগীতের মাধ্যমে মানুষের মনোভাব প্রকাশের এই পদ্ধতি গীতিনাট্যের কাঠামোগত দিক থেকে গ্রহণ করে 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচিত হলেও একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে উত্থাপন করা যেতে পারে, তা হ'ল 'বাল্মীকি প্রতিভা' কি অপেরা? অনেকেই 'বাল্মীকি প্রতিভা'কে বিদেশী অপেরার অনুকরণে লিখিত বলে দাবী করেছেন। আবার অনেকে একে দেশীয় কথকতার আঙ্গিকে লিখিত বলে মনে করেন। আমরা উভয় মত পর্যালোচনা করে আমাদের মত প্রকাশে সচেষ্ট হব। সৌমিত্র বসু ও বার্ণিক রায় হ্যাগনেরের Music Drama-র সঙ্গে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। সৌমিত্র বসুর মতে—

> ১৮৭৮-৭৯ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইংল্যান্ডে, হ্যগনারীয় অপেরা য়ুরোপে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই জনপ্রিয়তার প্রভাব রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ না

করার কোন কারণ নেই। 'বাল্মীকি প্রতিভা' যে হুগনারীয় ধরণে কথা, সুর ও শরীরের সুসমঞ্জস প্রয়োগের কথা মনে রেখে লেখা তাই শুধু নয়, এই নাট্যাচার্যের মতই তিনি বিষয় হিসেবে বেছে নিচ্ছেন পুরাণ কথা বা কিংবদন্তী এবং তাকে ব্যবহার করতে চাইছেন চিরায়ত সত্য হিসাবে।[৭২]

বার্ণিক রায় জানাচ্ছেন—

> হ্বাগনেরের ১৮৭৭ সালে তাঁর বিখ্যাত রিচুয়াল-সমন্বিত 'পার্সিফাল' রচনা করেছেন জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসে; এই বছরই লন্ডনের আলবার্ট হলে সাতই মে থেকে ঊনত্রিশ মে পর্যন্ত আর্টটি কনসার্ট বাজিয়ে শোনান। হ্বাগনেরের সংগীত ও গীতিনাট্য তখন লন্ডনে স্যাভয় থিয়েটারের বিরুদ্ধে নতুন সংগীত গীতিনাট্যের প্রেরণা এনে দিয়েছে; প্রায়শ অভিনীত হচ্ছে বিভিন্ন থিয়েটারে হ্বাগনেরের গীতিনাট্য। আর সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে এসে পৌঁছুলেন; তাই তখন স্যাভয় থিয়েটারের হাসিঠাট্টা কৌতুকময় অপেরা ও হ্বাগনেরের গীতিনাট্য বা মুজিক ড্রামা দুয়েরই স্পর্শ ও প্রেরণা লেগেছে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে।[৭৩]

প্রথমবার বিলেতে বসবাস কালে এই জাতীয় নাটক দেখা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব নয় কিন্তু তাই বলে আমরা, ''বিলেতি অপেরার আদর্শে লেখা হয়েছিল 'বাল্মীকি প্রতিভা' ''[৭৪] এতটা সরলীকরণ বোধহয় করতে পারি না। পুলিন দাস মন্তব্য করেছেন—

> ইংল্যান্ড বাসের সময় লন্ডন অপেরার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটাই স্বাভাবিক। হাববুর্গ-এর বেহালা বাদক কার্ল রোসা প্রযোজিত 'দ্য ফ্লাইং ডাচম্যান' (১৮৭৬), 'রিয়েনজি' (১৮৭৯), 'কারমেন' (১৮৭৯) প্রভৃতি তখন লন্ডনে খুবই জনপ্রিয়। বিলেতি অপেরার অনুকরণ নয় 'বাল্মীকি প্রতিভা'। ইউরোপীয় অপেরায় গানের আধিপত্য এতো প্রবল যে গান যখন গাওয়া হতে থাকে নাটকের গতি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। 'বাল্মীকি প্রতিভার অভিনয়টাই মুখ্য' হওয়াতে সঙ্গীত এমনভাবে প্রযুক্ত যে নাট্যকে সে প্রতিহত করে না সচল করে রাখে। অপেরা নয় বরং দেশীয় কথকতার ধারাটাকেই রবীন্দ্রনাথ নতুন ভাবে প্রয়োগ করে গড়ে তোলেন 'বাল্মীকি প্রতিভা'কে''।[৭৫]

ড: গৌরীশংকর ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, "... রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রার উন্নত রূপ বলিয়া মনে করা যায় কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।"[৭৬] 'বাল্মীকি প্রতিভা' সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, "প্রাচীণ কৃষ্ণযাত্রায় এই রীতি অবলম্বন করা হইত।"[৭৭] রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে এ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন—

> বস্তুত বাল্মীকি প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্য গ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নতুন পরীক্ষা; অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোন স্বাদ গ্রহণ সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকি প্রতিভা তাহা নহে, ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্য বিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র, স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে।[৭৮]

অপেরা হিসেবে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র পরিচয় রবীন্দ্রনাথ নিজেই নাকচ করে দিয়েছেন। এখানে সংগীত মুখ্য নয়, নাটকই মুখ্য। অপেরা সংগীত প্রধান সেখানে নাটক মুখ্য নয়। "There is first of all the convention by which the whole drama is sung instead of being spoken; and besides this there are often occasions when the whole action of the play is held up while piece of music is sung."[৭৯] কিন্তু 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় সুরের কোন প্রাধান্য নেই এবং সে কারণেই নাটকের গতি থমকে যাওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। সেখানে "কথাবার্তার আনুষঙ্গিক সুরটাই উৎকর্ষ সাধন করিয়া"[৮০] নাট্যকাঠামোয় প্রয়োগ করা হয়েছে। আমাদের ধারণা হার্বার্ট স্পেনসরের সংগীত সম্পর্কিত তত্ত্বের প্রভাব এবং দেশীয় কথকতা, যাত্রা, পালাগান ইত্যাদির মিশেলে 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচিত হয়েছে। অপেরার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্যের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের বিশ্বাস হ্যাগনেরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যদি রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনা করতেন তবে অবশ্যই তা 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করতেন। যেখানে তিনি 'বিলেতি সুরের চর্চা'র কথা এবং হার্বার্ট স্পেনসরের প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন সেখানে কেন তিনি হ্যাগনেরের প্রভাব বা অপেরার প্রভাবের কথা লিখলেন না তা ভাববার বিষয়। বিলেতে অপেরা দেখার অভিজ্ঞতাও যেমন আছে তেমনি ছোট বেলার দেখা যাত্রা এবং পালাগানের অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে। সুতরাং 'বাল্মীকি প্রতিভা' অপেরার আদলে নয় বরং দেশীয় কথকতা, পালাগান এবং যাত্রার আদলেই নির্মিত হয়েছে এবং তার সাথে মিশেছে হার্বার্ট স্পেনসরের "The Origin and Function of Music"-এর অনুপ্রেরণা।

পরবর্তী পর্যায়ে যখন রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারার নাটকের বিকাশ ঘটবে সেখানে দেখা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথ দেশীয় যাত্রার ফরমটিকে গ্রহণ করে বাংলা নাটকে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন।

আমাদের ধারণা তারই সূত্রপাত এই 'বাল্মীকি প্রতিভা'তে। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারার নাটকের বীজাকার সম্ভাবনা 'বাল্মীকি প্রতিভা'তেই আমরা প্রত্যক্ষ করি।

গ. কাল মৃগয়া

অভিনয়ের প্রয়োজনে রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে যেমন লেখা হয়েছিল 'বাল্মীকি প্রতিভা' তেমনি 'কালমৃগয়া'ও রচিত হ'ল অভিনয়ের প্রয়োজনে এবং রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে। 'কালমৃগয়া' প্রকাশিত হয় ৫ ডিসেম্বর ১৮৮২।[৮১] বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে এর অভিনয় হয় ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮২।[৮২] 'কালমৃগয়া' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> বাল্মীকি প্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরো একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমৃগয়া। দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ তাহার নাট্যবিষয়। তেতালার ছাদে স্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল; ইহার করুণ রসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। পরে, এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকি প্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।[৮৩]

'বাল্মীকি প্রতিভা'য় সংগীত সম্পর্কিত যে নতুন পন্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হ'ল তারই আলোকে রচিত হল 'কালমৃগয়া', আর এই রচনায় প্রাধান্য পেল করুণ রস। 'বাল্মীকি প্রতিভা'র সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার কারণে 'কালমৃগয়া'র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষিত হয়নি। কিন্তু অনেক পরে রবীন্দ্ররচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের প্রথম খন্ডে 'কালমৃগয়া' স্থান পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, ''দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্ররচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের প্রথম খন্ডে (আশ্বিন ১৩৪৭) নাটিকাটি পুনর্মুদ্রিত হয় (দ্রঃ অ- ১। ৩১৭ - ৩৮)। গীতবিতান ৩য় খন্ড সংকলন কালে (আশ্বিন ১৩৫৭) নাটিকাটি 'গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য' পর্যায়ে মুদ্রিত হয় (দ্রঃ ৩ / ৬১৭- ৩৪)।''[৮৪]

'কালমৃগয়া' ছয়টি দৃশ্যে বিন্যস্ত নাটিকা। অন্ধ ঋষি তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তার একমাত্র পুত্রকে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল আনতে বলে। কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার তাকে নিষেধ করে। কারণ—

> গভীর রজনী, ঘোর ঘন গরজে,
> তুই যে এ অন্ধের নয়ন তারা। (৩য় দৃশ্য)

ঋষিকুমার পিতার নিষেধ অমান্য করে সরযু নদী থেকে জল আনতে যায়। চতুর্থ দৃশ্যে বনদেবতার গানে অশুভের ইঙ্গিত প্রতিধ্বনিত হয় —

সব চরাচর আকুল —
কি হবে কে জানে,
ঘোর রজনী,
দিক - ললনা ভয় বিহ্বলা। (৪র্থ দৃশ্য)

বনদেবীগণ ঋষি কুমারকে নিষেধ করে —

এই ঘোর আঁধার, কোথা রে যাও!
ফিরিয়ে যা, তরাসে প্রাণ কাঁপে। (৪র্থ দৃশ্য)

কিন্তু পিতা যে তৃষ্ণায় কাতর তাই ঋষিকুমার বলে—

না, কোরো না মানা, যাব ত্বরা। (৪র্থ দৃশ্য)

বনদেবীগণের নিষেধ অমান্য করে ঋষিকুমার জল আনতে যায়। বনদেবীগণ গেয়ে ওঠে —

... অমঙ্গল হেন প্রাণে জাগে কেন,
থেকে থেকে যেন প্রাণ কেঁদে ওঠে। (৪র্থ দৃশ্য)

পঞ্চম দৃশ্যে শিকারীদের সঙ্গে দশরথকে শিকারের সন্ধান করতে দেখা যায়। এই দৃশ্যটি 'বাল্মীকি প্রতিভা'র চতুর্থ দৃশ্যটিকে স্মরণ করায়। সরযূ তীরে জলপান করার শব্দ শুনে দশরথ বাণ নিক্ষেপ করে, নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে বনদেবীগণ বিলাপ করে ওঠে —

হায় কি হ'ল! হায় কি হ'ল! (৫ম দৃশ্য)

দশরথের নিক্ষিপ্ত এই বানে মৃত্যু ঘটে ঋষিকুমারের। ৬ষ্ঠ দৃশ্যে দেখা যায় দশরথ ঋষিকুমারের মৃতদেহ নিয়ে আসে অন্ধঋষির কাছে। একমাত্র পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে অন্ধঋষি দশরথকে অভিশাপ দেয়। দশরথ ঋষির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে —

ক্ষমা কর মোরে তাত,
আমি যে পাতকী ঘোর ,
না জেনে হয়েছি দোষী,
মার্জ্জনা নাহি কি মোর! (৬ষ্ঠ দৃশ্য)

কিছুক্ষণ পর দশরথকে ঋষি বলে ওঠেন—

শোকতাপ গেল দূরে,
মার্জ্জনা করিনু তোরে! (৬ষ্ঠ দৃশ্য)

এই হচ্ছে কালমৃগয়ার কাহিনী।

এখানে নাট্যদ্বন্দ্বের কোনই প্রকাশ নেই। অন্ধ ঋষির অন্তরে পুত্রের মৃত্যু জনিত কারণে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয় তা পরমুহূর্তেই আবার নির্বাপিত হয়ে ঋষির ক্ষমাশীল অন্তর জাগ্রত হয়ে ওঠে। ক্ষণিকের বিধ্বস্ত মন 'মার্জ্জনা'র মহান উদ্ভাসনে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। একে কি মানসিক উত্তরণ বলবো আমরা? কিন্তু উত্তরণ ঘটার আগে যে মানসিক দ্বন্দ্বের প্রয়োজন তারই বা অবকাশ এখানে কোথায়? এখানে শুধুই দ্বন্দ্বহীন এক করুণ উপাখ্যানের প্রকাশ। ''ইহার করুণ রসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন'' ঠিকই কিন্তু এর নাট্যদ্বন্দ্বের আঘাতে নিশ্চয়ই শ্রোতারা ক্ষত-বিক্ষত হননি। কারণ এই ক্ষুদ্র নাটিকায় কোথাও কোন দ্বন্দ্বের চিহ্নমাত্র নেই। না ঘটনার দ্বন্দ্ব, না চরিত্রের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব কোন-কিছুরই আভাস এই নাটকে মেলে না। আর সে কারণেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন অনুভব করেননি, পরবর্তীকালে বাল্মীকি প্রতিভার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। 'কালমৃগয়া'র করুণ রস প্রসঙ্গে বার্ণিক রায় মন্তব্য করেছেন, ''এর কারণ হচ্ছে এই যে মার্গ সংগীতের বিশুদ্ধ সুর এমন গভীরে মানুষের মনকে দোলা দিয়ে অসীমের দিকে আকৃতি জানিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে যে, তখন অভিনয়ের বুদ্ধি কৌশল ও অন্তরের দ্বৈতলীলা কাহিনী বা ঘটনাকে আর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না।''[৮৫]

রবীন্দ্রনাট্যের এই পর্যায়ের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য কারুণ্য তা অন্যান্য নাটকের মত 'কালমৃগয়া'-তেও উপস্থিত। কিন্তু অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো একেবারেই অনুপস্থিত। যেমন এই পর্যায়ের প্রতিটি নাটকে একজন করে বালিকার উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই, যে বালিকার দ্বারা নাটকের মূল -বিষয় নিয়ন্ত্রিত। 'কালমৃগয়া'য় লীলা শুধু মাত্র ঋষিকুমারের খেলার সাথী। কাহিনী নিয়ন্ত্রণে তার কোনই ভূমিকা নেই। কিন্তু 'কালমৃগয়া'তে নতুন সংযোজিত হয়, 'বনদেবীগণ'। এ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, ''এই কালমৃগয়াতে প্রথম বনদেবীর পাট শুরু হয়।''[৮৬] রবীন্দ্রনাথ এই 'বনদেবীগণে'র ধারণাটি কোথা থেকে গ্রহণ করলেন? এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, ''আমাদের মনে হয় বনদেবীগণ গ্রীকনাটকের কোরাসের দূরপ্রতিধ্বনি এবং লৌকিক যাত্রা অভিনয়ের সখীদের সংস্কৃত রূপ।''[৮৭] গ্রীক নাটকে কোরাস একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে নাটকের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকে। নাট্যক্রিয়ায় পরবর্তী কালে সংঘটিত

কাহিনীর আগাম আভাস কোরাসের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। 'কালমৃগয়া'র বনদেবীগণের সঙ্গে গ্রীকনাটকের কোরাসের 'দূর প্রতিধ্বনি'র যে কথা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন তা সমর্থন যোগ্য বলে আমরা মনে করি। কারণ নাট্যক্রিয়ায় মূল ভূমিকা পালন না করলেও নাট্যক্রিয়ার পরবর্তী ঘটনার আগাম আভাস বনদেবীগণের মাধ্যমে আমরা পাই। যেমন চতুর্থ দৃশ্যে বনদেবীগণ ঋষিকুমারকে জল আনতে যেতে নিষেধ ক'রে বিপদের আগাম আভাস দিচ্ছে —

এই ঘোর আঁধার কোথারে যাস!
ফিরিয়ে যা তরাসে প্রাণ কাঁপে!
স্নেহের পুতুলি তুই,
কোথা যাবি একা এ নিশীথে!
কি জানি কি হবে, বনে হবি পথহারা!

ঋষিকুমার নিষেধ না শুনে জল আনার জন্য চলে গেলে বনদেবীগণ গেয়ে ওঠে —

অমঙ্গল হেন প্রাণে জাগে কেন,
থেকে থেকে যেন প্রাণ কেঁদে ওঠে !

অভিনেতার সঙ্গে কোরাসের কথোপকথনের যে বৈশিষ্ট্য গ্রীক নাটকে দেখা যায় তারও পরিচয় মেলে 'কালমৃগয়া'র চতুর্থ দৃশ্যে ঋষিকুমারের সঙ্গে বনদেবীগণের সংলাপে। সুতরাং এসব দিক বিবেচনায় নিলে রবীন্দ্র জীবনীকারের মতকে সমর্থন করতে হয়। কিন্তু বনদেবীগণ যাত্রার ''সখীদের সংস্কৃত রূপ'' এই মন্তব্যটি বোধহয় মানা যায় না। কারণ, যাত্রার সখীরা কাহিনীর সঙ্গে কখনই সম্পৃক্ত নয় কিন্তু বনদেবীগণ নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। শুধু নাচ-গানের নিরিখে বিচার করলে এই দুটো জিনিসকে একসাথে মিলিয়ে নেবার কোন অবকাশ থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীতে যখন 'মায়ার খেলা' লেখেন তখন সেই নাটকে আমরা 'মায়াকুমারীগণে'র উপস্থিতি দেখতে পাই। আমাদের ধারণা 'মায়াকুমারীগণ' 'কালমৃগয়ার' এই 'বনদেবীগণের' আদলেই তৈরী।

সুকুমার সেন 'কালমৃগয়া' প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন, ''প্রথম দৃশ্যে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর পূর্বাভাস আছে।''[৮৮] ড: সেন কি কারণে 'কালমৃগয়া'র প্রথম দৃশ্যে 'প্রকৃতির-প্রতিশোধ'-এর পূর্বাভাস পেলেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। ''এই পালার মধ্যে এই তত্ত্বকথাটুকু পরিস্ফুট যে অন্ত: প্রকৃতি হোক আর বহিঃপ্রকৃতি হোক তাহাকে নিপীড়ন অথবা প্রত্যাখ্যন করিয়া মানুষ জীবনের দু:খ পরম্পরা

এড়াইতে সমর্থ হয়না, অর্থাৎ নিরপেক্ষ স্বাধীনতা বা আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভ করিতে পারে না।''[৮৯] এই যদি 'প্রকৃতির -প্রতিশোধ'-এর মূল তত্ত্ব হয় তাহলে তার পূর্বাভাস কী ভাবে 'কালমৃগয়া'র প্রথম দৃশ্যে ধরা পড়ে! 'কালমৃগয়া'র প্রথম দৃশ্য তো শুধু মাত্র দুটো বালক-বালিকার কথোপকথন। একজন লীলা এবং অন্যজন ঋষিকুমার। আমরা এই দু'জনের সংলাপ সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করছি। এর মাধ্যমেই পরিষ্কার হবে যে 'কালমৃগয়া'র প্রথম দৃশ্য শুধু মাত্র খেলার ছলে দুটো বালক-বালিকার সংলাপ, সেখানে কোনই তত্ত্ব কথা নেই।

লীলা। ও ভাই, দেখে যা,
কত ফুল তুলেছি!

ঋষিকুমার। তুই আয়রে কাছে আয়,
আমি তোরে সাজিয়ে দি! ...

লীলা। ও দেখবি রে ভাই, আয়রে ছুটে,
মোদের বকুল গাছে
রাশি রাশি হাসির মত
ফুল কত ফুটেছে।...

লীলা। কাল সকালে উঠব মোরা
যাব নদীর কূলে —
শিব গড়িয়ে করবো পূজো,
আনব কুসুম তুলে।

ঋষিকুমার। মোরা ভোরের বেলা গাঁথব মালা,
দুলব সে দোলায়,
বাজিয়ে বাঁশি গান গাহিব
বকুলের তলায়।

লীলা। না ভাই, কাল সকালে মায়ের কাছে
নিয়ে যাব ধরে,
মা বলেছে ঋষির সাজে
সাজিয়ে দেবে তোরে।

ঋষিকুমার। সন্ধ্যা হয়ে এল যে ভাই,

এখন যাই ফিরে —

একলা আছেন অন্ধ পিতা

আঁধার কুটীরে।

এই হচ্ছে 'কালমৃগয়া' নাটকের প্রথম দৃশ্যে লীলা ও ঋষিকুমারের সংলাপ। এখানে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের পূর্বাভাস কোথায়?

ঘ. প্রকৃতির প্রতিশোধ

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' বই আকারে প্রকাশিত হয় ২৯ এপ্রিল ১৮৮৪। 'বেঙ্গললাইব্রেরীর পুস্তক তালিকা অনুযায়ী' এই তথ্যটি দিয়েছেন প্রশান্তকুমার পাল।[৯০] তবে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লেখার সূচনা হয়েছিল কারোয়ারে ১৮৮৩ সালে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''এই কারোয়ারে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক নাট্যকাব্যটি লিখিয়াছিলাম''।[৯১]

একজন সন্ন্যাসীকে ঘিরে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর কাহিনী নির্মাণ হয়েছে। প্রকৃতির মায়াফাঁদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সন্ন্যাসী গুহার আঁধারে সাধনায় নিমগ্ন হয়। সাধনায় সিদ্ধি লাভের পর গুহা থেকে বেরিয়ে এসে সংসার, সাধারণ মানুষের ক্রিয়াকর্ম তার কাছে মনে হয় তুচ্ছ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সন্ন্যাসীই আবার পৃথিবীর মায়ায় জড়িয়ে পড়ে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর এই কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে ১৬টি দৃশ্যে। প্রথম দৃশ্যে- দৃশ্যপট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 'গুহা'। 'আঁধারে গুহার মাঝে' সন্ন্যাসী দীর্ঘদিন ধরে সাধনা করছে। 'রাক্ষসী প্রকৃতি'র 'মায়াফাঁদ' থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সন্ন্যাসীর এই সাধনা। সন্ন্যাসী বলছে —

কী কষ্ট না দিয়েছিস রাক্ষসী প্রকৃতি

অসহায় ছিনু যবে তোর মায়া ফাঁদে। ...

বাসনারে ডেকে এনে প্রলোভন দিয়ে

নিয়ে গিয়েছিস মহা দুর্ভিক্ষ-মাঝারে। (১ম দৃশ্য)

'রাক্ষসী প্রকৃতি'র প্রতি প্রতিশোধ নেবার জন্য ধ্যান নিমগ্ন সন্ন্যাসীর গুহাবাসে ''অনাদি কালের রাত্রি সমাধিমগনা/ নিশ্বাস করিয়া রোধ পাশে বসে আছে।'' শিলার ফাটল দিয়ে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়ছে, আঁধারে 'প্রাচীন ভেকের দল' ঘুমিয়ে আছে, বাদুড় দূর থেকে নিয়ে আসে অমানিশীথের বার্তা,

আবার কখনো কখনো 'দিবসের গুপ্তচর রজনীর মাঝে' একটি আলোর রেখা কোথা থেকে এসে উঁকি মেরে আবার মিলিয়ে যায়। এরই মাঝে একদিন সন্ন্যাসীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটে। এরপর সন্ন্যাসী বেরিয়ে আসে গুহার অন্ধকার থেকে এবং প্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করে বলে—

দেখাব হৃদয় খুলে, কহিব তোমারে,
এই দেখ তোর রাজ্য মরুভূমি আজি,
তোর যারা দাস ছিল স্নেহ প্রেম দয়া
শ্মশানে পড়িয়া আছে তাদের কঙ্কাল,
প্রলয়ের রাজধানী বসেছে সেথায়। (১ম দৃশ্য)

দ্বিতীয় দৃশ্য 'রাজপথ'। গুহা থেকে বেরিয়ে সন্ন্যাসী পথের ধারে দাঁড়িয়ে চলমান সংসারকে দেখছে। তার মনে হচ্ছে যে বিরাট মুক্তি সে পেয়েছে তার তুলনায় এই বিশ্ব ক্ষুদ্র। এই চলমান মানুষ সন্ন্যাসীর কাছে অপরিচিত মনে হচ্ছে। সে বুঝতে পারছে না কেন এরা কোলাহল করছে, এরা কি চায়, কিসের জন্য এরা এত ব্যস্ত। সাধনার আগে বিশ্ব বৃহৎ ছিল, 'তখন মানুষ ছিল মানুষের মতো', কিন্তু আজ সাধনার দ্বারা প্রেম, প্রীতি, স্নেহ বন্ধন থেকে মুক্ত সন্ন্যাসীর কাছে সবই অর্থহীন মনে হচ্ছে, সবই ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে। এক অবজ্ঞার দৃষ্টি নিয়ে তাই সন্ন্যাসী সংসারের খেলা দেখছে। গান গাইতে গাইতে একদল কৃষক প্রবেশ করে। তারা গাইছে "হেদে গো নন্দরানী,/ আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।" শ্যামকে নিয়ে তারা গোষ্ঠে যাবে, কারণ প্রভাত হচ্ছে, সূর্য উঠছে, বনে বনে ফুল ফুটেছে, এমন দিনে ঘরে বসে থাকা যায় না। এই সুন্দর দিনে তারা শ্যামকে নিয়ে আনন্দ করবে। এই গানটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' এবং 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সূচনা অংশে উল্লেখ করেছেন। 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন—

> কারোয়ার হইতে ফিরিবার সময় জাহাজে প্রকৃতির প্রতিশোধের কয়েকটি গান লিখিয়াছিলাম। বড়ো একটা আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া সুর দিয়া গাহিতে গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম -
>
> হ্যাদে গো নন্দরানী,
> আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও...
>
> সকালের সূর্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, রাখালবালকরা মাঠে যাইতেছে - সেই সূর্যোদয়, সেই ফুল ফোটা, সেই মাঠে বিহার, তাহারা শূন্য রাখিতে চায় না; সেই খানেই তাহারা তাহাদের শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিতেছে, সেই খানেই অসীমের সাজপরা রূপটি তাহারা দেখিতে চায়; সেই খানেই

> মাঠে-ঘাটে বনে-পর্বতে অসীমের সঙ্গে আনন্দের খেলায় তাহারা যোগ দিবে বলিয়াই তাহারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে; দূরে নয়, ঐশ্বর্যের মধ্যে নয়, তাহাদের উপকরণ অতি সামান্য, পীতধড়া ও বনফুলের মালাই তাহাদের সাজের পক্ষে যথেষ্ট - কেন না, সর্বত্রই যাহার আনন্দ তাহাকে কোনো বড়ো জায়গায় খুঁজিতে গেলে, তাহার জন্য আয়োজন আড়ম্বর করিতে গেলেই লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিতে হয়।[৯]

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর 'সূচনা'য় লিখেছেন —

> কারোয়ার থেকে জাহাজে আসতে আসতে হঠাৎ যে গান সমুদ্রের উপর প্রভাত সূর্যালোকে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল তাকে নাট্যীয় বলা যেতে পারে, অর্থাৎ সে আত্মগত নয়, সে কল্পনায় রূপায়িত। 'হেদে গো নন্দরানী' গানটি একটি ছবি, যার রস নাট্যরস।[১০]

দু'টি বিপরীত দৃশ্যের অবতারণা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ এই গানটি সংযোজনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যা 'নাট্যীয়'। একদিকে সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রশান্তি লাভ, যা সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত, অন্যদিকে তুচ্ছতার মধ্যে আনন্দের অনুসন্ধান, কৃষকদের গানে যা উপস্থাপিত। একদিকে সন্ন্যাসী, আর একদিকে সংসার। একদিকে জীবন বিমুখতা আর একদিকে জীবনমুখিনতা। এই বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বই ধীরে ধীরে এই নাটকে প্রকটিত হয়ে উঠবে। চলমান দৃশ্যের মত কৃষকরা সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে বালক পুত্র সহ একজন স্ত্রীলোক। তারপর প্রবেশ করে কিছু পথিক। এভাবেই একের পর এক মানুষের দল প্রবেশ করে এবং তাদের নিত্যদিনের সুখ-দুঃখের কথা শুনিয়ে যায়। আর সন্ন্যাসী সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পথের ধারে বসে থেকে মানুষের চলমান দৃশ্য দেখে ভাবে —

> সকাল হইতে আছি, কী দেখনু হেথা?
> এ দীর্ঘ পরান মোর সংকুচিত ক'রে
> পারি কি এদের সাথে মিশিতে আবার।
> কী ঘোর স্বাধীন আমি! কী মহাআলয়।
> জগতের বাধা নাই — শূন্যে করি বাস। (২য় দৃশ্য)

তৃতীয় দৃশ্য, 'অপরাহ্ন। পথ'। এই দৃশ্যে ধর্মভ্রষ্ট রঘুর দুহিতার সঙ্গে সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হয়। সবাই যখন এই বালিকাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে তখন বালিকা সন্ন্যাসীর কাছে এসে আশ্রয় প্রার্থণা করে। সন্ন্যাসী

বালিকাকে নিয়ে বালিকার কুটিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে পথের এই পটভূমিতে বালিকার সাক্ষাৎ একটি ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে এসেছে। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

চতুর্থ দৃশ্য, 'পথপার্শ্বে বালিকার ভগ্নকুটীর'। এই দৃশ্যে সন্ন্যাসীর দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। বালিকা পিতা বলে সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী চমকে ওঠে, "আহা পিতা বলে কে ডাকিলি ওরে!" কিন্তু এ ক্ষণিকের জন্য। পরমুহূর্তেই সন্ন্যাসীর মনে হয় "জগৎ জীবন্ত মৃত্যু—অনন্ত যন্ত্রণা!" এক সময় সন্ন্যাসীর মনে হয় প্রকৃতি মায়াফাঁদ পেতে আবার তাকে বন্দি করতে চাচ্ছে, "যেন এই বালিকার ছোটো হাত দুটি/ হৃদয়েরে অতি ধীরে করিছে বেষ্টন", তাই পলায়ন প্রয়োজন, "পালা, পালা, এই বেলা, পালা এই বেলা।" কিন্তু দীর্ঘদিনের সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ করেছে সে পালাবে কেন? সে তো প্রকৃতিকে জয় করেছে। তাই সন্ন্যাসীকে বলতে হয় —

কোলাহল-মাঝে আমি রচিব নির্জন,
নগরে পথের মাঝে তপোবন মোর,
পাতিব প্রলয়াসন সৃষ্টির হৃদয়ে। (চতুর্থ দৃশ্য)

পঞ্চম দৃশ্য, 'গুহাদ্বারে'। এই দৃশ্যে শুধু বালিকা আর সন্ন্যাসীর কথোপকথন। সন্ন্যাসীর মধ্যে এখন থেকে চলেছে দুই জগতের দ্বন্দ্ব। বালিকাকে স্পর্শ করে মনে হচ্ছে "আহা, তোর স্পর্শ ধ্যানের মতন-/ সীমা হতে নিয়ে যায় অসীমের দ্বারে"। আবার পর মুহূর্তেই মনে হচ্ছে "এ কি মায়া? এ কি স্বপ্ন? এ কি মোহ মোর?" এই দোলাচলতাকে অনেকটা বাস্তবসম্মত করার জন্য কয়েকটি দৃশ্য ব্যবহার করেছেন লেখক। তার চিত্ত চাঞ্চল্য - গুহাবন্দী জীবনকে গ্রহণ করার ইচ্ছা এবং এই সংসারের দিকে টান সব মিলিয়ে নাট্যকার তার মাধ্যমে বাস্তব সম্মত মানুষের জীবনের টানাপোড়েনের ইংগিত দিতে চান যেন।

ষষ্ঠ দৃশ্যে সন্ন্যাসীর অন্তরের দ্বন্দ্বটি পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পায়। এই দৃশ্যে দৃশ্যপট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে গুহাদ্বার, সময় অপরাহ্ন। গুহাদ্বারও সন্ন্যাসীর অর্ন্তদ্বন্দ্বের প্রতীক হয়ে ওঠে। বালিকা বন থেকে ফুল তুলে এনে গুহাদ্বারে সন্ন্যাসীর জন্য অপেক্ষা করছে। এখন সন্ন্যাসীর সবই অর্থহীন মনে হয়। তার মনে হয়, "এ কীরে মদিরা আমি করিতেছি পান!" যেন "ধীরে ধীরে মোহময় মরণের ছায়া" গ্রাস করছে। তাই ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ন্যাসী বলছে, "দূর হোক-এসকল কিছু ভালো নয় -"। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার তাকে বলতে হয় "বাছারে, অমন করে চাহিয়া কেন রে!". সন্ন্যাসীর চিত্তচাঞ্চল্য আরও বেশি ভাবে প্রকট হতে দেখা যায় এই দৃশ্যের শেষে যখন সন্ন্যাসী বলে ওঠে—

দাও, বৎসে, এনে দাও ফল ফুল তব,

দেখাও কোথায় বাছা লতাটি তোমার -

না, না, আমি চলিলাম নগর ভ্রমিতে।

দু দন্ড বসিয়া থাকো, আসিব এখনি।

সপ্তম দৃশ্য, 'পর্বত শিখরে সন্ন্যাসী '। এই দৃশ্যেও একদিকে সন্ন্যাসী আর একদিকে সাধারণ মানুষ। সন্ন্যাসী পর্বত শিখরে বসে রাস্তার মানুষকে প্রত্যক্ষ করছে। মানুষের কণ্ঠে গান, এই গানে উঠে এসেছে প্রকৃতি বন্দনার কথা এবং প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষার কথা। কিন্তু সন্ন্যাসী পর্বত শিখর চূড়ায় বসে প্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করে বলছে—

আমি আজি প্রভূ তোর, তুই দাসী মোর,

মায়াবিনী দেখা তোর মায়া অভিনয়,

দেখা তোর জগতের মহা ইন্দ্রজাল।

অষ্টম দৃশ্য, 'গুহাদ্বারে'। এখানে সন্ন্যাসীর মনের রূপান্তর প্রকাশ পেয়েছে। গুহাদ্বারে বালিকা, সন্ন্যাসী বলছে—

আয় তোরা কাছে আয়, কে আসিবি আয় —

সকলি সুন্দর হেরি এ বিশ্বজগতে।

গুহা দেখে তার মনে হচ্ছে, ''এ কী অন্ধকার হেথা! এ কী বদ্ধ গুহা!'' আর গুহার বাইরে, ''আহা এ কী সুমধুর! এ কী শান্তি সুধা!'' কিন্তু তখনো সন্ন্যাসীর মুক্তি-মোহ সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যায় নি। তাই তাকে দেখা যায় দ্বিধা-চঞ্চল। সে তো অনন্তের পানে ভেসে চলেছে, তার ফিরবার কোন পথ নেই। সন্ন্যাসীর মনে হয়, ''ক্ষুদ্র এ আলোতে এসে হনু দিসেহারা, / আঁধার দেয় না কভু পথ ভুলাইয়া।'' তাই সন্ন্যাসী পুনরায় ফিরে যায় অন্ধকার গুহার মাঝে। নবম দৃশ্যে গুহায় বসে সন্ন্যাসীর মনে হয়, ''আহা এ কী শান্তি, এ কী গভীর বিরাম।'' কিন্তু এই অন্ধকার গুহার মাঝে বালিকা আলো হাতে প্রবেশ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সন্ন্যাসীর অন্ধকার জীবনে নিয়ে আসে সংসারের আহ্বান। তাই সন্ন্যাসীকে বলতে হয়—

সংসারের পরপারে ছিলেম যে আমি,

সহসা জগৎ হতে কে তোরে পাঠালে?

সেথা হতে সাথে করে কেন নিয়ে এলি

দিবালোক, পুষ্পগন্ধ, স্নিগ্ধ সমীরণ! (নবম দৃশ্য)

দশম দৃশ্যে গুহার বাইরে এসে সন্ন্যাসীর মনে হয়, ''এ জগৎ মিথ্যা নয়''। মনে হচ্ছে ''আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া/ অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু!'' কিন্তু এই বোধ বেশিক্ষণ স্থায়িত্ব লাভ করে না। সন্ন্যাসীর মনে হয়, ''জগৎ-চক্রের মাঝে যেতেছি পড়িতে -'', তাই ''যাক্ ছিঁড়ে! গেল ছিঁড়ে! চল্ ছুটে চল্!/ চল্ দূরে—যতদূরে চলেরে চরণ।'' এই দৃশ্যটিতেও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি রয়েছে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার পার্থক্য উপস্থাপনের জন্য দেখা দিয়েছে দু'জন পথিক।

একাদশ দৃশ্য, 'পথে সন্ন্যাসী'। স্নেহ-মোহবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার আশায় সন্ন্যাসী অনেক দূরে চলে এসেছে। পিছনে পড়ে রইল বালিকার স্নেহের বন্ধন। কিন্তু দূরে এসেও সন্ন্যাসীর মুক্তি নেই, কারণ, ''সেই মুখ বার বার জাগিতেছে মনে''। সন্ন্যাসীর মনে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে —

আমি কেন দিবানিশি প্রাণপণ করে
যুঝিতেছি সংসারের স্রোত প্রতিকূলে।

সন্ন্যাসী যখন চোখ বুঁজে প্রার্থণা করছে, ''হৃদয়রে হৃদয়রে, শান্ত হও, যাক সব দূরে - / যাক দূরে যাক চলে মায়া-মরীচিকা।'' ঠিক তখনই ''পিতা, পিতা, কোথা তুমি পিতা'' বলে বালিকা এসে সামনে দাঁড়াচ্ছে। সন্ন্যাসীর যেন মুক্তি নেই আর সে কারণেই তাকে বলতে হয় —

আয় রে বালিকা তোরে বুকে করে নিয়ে
যেথা ছিনু ফিরে যাই সেই গুহা মাঝে।

দ্বাদশ দৃশ্য, 'গুহার দ্বার'। এই দৃশ্যে সন্ন্যাসীর মনে হচ্ছে তার সাধনা বুঝি শেষ হয়ে গেল। গুহার অন্ধকারের মধ্যে বিশ্বের আলো এসে ঢুকে পড়েছে। জগতের সমস্ত দৃশ্য ফুটে উঠছে গুহার অন্ধকারে। বালিকাই তার সাধনার ব্যঘাত ঘটাচ্ছে। বালিকাকে মনে হচ্ছে 'প্রকৃতির গুপ্তচর'। কিন্তু সন্ন্যাসীকে তো এই বন্ধন ছিন্ন করতে হবে, ''এখনো হইব জয়ী, ছিঁড়িব শৃঙ্খল।''

ত্রয়োদশ দৃশ্য, 'অরণ্য, ঝড়বৃষ্টি, রাত্রি'। গুহা থেকে পালিয়ে সন্ন্যাসী চলে এসেছে অরণ্যে। কিন্তু এখানেও তার মুক্তি নেই। এই অরণ্যে, এই রাত্রে, এই ঝড়বৃষ্টির প্রলয় তান্ডবের মধ্যেও বালিকার ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সন্ন্যাসীর মনে হচ্ছে কোথায় গেলে এর হাত থেকে মুক্তি পাব, ''কোন্ অন্ধকারে-/ জগতের কোন্ প্রান্তে, নিশীথের বুকে -/ ধরনীর কোন্ ঘোর, ঘোর গর্ভতলে -/ এ ধ্বনি কোথায় গেলে পশিবে না কানে!''

এই দৃশ্যে প্রকৃতিক ঝড় যেন সন্ন্যাসীর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অন্তরের প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে। এ

বাইরের ঝড় নয় সন্ন্যাসীর অন্তরের ঝড়। পরিপূর্ণ মানসিক উত্তরণের পূর্বে এই দৃশ্যে সন্ন্যাসীর আত্মিক conflict চরম আকার ধারণ করেছে। যেন ভেঙেচুরে যাচ্ছে পুরানো বোধ বা উপলব্ধি। আর অরণ্য সন্ন্যাসীর হৃদয়-অরণ্যের প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছে। কেননা সন্ন্যাসী চিত্তবিক্ষোভ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে যে অরণ্যের গভীরে আশ্রয় নিতে চায় সে হৃদয় অরণ্যই। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তার জীবনের এই phase কে হৃদয় অরণ্য থেকে নিষ্ক্রমণ বলেছেন। মনে হয় নৈসর্গিক ঝড়কে এভাবে চিত্তবিক্ষোভের প্রতীকী তাৎপর্যে ব্যাবহার করবার শিক্ষা তিনি শেক্সপীয়রের নাটক থেকে গ্রহণ করে থাকবেন।

চতুর্দশ দৃশ্য, 'প্রভাত'। এই দৃশ্যে দেখা যায় সন্ন্যাসীকে অরণ্য থেকে ছুটে বেড়িয়ে আসতে। গতরাত্রির ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধতার পর 'প্রভাত'-এ সন্ন্যাসী উচ্চারণ করে ''যাক, রসাতলে যাক সন্ন্যাসীর ব্রত!'' সমস্ত রাত্রির অন্তর্দ্বন্দ্বের পর নতুন রূপে সন্ন্যাসী আত্মপ্রকাশ করে। একদিকে জাগতিক স্নেহের আকর্ষণ অন্যদিকে ঊর্দ্ধচারী হবার আকাঙ্ক্ষা এই দুই বিপরীত বোধের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত সন্ন্যাসীকে শেষ পর্যন্ত বলতে হয়—

আজ হতে আমি আর নহিরে সন্ন্যাসী!
পাষাণ সংকল্পভার দিয়ে বিসর্জন
আনন্দে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি একবার!

আর এই উপলব্ধি জাগ্রত হবার পর তার মনে হয় ''আজি এ জগৎ হেরি কী আনন্দময়!'' এই দৃশ্যে সন্ন্যাসীর পরিপূর্ণ উত্তরণ ঘটে। এই উত্তরণ গুহা থেকে পৃথিবীতে, অন্ধকার থেকে আলোতে এবং অমানবিকতা থেকে মানবিকতায়। এরপর পঞ্চদশ দৃশ্যে 'পথে' দেখা যায় সন্ন্যাসীকে। সন্ন্যাসী খুঁজছে বালিকাকে। পথে মানুষের ভীড়। কোন পথিক যখন সন্ন্যাসীকে প্রণাম করতে যাচ্ছে তখন সন্ন্যাসী বলছে ''আমিও যে একজন তোমাদেরই মতো''।

ষোড়শ দৃশ্য, 'গুহামুখ'। এই গুহামুখে দেখা যায় বালিকার মৃত দেহ পড়ে আছে। সন্ন্যাসী তার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে ফিরে এসেছে বালিকার কাছে, ''স্নেহের প্রতিমা ওগো, মা, আমি এসেছি - '' কিন্তু বালিকা তো মৃত্যুবরণ করেছে। এই মৃত্যুর অভিঘাতে সন্ন্যাসীর মনে হয় ''হায় হায় এ কী নিদারুণ প্রতিশোধ''।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর কাহিনী বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সন্ন্যাসীর জীবনের দুই বোধের দ্বন্দ্ব এবং শেষ পর্যন্ত তার উত্তরণ আমাদের কাছে পরিষ্কার ভাবে ধরা দিয়েছে। একদিকে জীবন ও জগৎ বিবিক্ত সন্ন্যাসী আরেক দিকে সাধারণ মানুষ ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানান কোলাহল এই দুইয়ের মাঝখানে

বালিকা। এই বালিকা মাঝখানে থেকে সন্ন্যাসীর অন্তরে স্নেহ প্রেম পূর্ণ এই জগতের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'র 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' অধ্যায়ে লিখেছেন —

> প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে একদিকে যতসব পথের লোক, যত-সব গ্রামের নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘর-গড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর একদিকে সন্ন্যাসী, যে আপনার ঘর-গড়া এক অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল।[৯৪]

সন্ন্যাসী সীমাকে পরিত্যাগ করে অসীমের সাধনায় আত্মনিমগ্ন হয়েছিল এবং প্রকৃতির উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চেয়েছিল। সন্ন্যাসীর সাধনার পিছনের কারণটি কি? কেন তিনি প্রকৃতির উপর প্রতিশোধ নিতে চাইলেন? নাটকের শুরুতেই সন্ন্যাসীকে বলতে শোনা গেছে —

> সুখের বিদ্যুৎ দিয়া করিয়া আঘাত
> দুঃখের ঘনান্ধকারে দেছিস ফেলিয়া।
> বাসনারে ডেকে এনে প্রলোভন দিয়ে
> নিয়ে গিয়েছিস মহা দুর্ভিক্ষ-মাঝারে। (১ম দৃশ্য)

এই সুখের বিদ্যুৎ আঘাত এবং বাসনার প্রলোভন থেকে মুক্তি পাবার জন্য সন্ন্যাসীর জীবন-বিচ্ছিন্ন সাধনা এবং এই সাধনার মধ্যদিয়ে তার প্রকৃতির উপর প্রতিশোধ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা। বিশ্ব-প্রকৃতি, মানব-প্রকৃতি সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সন্ন্যাসী আশ্রয় নেয় গুহার অভ্যন্তরে।

> সেই দিন হতে পশি গুহার মাঝারে
> সাধিয়াছি মহাহত্যা আঁধারে বসিয়া। (১ম দৃশ্য)

এখানে 'মহাহত্যা' হচ্ছে মানুষের প্রবৃত্তি গুলিকে হত্যা। সন্ন্যাসীর সাধনা এই ইন্দ্রিয়কে জয় করবার সাধনা। যে মুহূর্তে সে আত্মজয়ী সেই মুহূর্তে পৃথিবী তার কাছে শূন্যবৎ প্রতিভাত হয়েছে। জগৎ যে পৃথক বস্তু নয় তা দ্রষ্টার আত্মনির্মাণ এই ধারণা এখানে প্রকাশ হতে দেখা যায়। কিন্তু সন্ন্যাসীর প্রতিশোধ গ্রহণের কারণটি সঠিক হলেও রাস্তাটি যে ভুল তা প্রমাণিত হয়ে যায়। অভ্যাসের কঠোরতার নির্মম যে চিত্র ছিল 'বাল্মীকি প্রতিভা'তে 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'-এ দেখা গেল তারই বিকাশ। অভ্যাসের কঠোরতার আবরণ

ছিন্নকরে দস্যুতা থেকে যেমন বাল্মীকির নিষ্ক্রমণ ঘটে তেমনি সন্ন্যাসীকেও নিষ্ক্রান্ত হতে হয় গুহার অন্ধকার থেকে, অর্জিত কঠোরতার অন্ধকার থেকে মানবিকতার আলোয়। অর্থাৎ নিজের নির্মমতার মধ্যে মানবতাকে ঢেকে রেখে সন্ন্যাসী চেয়েছিল এই প্রাণধর্মকে সাধনায় জয় করতে। দুই নাটকেরই শেষে সেই মানবত্বের উন্মোচন হল। মানুষের স্বাভাবিক মানবত্বকে যে জোর করে অবরুদ্ধ করা যায় না এই পর্বের নাটকগুলিতে তাই দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন -এর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে—

> এই পালার মধ্যে এই তত্ত্বটুকু পরিস্ফুট যে অন্ত:প্রকৃতি হোক আর বহি:প্রকৃতি হোক তাহাকে নিপীড়ন অথবা প্রত্যাখ্যান করিয়া মানুষ জীবনের দু:খ পরম্পরা এড়াইতে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ নিরপেক্ষ স্বাধীনতা বা আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভ করিতে পারেনা। যাহা ''আমি'' নই তাহার সহিত যাহা ''আমি'' তাহার পরিপূর্ণ আপোসেই মানুষের সত্যকার মুক্তি।[৯৫]

সন্ন্যাসী প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিল মানব প্রকৃতিকে, অন্তরের 'স্নেহ প্রেম দয়া' কে ভস্ম করে অন্তরকে করতে চেয়েছিল প্রলয়ের রাজধানী। কিন্তু তাকে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করতে হয়েছে সেই 'স্নেহ প্রেম দয়া'র কাছেই। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> পরবর্ত্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে- পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।[৯৬]

সন্ন্যাসী সীমাকে প্রত্যাখ্যান করে অসীমের সাধনা করেছিল বলেই সন্ন্যাসী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেনি। শেষপর্যন্ত সীমার মধ্যেই অসীমের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে তার মুক্তিলাভ ঘটেছে। যে সন্ন্যাসীকে নাটকের শুরুতেই বলতে শোনা গেছে ''এ কী ক্ষুদ্র ধারা! এ কী বদ্ধ চারিদিক!'' সেই সন্ন্যাসীকেই নাটকের শেষে বলতে হয়েছে—

> আখিঁমুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া
> অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু! (দশম দৃশ্য)

সীমাকে অস্বীকার কার যে অসীমের সাধনা হতে পারে না সে কথাই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ সন্ন্যাসীর বিভিন্ন দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ প্রকাশিত তত্ত্বের প্রতিধ্বনি শোনা যায় 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধে, যা লেখা হয়েছিল ১৩১১ সালে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''এই সীমার মধ্যেই, এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই অন্তরের যে প্রকাশ তাহাই আমার কাছে অসীম বিশ্ময়াবহ।''[৯৭]

অথবা -

> পৃথিবীর প্রেমের মধ্যদিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন। -
>
> বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
> অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ।...[৯৮]

এই প্রবন্ধেই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'- এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন—

> আমি বালক বয়সে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিয়াছিলাম— তখন আমি নিজে ভালো করিয়া বুঝিয়া ছিলাম কিনা জানিনা— কিন্তু তাহাতে এই কথা ছিল যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া , এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থ ভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি।[৯৯]

সীমা-অসীমের এই স্বরূপ ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথকে পরবর্ত্তীতেও করতে হয়েছিল। আশ্বিন ১৩১৯-এ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হল 'সীমার সার্থকতা' প্রবন্ধ। সেখানে তিনি লিখলেন—

> সীমা আছে একথা যেমন নিশ্চিত, অসীম আছেন একথা তেমনি সত্য। আমরা উভয়কে যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি তখনই আমরা মায়ার ফাঁদে পড়ি।... নিজের সীমার মধ্যেই সেই অসীমকে পাইতে হইবে, ইহা ছাড়া গতি নাই। সীমার মধ্যে অসীমকে ধরে না, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে আমরা অসীমকে খর্ব করিয়া থাকি।[১০০]

সীমা ও অসীমের এই মিলন সাধনা রবীন্দ্রদর্শনের স্বরূপ। ক্ষুদ্রের মধ্যে, তুচ্ছের মধ্যে বৃহতের সন্ধান , সংসার বিবিক্ত হয়ে নয়, সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে জড়িয়ে থেকে মুক্তির অন্বেষণ এই হচ্ছে রবীন্দ্রদর্শনের মূল সুর। এই দর্শনেরই প্রকাশ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে।

রবীন্দ্রনাথের সীমার মাঝে অসীমের অন্বেষার এই দর্শন আমাদের ধারণা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ছোঁয়া দ্বারা অনেকটা নির্মিত এবং আমাদের মনে হয় 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটক নির্মাণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির জীবনজাত অভিজ্ঞতার অনেকটাই প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

মহর্ষির আত্মজীবনী গ্রন্থটি আমাদের এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হবে।

১৮৮৬ সালের ১৩ জুলাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে চিঠি লিখে জানাচ্ছেন—

> তিনি (মহর্ষি) তাঁর নিজের জীবন সম্বন্ধে যে বই লিখেছেন সেটা পড়ে আশ্চর্য হতে হয়। সেই বইখানি একটি পরিণত মহৎ জীবনে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। সেটা পড়লে আমার হৃদয়ে এক প্রকার অনির্দেশ্য আশার সঞ্চার হয়। বাঙ্গালা ভাষায় এই একটি রীতিমত বই লেখা হল।[১০১]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮১৭ থেকে ১৮৫৮-এর নভেম্বর অর্থাৎ তাঁর ১৮ বছর থেকে ৪১ বৎসর বয়স পর্যন্ত সময়কালকে আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই আত্মজীবনীতে উঠে এসেছে বারবার তাঁর সংসার ত্যাগ করার কথা। ১৮৫৬ সালে তিনি চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন। পরমব্রহ্মকে জানার জন্য তাঁর এই আয়োজন। এ প্রসঙ্গে তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন—

> কোথায় ছিলাম, কেন এখানে আইলাম, আবার কোথায় যাইব অদ্যাপি আমার নিকটে প্রকাশ হইল না; অদ্যাপি এখানে থাকিয়া ব্রহ্মকে যতটা জানা যায়, তাহা আমার জানা হইল না। আর আমি লোকেদের সঙ্গে হো হো করিয়া বেড়াইব না, বৃথা জল্পনা করিয়া আর সময় নষ্ট করিব না। একাগ্র চিত্ত হইয়া একান্ত তাঁহার জন্য কঠোর তপস্যা করিব। আমি বাড়ি হইতে চলিয়া যাইব আর ফিরিব না।[১০২]

কিন্তু এই যাত্রার মধ্য দিয়ে তাঁর মধ্যে এক নতুন বোধের জন্ম হয়। নবলব্ধ এই বোধের কারণেই তাঁকে পুনরায় ফিরে আসতে হয় সংসারে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ার দুই বছর পর ১৮৫৮ সালের অক্টোবর মাসে মহর্ষি তখন শিমলায়, আত্মজীবনীতে লিখছেন—

> একদিন আশ্বিন মাসে খাদে নামিয়া একটি নদীর সেতুর উপর দাঁড়াইয়া তাহার স্রোতের অপ্রতিহত গতি ও উল্লাসময়ী ভঙ্গী দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেলাম। আহা! এখানে এই নদী কেমন নির্ম্মল ও শুভ্র। ইহার জল কেমন স্বাভাবিক ও শীতল। এ কেন তবে আপনার এই পবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে? এ নদী যতই নীচে যাইবে, ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জনা ইহাকে মলিন ও কলুষিত করিবে। তবে কেন এ সেদিকে প্রবল বেগে ছুটিতেছে? কেবল আপনার জন্য স্থির হইয়া থাকা তাহার

কি ক্ষমতা? সেই সর্ব্বনিয়ন্তার শাসনে পৃথিবীর কর্দ্দমে মলিন হইয়াও ভূমি সকলকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিবার জন্য উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নিম্নগামিনী হইতে হইবে। ... এই প্রকার ভাবিতেছি, এসময় হঠাৎ আমি আমার অন্তর্যামী পুরুষের গভীর আদেশবানী শুনিলাম, "তুমি উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্যলাভ করিলে, যাও, পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর।"[১০৩]

এরপর মহর্ষি লিখেছেন—

ঈশ্বরের আদেশ, বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া; সে আদেশের বিরুদ্ধে কি মানুষের ইচ্ছা টিকিতে পারে? সে আদেশের বাহিরে একটু ইচ্ছা করিতে গিয়া প্রকৃতি শুদ্ধ বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। এমনি তাহার হুকুম। 'হুকুমে অন্দর সব কোই, বাহব-হুকুম ন কোই।' আর কি আমি শিমলাতে থাকিতে পারি? প্রকৃতিরা তখন আমাকে বলিতেছে, 'এই দুই বৎসর ধরিয়া আমাদিগকে কত কষ্ট দিলে। কত সাধ্য সাধনা করিলাম, আমাদের একটি নির্দ্দোষ প্রবৃত্তিকেও পরিতোষ করিলে না; এখন আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, আর তোমার শুশ্রূষা করিতে পারি না।' প্রকৃতিরা দুর্ব্বলই হউক আর সবলই হউক, আর কি আমি শিমলাতে থাকিতে পারি?[১০৪]

এরপর ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে মহর্ষি কোলকাতায় ফিরে এলেন। তখন তার বয়স ৪১ বছর। পরমব্রহ্ম লাভের আশায় মহর্ষি সংসার ত্যাগ করে নির্জন প্রকৃতির মাঝে সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পরমব্রহ্ম অসীমেরই ইংগিত করে। এই অসীমকে পাবার আশায় মহর্ষি সীমাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। 'লোকেদের সঙ্গে হো হো' করে না ঘুরে নির্জনতায় তপস্যায় মগ্ন হয়েছিলেন। কিন্তু সাধনার এই পথ যে ঠিক নয়, ব্রহ্মকে পাবার, অসীমকে ছোঁয়ার এই পন্থা যে ভুল তা প্রমাণিত হতে বেশি সময় লাগেনি। প্রকৃতিই তাঁকে শিক্ষা দিয়েছে 'নিম্নগামী' হবার জন্য। সীমার মাঝেই অসীমের আরাধনা করবার জন্য, সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক কলহের মাঝে ব্রহ্মের উপাসনা করবার জন্য। অন্তর্যামী পুরুষের যে আহ্বান তিনি শুনেছিলেন, "তুমি উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও", সে তো মহর্ষির অন্তর্গত উপলব্ধি। যে প্রকৃতিকে তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন, তাদের একটি 'নির্দোষ প্রবৃত্তিকেও পরিতোষ' করেননি সেই প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরমব্রহ্মের উপাসনা যে হতে পারে না নদীর নিম্নগামী হবার দৃশ্যে মহর্ষি তা ভাল ভাবেই উপলব্ধি করেছেন। আর এ কারণেই তাঁকে ফিরতে হয়েছে সংসারে।

এতো রবীন্দ্রনাথের কবিতার জীবনগত উদাহরণ —

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দিরমাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধকরি যোগাসন, সে নহে আমার। (৩০ নং কবিতা / নৈবেদ্য)

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'- এর সন্ন্যাসীও অনন্তের সাধনার জন্য অন্তকে পরিত্যাগ করেছিল। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে গুহার অন্ধকারে যোগাসনে বসেছিল। কিন্তু বালিকা স্নেহ প্রেম ভালবাসা দয়া ইত্যাদি মানবিক বোধের স্পর্শ নিয়ে বিভিন্ন দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সন্ন্যাসীকে সংসারের মধ্যে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। নাটকের প্রথম দিকে সন্ন্যাসীকে বলতে শোনা গেছে—

পথ দিয়ে চলিতেছে এরা সব কারা!
এদের চিনিনে আমি, বুঝিতে পারিনে
কেন এরা করিতেছে এত কোলাহল।
কী চায়? কিসের লাগি এত ব্যস্ত এরা? (২য় দৃশ্য)

এ যেন মহর্ষির ''লোকদের সঙ্গে হো হো করিয়া বেড়াইব না''-এর কাব্যিক প্রকাশ। মহর্ষি যেমন তাঁর ভ্রমণ শেষ করে 'নিম্নগামী' হয়ে সংসারের মাঝে, মানুষের মাঝে ফিরে এলেন সন্ন্যাসীও তেমনি তার সাধনা, সাধনায় সিদ্ধিলাভ, বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগের ব্যর্থতা শেষে ফিরে এলেন মানুষের মাঝে, সংসারের মাঝে, সীমার মাঝে —

আমিও যে একজন তোমাদেরই মতো,
তোমাদেরই গৃহ মাঝে নিয়ে যাও মোরে। (পঞ্চদশ দৃশ্য)

মহর্ষির জীবনের সত্য লাভ এবং সন্ন্যাসীর জীবনের সত্য লাভ প্রায় একই উপায়ে সংঘটিত হয় এবং দু'জনের সত্যের স্বরূপও একই। কিন্তু মহর্ষির এই সত্য লাভের পিছনে ঈশ্বরীয় চেতনা কাজ করেছে

প্রবলভাবে কিন্তু 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ঈশ্বর চেতনার নাটক নয়। আবু সয়ীদ আইয়ুব এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, ''ঈশ্বর অত্যন্ত লক্ষনীয় ভাবেই অনুপস্থিত এই নাটকে।''[১০৫]

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচনার ক্ষেত্রে আমরা অনুমান করি রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির জীবন থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে থাকতেও পারেন। যদিও 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচনার অনেক পর অর্থাৎ ১৮৯৮-এ মহর্ষির আত্মজীবনী প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই প্রকাশের অনেক আগেই যে বইটি লেখা হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। আমরা জানি যে মহর্ষি তাঁর অনুচর প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে এই গ্রন্থের স্বত্বদান করেছিলেন এবং তাঁকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ''আমি এই পৃথিবীতে থাকিতে ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবে না'' (১১ই মাঘ, ১৮১৬ শক, ১৮৯৩ খ্রী:)। কিন্তু মহর্ষি তাঁর জীবত কালেই গ্রন্থটি প্রকাশের অনুমতি দেন এবং ১৮৯৯ খ্রী:-এ এর প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। ১৮৮৬ সালে প্রিয়নাথ সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি টি (যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি) একটু গভীরভাবে পাঠ করলে বোঝা যায় মহর্ষির আত্মজীবনী অনেক আগেই লেখা হয়েছিল এবং তা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর আগেই যে লেখা হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। মহর্ষির জীবনজাত সত্য যে রবীন্দ্রনাথকে নাড়া দিয়েছিল প্রবলভাবে সে কথাই প্রকাশ করেছেন প্রিয়নাথ সেনকে চিঠি লিখে, ''সেটা পড়লে আমার হৃদয়ে এক প্রকার অনির্দেশ্য আশার সঞ্চার হয়।''

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচনার পিছনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিজীবনের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন 'জীবনস্মৃতিতে'। তিনি লিখেছেন—

> আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময়,অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল - এই প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটি একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে।[১০৬]

এই ইতিহাস 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচনার পূর্বে 'সন্ধ্যাসংগীত' এবং 'প্রভাতসংগীত' কাব্যেও দেখা দিয়েছে। কাব্যের ক্ষেত্রে যেমন 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'প্রভাতসংগীত'-এ উত্তরণ এবং তার মাঝে সদর স্ট্রীটের অভিজ্ঞতার অভিঘাত তেমনি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ গুহার আত্মমগ্নতা থেকে বিশ্বজনীনতায় উত্তরণ মাঝে বালিকা এবং তার স্পর্শে আত্মদ্বন্দ্বের রক্তময়তা আর এ সবের মধ্যেই ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি।

সুতরাং সীমা-অসীমের এই মিলন সাধনার তত্ত্ব অথবা আত্ম-অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তিলাভের আনন্দ যেমন পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মোপলব্ধির ফলশ্রুতি তেমনি রবীন্দ্রনাথেরও ব্যক্তিজীবনের আলোক-উদ্ভাসন। পিতার অভিজ্ঞতা এবং নিজ অভিজ্ঞতার মিলিত প্রকাশ আমাদের মতে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটক।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে নাটকে কাহিনীর আবরণে যে তত্ত্ব তিনি প্রকাশ করলেন সেই তত্ত্বই প্রকাশিত হল সমকালে রচিত তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে। যেগুলি ১২৯০-৯১ সালে প্রকাশিত হচ্ছিল 'ভারতী', 'তত্ত্ববোধিনী', এবং 'নবজীবন' পত্রিকায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' তে লিখেছেন—

> তখনো আলোচনা নাম দিয়া যে ছোট ছোট গদ্য প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধের ভিতরকার একটি তত্ত্ব ব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতল স্পর্শ গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে।[১০৭]

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর দৃশ্য সংখ্যা ১৬টি। দৃশ্যগুলি সংঘটিত হয়েছে গুহা, পথ, গুহামুখ, অরণ্য এবং পর্বত শিখরে। গুহায় দুটি দৃশ্য, পথে পাঁচটি, গুহামুখে ছয়টি, অরণ্যে একটি, অরণ্যের বাহিরে একটি এবং পর্বত শিখরে একটি। এই দৃশ্য স্থাপনায় প্রতীকী ব্যঞ্জনা রয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। গুহা, পথ, গুহাদ্বার এবং অরণ্য এই চারটি দৃশ্য চার ধরণের প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিয়ে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। গুহা অবরুদ্ধ জীবনের প্রতীক, পথ চলমান জীবনপ্রবাহের প্রতীক, গুহাদ্বার জীবনের অবরুদ্ধতা ও চলমান জীবনপ্রবাহের সঙ্গম স্থলের প্রতীক এবং অরণ্য হৃদয়-অরণ্যের প্রতীক। দৃশ্যপট হিসেবে 'অরণ্য' শুধুমাত্র ত্রয়োদশ দৃশ্যেই দেখা দিয়েছে। এই দৃশ্যটিতে সন্ন্যাসীর অর্ন্তদ্বন্দ্বের চরমতম প্রকাশ দেখা যায়। 'অরণ্য' এখানে সন্ন্যাসীর হৃদয় অরণ্যের প্রতীকী মাত্রা লাভ করেছে। অনুষঙ্গ হিসেবে উঠে এসেছে যে 'ঝড় বৃষ্টি' ও 'রাত্রি' তাও তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। গুহার অবরুদ্ধতার অন্ধকারের মধ্যে সন্ন্যাসী জীবনবিমুখতার তপস্যা করেছে। গুহার অন্ধকার-জীবনহীন জীবনেরই দ্যোতক। নাটকে প্রথম এবং নবম দৃশ্যটি গুহায় সংঘটিত হয়েছে। তবে দুটি দৃশ্যের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে বিস্তর। প্রথম দৃশ্যে সন্ন্যাসী আঁধারে গুহার মাঝে একাকী রয়েছে আর ''অনাদিকালের রাত্রি সমাধিমগনা/ নিশ্বাস করিয়া রোধ পাশে বসে আছে।'' শিলার ফাটল দিয়ে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়ছে, প্রাচীন ভেকের দল ঘুমিয়ে রয়েছে,বাদুর অমানিশীথের বার্তা নিয়ে আসছে দূর থেকে। এ সবই জীবন বিচ্ছিন্ন এক অন্ধকার জীবনের অনুষঙ্গ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। আর এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সন্ন্যাসী প্রকৃতির উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে চলেছে। কিন্তু তবুও এই জীবন বিবর্জিত অন্ধকার গুহা একেবারেই আলোর যোগসূত্র

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে না। সেখানেও কখনো কখনো গুপ্তচরের মতো আলোর প্রবেশ ঘটে—

কখনো বা কোনদিন কে জানে কেমনে
একটি আলোর রেখা কোথা হতে আসে,
দিবসের গুপ্তচর রজনীর মাঝে
একটুকু উঁকি মেরে যায় পালাইয়া।

আলোর ইশারা যেন ভবিষ্যতের সম্ভবনার এই ইংগিত দিয়ে যায় যে এই গুহার গূঢ় অন্ধকার একদিন অপসৃত হবে। নাটকের শুরুতেই যেন নাটকের পরিণতির আভাস মেলে। গুহাতো সন্ন্যাসীর অন্তর্লোকের পরিচয় জ্ঞাপক । যে অন্তর অসত্যের অন্ধকারে পূর্ণ। সেখানে একদিন আলোর প্রদীপ জ্বলে উঠবে। তারই আভাস মিলে যায় এই উঁকি মেরে যাওয়া আলোর ইশারায়। রবীন্দ্রনাট্যে নেতির কোন স্থান নেই। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে শ্রী ভূদেব চৌধুরীর মন্তব্য, ''মানুষের পরিণাম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কখনো সংশয় রাখেননি শেষ পর্যন্ত — রঞ্জনের প্রাণহীন দেহের সামনে তাই নন্দিনীর অবিচলিত অঙ্গীকার - সে 'ফিরে আসবে' —।''[১০৮]

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর প্রথম দৃশ্যে যে আলোর রেখা উঁকি মেরেছিল সন্ন্যাসীর গুহাময় অন্তর্লোকে সেই আলোক রেখাই ক্রমাগত বেড়ে চলে এবং সন্ন্যাসীকে গুহা থেকে পথ, পথ থেকে গুহায় তাড়িয়ে ফেরে। এবপর সন্ন্যাসীকে আর একবার মাত্র গুহায় প্রবেশ করতে দেখা যায় নবম দৃশ্যে। এর মধ্যে দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে অষ্টম দৃশ্য পর্যন্ত নাট্য-ঘটনা পথ এবং গুহা দ্বারে সংঘটিত হয়েছে ও সন্ন্যাসী ক্ষতবিক্ষত হয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্বে। একারণেই প্রথম দৃশ্য এবং নবম দৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য ঘটে যায় অনেকটাই। প্রথম দৃশ্যের মতো নবম দৃশ্যে সন্ন্যাসীর মধ্যে দেখা যায় না কাঠিন্য এবং এখানে, গুহার অন্ধকারে আলোর রেখা শুধু উঁকি মেরে চলে যায় না। বালিকা প্রদীপ হাতে সরাসরি ঢুকে পড়ে গুহার মধ্যে। অন্ধকার গুহা আলোয় আলোকময় হয়ে ওঠে। বালিকা যেন জীবনের সত্যময় আলোক বর্তিকা নিয়ে ঢুকে পড়ে সন্ন্যাসীর জমাট বাঁধা অন্ধকার অন্তর্গুহায়। (মনে পড়ে 'রক্তকরবী' নাটকের নন্দিনীর সংলাপ, ''তোমাদের সুড়ঙ্গের ওই অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তারমধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ওই বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি।'') বালিকার এই আলোক প্রক্ষেপণের কারণে সন্ন্যাসীকে বলতে হয়—

সংসারের পরপারে ছিলেম যে আমি,
সহসা জগৎ হতে কে তোরে পাঠালে?
সেথা হতে সাথে করে কেন নিয়ে এলি

দিবালোক, পুষ্পগন্ধ, স্নিগ্ধ সমীরণ? ...
সরলতাময় তোর মুখ খানি দেখে
জগতের পরে মোর হতেছে বিশ্বাস। ...
চল বাছা গুহা হতে বাহিরেতে যাই।
সমুদ্রের এক পারে রয়েছে জগৎ,
সমুদ্রের পরপারে আমি বসে আছি,
মাঝেতে রহিলি তুই সোনার তরণী —
জগৎ-অতীত এই পারাবার হতে
মাঝে মাঝে নিয়ে যাবি জগতের কূলে।

এরপর সন্ন্যাসীকে আর গুহায় ফিরতে দেখা যায়নি। যদিও সন্ন্যাসীর অন্তর্গুহার অন্ধকার পুরোপুরি দূর হওয়ার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয় চতুর্দশ দৃশ্য পর্যন্ত কিন্তু বালিকার দায়িত্ব সে এরই মধ্যে সম্পন্ন করে ফেলে। অন্ধকারের মধ্যে সত্যের আলো ছড়িয়ে দিয়ে, 'মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ' ভেঙে দিয়ে বালিকা সন্ন্যাসীর অন্তরে সত্যবোধ জাগিয়ে দেয়। আর একারণেই বালিকা চরিত্রটিও প্রতীকী মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ যেন 'বাল্মীকি প্রতিভা'র সরস্বতী বেশধারী বালিকার উত্তরসূরী এবং 'বিসর্জন'-এর অপর্ণা ও 'রক্তকরবী'-এর নন্দিনীর পূর্বসূরী।

রবীন্দ্রনাট্যে দৃশ্যপট হিসেবে 'পথ'-এর প্রয়োগ একটি বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ মন্তব্য করেছেন, ''বস্তুত রবীন্দ্ররচনায় 'পথ' যে ভাবে ব্যবহৃত, তার ভঙ্গি ত্রিমুখী। কখনো তা আসে নিছক দৃশ্যপট হিসেবে, কখনো তা নাটকের বিষয়ও বটে, আবার কখনো প্রতীক: পটই হয়ে ওঠে বিষয়ের প্রতীক।''[১০৯]

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকেই 'পথ'-এর এই ত্রিমাত্রিক প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে আমরা 'রবীন্দ্রনাটকের প্রথম পর্যায়ে পরিণত পর্যায়ের বীজানুসন্ধান' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ দৃশ্য পট হিসেবে 'গুহাদ্বার' জীবনের অবরুদ্ধতা এবং চলমান জীবনের সঙ্গমস্থলের প্রতীক হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন—

গুহাদ্বার, গুহা ও জগতের মিলনস্থল। একদিকে গুহা জগৎ বর্জিত, নিরালম্ব
অসীমের ধ্যানের স্থিতি, অন্যদিকে জগতের ও জীবনের স্নেহ-প্রেম-সৌন্দর্য-

মাধুর্যের আকর্ষণ, এই উভয়ের সংগম স্থলে গুহাদ্বারের অবস্থিতি। সন্ন্যাসীর অন্তর্দ্বন্দ্বের উভয়পক্ষ সীমা ও অসীম এই দ্বারে মুখোমুখী দাঁড়াইয়া।[১১০]

'গুহাদ্বার'-এর দৃশ্য গুলি আলোচনা করলে এই মন্তব্যের যথার্থতা প্রতিপন্ন হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ গুহাদ্বারেব দৃশ্য ছয়টি।

এক.	পঞ্চম দৃশ্য	-	গুহাদ্বার।
দুই.	ষষ্ঠ দৃশ্য	-	গুহাদ্বার।
তিন.	অষ্টম দৃশ্য	-	গুহাদ্বার।
চার.	দশম দৃশ্য	-	গুহার বাহিরে।
পাঁচ	দ্বাদশ দৃশ্য	-	গুহাদ্বার।
ছয়.	ষোড়শ দৃশ্য	-	গুহামুখ।

এই ছয়টি দৃশ্যের মধ্যে দশম দৃশ্য ছাড়া বাকী পাঁচটি দৃশ্যে সন্ন্যাসী ও বালিকার উপস্থিতি রয়েছে। সন্ন্যাসী 'জগৎ বর্জিত, নিরালম্ব অসীমের' সাধক এবং বালিকা 'জগতের ও জীবনের স্নেহ-প্রেম-সৌন্দর্য-মাধুর্যের আকর্ষণ'। একজন 'গুহা' অন্যজন 'পথ' (মনেপড়ে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ধনঞ্জয় প্রতাপাদিত্যকে বলেছিল, ''মহারাজ রাজ্যটাও তো রাস্তা -''৪/৭)। দুই-এর অবস্থান তাই গুহাদ্বার। যে গুহাদ্বারে 'পথ' ও 'গুহা'র দ্বন্দ্ব, মুক্তি ও জড়ত্বের দ্বন্দ্ব, আলো ও আঁধারের দ্বন্দ্ব। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ 'গুহাদ্বার' তাই প্রতীকের পরমার্থতা লাভ করে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর দ্বন্দ্ব মূলত 'গুহা' ও 'পথ'-এর দ্বন্দ্ব। তাই গুহাদ্বার-এর পটভূমিতে উচ্চারিত সন্ন্যাসীর সংলাপে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে গুহাদ্বারের দৃশ্যগুলি থেকে সন্ন্যাসীর কিছু সংলাপ উদ্ধৃত করে সন্ন্যাসীর অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

এক. তবে থাক, তবে তুই কাছে আয় মোর।
দেখি তোর অতিমৃদু স্পর্শ সুকোমল।
আহা, তোর স্পর্শ মোর ধ্যানের মতন—
সীমা হতে নিয়ে যায় অসীমের দ্বারে।
এ কি মায়া? এ কি স্বপ্ন? এ কি মোহ ঘোর?
জগৎ কি মায়া করে ছায়া হয়ে গিয়ে
করিছে প্রাণের কাছে অনন্তের ভান? (পঞ্চম দৃশ্য)

দুই. দূর হোক — এ-সকল কিছু ভাল নয়—
বালিকা, বালিকা তোর এ কী ছেলে খেলা!
আমি যে সন্ন্যাসী যোগী মুক্ত নির্বিকার,
সংসারের গ্রন্থিহীন, স্বাধীন সবল,
এ ধুলায় ঢাকিবি কি আমার নয়ন! (ষষ্ঠ দৃশ্য)

তিন. এ কী অন্ধকার হেথা! এ কী বদ্ধ গুহা!
আয় বাছা, মোরা দোহে বাহিরেতে যাই,
চাঁদের আলোতে গিয়ে বসি একবার।...
আজিও ডাকিস মোরে! আমি ফিরিব না।
বন্দী করে রেখেছিলি মায়া মুগ্ধ করে,
পালায়ে এসেছি আমি, হয়েছি স্বাধীন।...
এ কী রে চলিছি কোথা, এসেছি কোথায়!
বুঝি আর আপনারে পারিনে রাখিতে।
বুঝি মরি, ডুবি, বুঝি লুপ্ত হয়ে যাই। (৮ম দৃশ্য)

চার. জগৎ-চক্রের মাঝে যেতেছি পড়িতে—
চারিদেকে জড়াইছে অশ্রুর বাঁধন,
প্রতিদিন কমিতেছে চরণের বল।...
যাক্ ছিঁড়ে! গেল ছিঁড়ে! চল ছুটে চল! (দশম দৃশ্য)

পাঁচ. আকাশ বিহারী পাখি উড়িত আকাশে -
মাটি হতে ব্যাধ তারে মারিয়াছে বাণ,
ক্রমেই মাটির পানে যেতেছে পড়িয়া—
ক্রমেই দুর্বল দেহ, শ্রান্ত ভগ্ন পাখা,
ক্রমেই আসিছে নুয়ে অভ্রভেদী মাথা।...
এখনো হইব জয়ী ছিঁড়িব শৃঙ্খল। (দ্বাদশ দৃশ্য)

ষোড়শ দৃশ্য 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর শেষ দৃশ্য। বালিকার মৃত দেহ 'গুহামুখ'-এর ধুলায় পড়ে আছে। আত্মিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সন্ন্যাসীর মানসিক উত্তরণ সম্পন্ন হওয়ার পর সন্ন্যাসী ফিরে এসেছে বালিকার কাছে। কিন্তু বালিকা তো বেঁচে নেই। বালিকার মৃত দেহ স্পর্শ করে সন্ন্যাসী বলছে—

নয়ন-আনন্দ মোর, হৃদয়ের ধন;
স্নেহের প্রতিমা ওগো, মা, আমি এসেছি—
ধুলায় পড়িয়া কেন - ওঠ মা ওঠ মা—
পাষাণেতে মুখ খানি রেখেছিস্ কেন? ...
বাছা, বাছা কোথা গেলি ! কী করিলি রে—
হায়, হায়, এ কী নিদারুণ প্রতিশোধ!

লক্ষ করবার বিষয় যে বালিকার মৃত্যুর স্থানটি গুহা মুখ। বালিকা যেন তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সন্ন্যাসীকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল তোমার ঐ গুহা মিথ্যা। মানুষের মুক্তি অন্ধকারের অবরুদ্ধতায় নয়, মুক্তি আলোকময় উন্মুক্ততার মধ্যে। মানব প্রকৃতি এবং বিশ্ব প্রকৃতিকে অবহেলা করলে প্রকৃতি 'নিদারুণ প্রতিশোধ' গ্রহণ করে।

রবীন্দ্রনাটকে জনতা চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় এই জনতা চরিত্রের "মূঢ়তা ও ভীরুতা, এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বুদ্ধি তাহার প্রধান লক্ষণ"[১১১]। 'রুদ্রচন্ড' নাটকে যদিও 'নাগরিকগণ' হিসেবে জনতা চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে কিন্তু তারা রবীন্দ্রনাটকের বিশিষ্ট জনতা চরিত্র নয়। এই বিশিষ্ট জনতা চরিত্রের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে।

ঙ. গদ্যনাটক 'নলিনী' ও গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' প্রকাশের দশদিন পর প্রকাশিত হয় গদ্যনাটক 'নলিনী'। প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, "বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশ তারিখ 10 May 1884 [শনি ২৯ বৈশাখ]"।[১১২] 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর মত একটি তত্ত্বমূলক নাটক রচনার পর 'নলিনী'র মত একটি 'অকিঞ্চিৎকর'[১১৩] নাটক রবীন্দ্রনাথ কেন লিখতে গেলেন? আসলে 'নলিনী' রচিত হয়েছিল অভিনয়ের তাগিদ থেকে। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

যৌথ-রচনা বিবাহ-উৎসবের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া তরুণ-তরুণীরা স্থির করিলেন যে নাটকের রচয়িতা হইবেন অভিনেতারা স্বয়ং। সেই জন্য মোটামুটি

> ভাবে একটা প্লট খাড়া করিয়া অভিনয়ের অংশ নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইল। একজন নিজ অংশ লিখিয়া দিলে অপরজন তাঁহার অংশ লিখিবেন, এইরূপে অভিনেতা-লেখকদের হাতে-হাতে ঘুরিয়া একটা জিনিস খাড়া হইল বটে, তবে তাহাকে সাহিত্য নাম দেওয়া যায় না। নাটক রচনা এভাবে বারোয়ারি সমবায়-পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন হয় না শেষকালে রবীন্দ্রনাথকেই সেই খসড়া ছাঁটিয়া কাটিয়া একটা চলন সই নাটক খাড়া করিতে হইল। নাটকখানির নাম রাখা হইল 'নলিনী', রবীন্দ্রনাথের প্রিয় নাম।[১১৪]

অভিনয়ের কারণে 'নলিনী' রচিত হলেও শেষ পর্যন্ত তা অভিনীত হয়নি।

'নলিনী' ছয়টি দৃশ্যের একটি নাটিকা। এর কাহিনীর উপাদান সংগৃহীত হয়েছে 'ভগ্নহৃদয়' থেকে। 'নলিনী'তে রয়েছে দুটি পুরুষ চরিত্র নীরদ ও নবীন, দুটি নারী চরিত্র নলিনী ও নীরজা এবং একটি বালিকা চরত্র ফুলি। নীরদ নলিনীকে তার ভালবাসার কথা বলেছিল কিন্তু নলিনী তার অন্তরের কথা নীরদের কাছে প্রকাশ করতে পারেনি। নীরদ নলিনীকে ভুল বোঝে, নলিনীকে তার স্বার্থপর মনে হয়। একারণে ক্ষোভে অভিমানে নীরদ বিদেশ চলে যায়। বিদেশে গিয়ে সে নীরজাকে ভালবাসে এবং দু'জনের বিয়ে ঠিক হয়। এদিকে নীরদ চলে যাওয়ার পর থেকে নলিনীর জীবনও যায় বদলে। নলিনী আর বাগানে বেড়াতে যায় না, ফুল তুলতে যায় না। নীরদ নলিনীর শুধু বাইরেটাই দেখেছিল, অন্তরের পরিচয় নিতে পারে নি। আর এ কারণেই দু'জনের মধ্যে রচিত হয়েছে বিচ্ছেদ। নীরদ ও নলিনীর সমস্যা প্রকাশ-অপ্রকাশের সমস্যা। নীরদের সঙ্গে নীরজার সম্পর্ক তৈরী হলেও নলিনীর প্রতি নীরদের এক অন্তর্গত আকর্ষণ ছিল। একারণেই নীরজার মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, 'আমাদের এ বাসর ঘর শ্মশানের উপর গড়া নয়তো।' তবে এই জটিলতা তীব্রতা লাভের আগেই নলিনীর ক্ষীয়মান রুগ্ন শরীর দেখে নীরজা নীরদ ও নলিনীর মিলন ঘটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। শেষ দৃশ্যে নীরজার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নলিনী ও নীরদের মিলনের পথ সুগম হয়। 'কবি কাহিনী 'তে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন 'মানুষেরই মন চায় মানুষের মন'। 'নলিনী' এই মনে মনে মিলনের নাটক। রবীন্দ্রনাট্য চর্চার প্রথম পর্যায়ে 'নলিনী' সবচেয়ে দুর্বল রচনা। বিষয় বস্তুগত দিক থেকে এই নাটকটি কাহিনী কাব্যগুলির উত্তরসূরী। রবীন্দ্র নাট্যথীমের কোন বিশেষত্ব এখানে প্রকাশ পায়নি। আঙ্গিকগত দিক থেকেও বিশ্লেষণ করলে এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নাট্যরীতির কোন আভাস মেলে না।

'নলিনী' নাটক থেকেই উঠে এসেছে 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের কাহিনী। 'মায়ার খেলা' নাটকের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''আমার পূর্ব রচিত একটি আকঞ্চিৎকর গদ্যনাটিকার

সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।''[১১৫] তবে 'মায়ার খেলা'-এর বীজ পোঁতা হয়েছিল অনেক আগেই। আমাদের ধারণা 'ভগ্নহৃদয়' হচ্ছে সেই বীজ যা 'নলিনী'কে ছুঁয়ে 'মায়ার খেলা'য় অঙ্কুরিত হয়েছে।

'মায়ার খেলা' ও রচিত হ'ল অভিনয়ের প্রয়োজনে। স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতিষ্ঠিত 'সখি সমিতি'র অনুষ্ঠানে অভিনয়ের জন্যে সরলা রায়ের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা' রচনা করেন। 'মায়ার খেলা'র রচনা কবে শেষ হয়েছিল এপ্রসঙ্গে কিছু জানতে না পারলেও আমরা জানি যে 'মায়ার খেলা'র রচনার সূত্রপাত হয়েছিল দার্জিলিং-এ। রবীন্দ্রনাথ ১২৮৯-এর কার্তিক মাসে দার্জিলিং গিয়েছিলেন, সেই সময়ে 'মায়ার খেলা'র সূচনা হয়। দার্জিলিং থেকে কলকাতায় ফিরে এসেও 'মায়ার খেলা'র রচনার কাজ চলতে থাকে। এ প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী লিখেছেন, ''এখনো মনে পড়ে আমাদের পার্কস্ট্রীটের বাড়ির তেতালার ঘরে রবিকাকা একটা একহারা খাটে উপুড় হয়ে পড়ে বুকে বালিশ দিয়ে স্লেটের উপর মায়ার খেলার গান লিখছেন এবং গুনগুন করে সুর দিচ্ছেন।''[১১৬]

'মায়ার খেলা'র প্রকাশ তারিখ সম্পর্কে প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, ''বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক তালিকা অনুযায়ী প্রকাশের তারিখ 22 Dec 1888 [শনি ৮ পৌষ]...।''[১১৭] এর কিছুদিন পর অর্থাৎ ২৯ ডিসেম্বর 'মায়ার খেলা' অভিনীত হয়।[১১৮]

'মায়ার খেলা'র সংক্ষিপ্ত কাহিনী নাট্যকার নাটকের শুরুতেই উল্লেখ করেছেন, ''নতুবা বিচ্ছিন্ন গানের মধ্যে হইতে ইহার আখ্যান সংগ্রহ করা সহসা পাঠকদের পক্ষে দুরূহ বোধ হইতে পারে।''[১১৯] সাতটি দৃশ্যে 'মায়ার খেলা'র কাহিনী বিন্যস্ত। 'মায়াকুমারীগণ' মায়াজাল রচনা করে 'নরনারীর হিয়া'কে 'মায়া পাশে' আবদ্ধ করে। এই মায়া পাশে আবদ্ধ হয়ে অমরের অন্তরে প্রেমাকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। প্রেমাষ্পদের সন্ধানে তাই অমর বেরিয়ে পড়ে। এদিকে শান্তা মন-প্রাণ দিয়ে অমরকে ভালবাসে কিন্তু অমর শান্তার হৃদয়ের ভাষা পড়তে পারেনি। তাই 'মায়াকুমারীগণ' গেয়ে ওঠে—

কাছে আছে দেখিতে না পাও,
তুমি কাহার সন্ধানে দুরে যাও! (২য় দৃশ্য)

আরেক দিকে প্রমদা সখীদের সঙ্গে আনন্দ করে সময় অতিবাহিত করে। সে 'ভগ্নহৃদয়'-এর নলিনীর মত সব কিছুই খেলার ছলে পুলক রসে ভরিয়ে দিয়ে অহংকারের আবরণে জড়িয়ে রাখে নিজেকে। কুমার ও অশোক প্রমদার প্রণয় প্রার্থী কিন্তু প্রমদা কাউকেই ধরা দেয় না। প্রমদা বলে—

কে ডাকে! আমি কভু ফিরে চাহি চাই।
কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে,

আমি শুধু বহে চলে যাই।

পরশ পুলক রস - ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা। (৩য় দৃশ্য)

অমর ঘুরতে ঘুরতে একদিন প্রমদার কাননে চলে আসে। অমরকে দেখে প্রমদার অন্তরে ভালবাসা জেগে ওঠে। সে সখীদের বলে—

যা, তোরা যা সখী, যা শুধাগে

ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে। (৪র্থ দৃশ্য)

এসময় 'মায়াকুমারীগণ' গেয়ে ওঠে—

প্রেম পাশে ধরা পড়েছে দুজনে

দেখো দেখো সখী, চাহিয়া— (৪র্থ দৃশ্য)

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অমর আর প্রমদার মিলন ঘটে না। অমর ফিরে যায় শান্তার কাছে। প্রমদা হয়ে পড়ে একা। তাকে বলতে হয়—

কেন এলিরে, ভালোবাসিলি, ভালোবাসা পেলিনে!

কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চলে গেলিনে। (৭ম দৃশ্য)

প্রমদার এই একাকিত্ব তার অহংকারেরই ফলশ্রুতি। প্রমদাকে উদ্দেশ্য করে কুমার বলেছিল—

তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারিনে,

তুমি গঠিত যেন স্বপনে। (৩য় দৃশ্য)

ধরা না দেয়ার খেলাই যেন প্রমদার অহংকার। তার অহংকারের প্রকাশ হয় এভাবেই—

আমি আপনার মাঝে আপনি হারা, আপন সৌরভে সারা

যেন আপনার মন আপনার প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি। (৪র্থ দৃশ্য)

কিন্তু এই অহংকার চূর্ণ হতে সময় লাগেনি। একসময় প্রমদাকে বলতে হয়েছে —

আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল,

শুধাইল না কেহ।

সে তো এল না, যারে সঁপিলাম

এই প্রাণমন দেহ। (৫ম দৃশ্য)

'মায়ার খেলা' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "প্রমদা আপনার স্বভাবকেই জানতে পারেনি অহংকারে, অবশেষে ভিতর থেকে বাজল বেদনা, ভাঙল মিথ্যে অহংকার, প্রকাশ পেল সত্যকার নারী।"[১২০] প্রমদার অহংকারই প্রমদাকে গন্ডিবদ্ধ করে রেখেছিল। আত্মসুখে নিমজ্জিত হতে চেয়েছিল বলেই প্রমদার প্রেম মেলেনি, তাকে একাকিত্বের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। মায়াকুমারীগণের গানেই প্রেমের এই সত্যস্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে, "এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না/ শুধু সুখ চলে যায়—।" এই গীতিনাট্যের আরেক দিকে অমরের সঙ্গে শান্তার মিলন হয়। কিন্তু এই মিলনের আগে অমরও কাছের জিনিসকে চিনতে পারেনি। সে শান্তার প্রেম বুঝতে না পেরে 'মায়ার তরণী'তে 'মায়াপুরীপানে' যাত্রা করেছিল। এ সময় মায়াকুমারীগণ গেয়ে ওঠে—

কাছে আছে দেখিতে না পাও,
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।
মনের মত কারে খুঁজে মর,
সে কি আছে ভুবনে, সে তো রয়েছে মনে।
ওগো মনের মতো সেই তো হবে,
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও। (২য় দৃশ্য)

সীমাকে অস্বীকার করে যে অসীমের সাধনা হতে পারে না এ যেন তারই প্রকাশ। অমরকে শেষ পর্যন্ত কাছের জিনিসের কাছেই ফিরতে হয়েছে, সীমার মাঝেই ফিরতে হয়েছে। 'মায়ার খেলা'র মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমের তত্ত্বই প্রকাশ করেছেন। পুলিন দাস-এর ভাষায় এই তত্ত্ব হচ্ছে, "আত্মসুখ পরায়ণ প্রেমে বন্ধন আছে, মুক্তি নাই।"[১২১] আত্মসুখের অহমিকা নয় আত্মসমর্পণের মাঝেই আছে প্রেমের মুক্তি।

'মায়ার খেলা' সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, "বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ।"[১২২] এখানে গানই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। আমরা মনে করি এই 'মায়ার খেলা'তেই রবীন্দ্রনাথের সংগীত প্রতিভার প্রথম সার্থক প্রকাশ ঘটেছে।

চ. 'রাজা রানী' ও 'বিসর্জন'

'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের স্বরূপ কি হওয়া উচিত তা উপস্থাপন করেছেন। আত্মসুখের জন্য প্রেম প্রার্থনা করলে প্রেম মেলে না এই তত্ত্বই 'মায়ার খেলা'য় মায়াকুমারীগণের গানের

মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়েছে—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম,
প্রেম মেলে না,
শুধু সুখ চলে যায়।

প্রেম বিষয়ক এই ভাবনাই সম্প্রসারিত হল রবীন্দ্রনাথের প্রথম পাঁচ অঙ্কের নাটক 'রাজা ও রানী'-তে। এর প্রকাশকাল সম্পর্কে প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, ''বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুযায়ী নাটকটির প্রকাশের তারিখ 9 Aug [শুক্র ২৫ শ্রাবণ...]''।[২২৫] 'রাজা ও রানী' লেখা হয়েছিল সোলাপুরে। এপ্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, ''ফাল্গুন, চৈত্র ১২৯৫ ও বৈশাখ ১২৯৬-এর প্রথম দিকটা রবীন্দ্রনাথ সোলাপুরে ছিলেন।...এই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর প্রথম বড়ো নাটক 'রাজা ও রানী' লেখেন।[২২৬]

রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম শেক্সপিয়রীয় রীতিতে পাঁচ অংকের নাটক লিখলেন। এর কাহিনী হচ্ছে কাশ্মীরের রাজকন্যা সুমিত্রা জলন্ধরের রাজা বিক্রমদেবের স্ত্রী। বিক্রমদেব রাজকার্য পরিত্যাগ করে অন্তঃপুরে রাণীর কাছেই সময় অতিবাহিত করেন। রাজার এই দুর্বলতার সুযোগে রাণীর আত্মীয় স্বজনরা রাজ্যে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নেয় এবং তাদের অত্যাচারে সাধারণ প্রজা জর্জরিত হয়ে পড়ে। একারণেই প্রজা বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দেয়। কিন্তু রাজার এসবে ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি অন্তঃপুরে রাণীর সঙ্গে প্রেম লীলায় মত্ত। তিনি রাণীকে বলেন—

থাক্ গৃহকাজ।
সংসারের কেহ নহ অন্তরের তুমি।
অন্তরে তোমার গৃহ, আর গৃহ নাই-
বাহিরে কাঁদুক পড়ে বাহিরের কাজ। (১ম অ/২য় দৃ)

কিন্তু রাণী সুমিত্রা রাজার এই সর্বগ্রাসী প্রেম মেনে নিতে পারে না। সে রাজাকে বলে, 'অন্তরে প্রেয়সী তব, বাহিরে মহিষী'। আরও স্পষ্ট উচ্চারণ শোনা যায় রাণীর কণ্ঠে, ''আমারে বেসোনা ভালো রাজশ্রীর চেয়ে''। রাণী রাজাকে অনুরোধ করে তিনি যেন প্রজা পীড়কদের রাজ্য থেকে দূর করে দেন। কিন্তু প্রজা পীড়করা তো সবাই রাণীর আত্মীয়। বিক্রমদেব কারো সঙ্গে বিরোধে জড়াতে চান না, তিনি শুধু চান প্রেয়সীর প্রেমে আত্মনিমগ্ন থাকতে। প্রজা পীড়করা যখন বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয় তখন বিক্রমদেব তাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠানোর কথা ঘোষণা করেন। রাজার এই পরিকল্পনায় রাণী অপমানিত বোধ করে। তার মনে হয়, 'ধিক্ আমি, এ রাজ্যের রানী'! একারণেই সুমিত্রা আপন কর্তব্য বলে যাত্রা করলো কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে।

সেখানে ভাই কুমারসেনের সাহায্য নিয়ে রাজ্যের বিদ্রোহ দমন করাই তাঁর উদ্দেশ্য। এদিকে রাজ্য ছেড়ে রাণীর চলে যাওয়ার কথা শুনে বিক্রমদেবের মোহভঙ্গ হল। প্রেম পরিণত হল প্রতিহিংসায়। তিনি আদেশ দিলেন—

> সৈন্যদল করহ প্রস্তুত। যুদ্ধে যাব,
> নাশিব বিদ্রোহ। (২য় অ/৪র্থ দৃ)

রাণী সুমিত্রা ভাই কুমারসেনের সাহায্য নিয়ে বিদ্রোহীদের বন্দী করে বিক্রমদেবের শিবিরে নিয়ে আসে। কিন্তু বিক্রমদেব রাণীকে তার শিবিরে প্রবেশ করতে দিলেন না। তার অন্তরে ধ্বংসের আগুন জ্বলে উঠেছে, জ্বলে উঠেছে হিংসার আগুন—

> এ প্রবল হিংসা ভালো, ক্ষুদ্র প্রেম চেয়ে,
> প্রলয় তো বিধাতার চরম আনন্দ।
> হিংসা এই হৃদয়ের বন্ধন মুক্তির।
> সুখ। হিংসা জাগরণ। হিংসা স্বাধীনতা। (৪র্থ অ/ ৫ম দৃ)

এই হিংসার আগুনের তাড়নায় বিক্রমদেব কুমারসেনকে বন্দী করার জন্য কাশ্মীর পর্যন্ত অভিযান করেন। কুমারসেন এবং সুমিত্রা অরণ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কুমারসেনকে না পেয়ে বিক্রমদেব সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালান, নগরে আগুন লাগিয়ে দেন। বিক্রমদেবের অত্যাচার থেকে সাধারণ মানুষদের বাঁচানোর স্বার্থে কুমারসেন আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় কুমারসেন ধরা দেয় না। সে আত্মঘাতী হয় এবং রাণী সুমিত্রা কুমারসেনের ছিন্ন মুন্ড বিক্রমদেবের কাছে নিয়ে আসে এবং নিজে মৃত্যু বরণ করে। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই রাজা বিক্রমদেবের প্রতিহিংসার আগুন নির্বাপিত হয়।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি 'মায়ার খেলা'য় প্রেমের যে স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে 'রাজা ও রানী'তে তাই সম্প্রসারিত হল। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সঙ্গেও 'রাজা ও রানী'র সাদৃশ্য রয়েছে। একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য 'রাজা ও রানী'র সূচনা অংশ থেকে উদ্ধারযোগ্য।

> প্রকৃতির প্রতিশোধের সঙ্গে 'রাজা ও রানী'র এক জায়গায় মিল আছে। অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়ে তা হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে। এই তত্ত্বকেই যে সজ্ঞানে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে তা নয়। এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ

পাবার জন্যে স্বত উদ্যত হয়েছে যে, সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি যোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম,
প্রেম মেলে না।
শুধু সুখ চলে যায়
এমনি মায়ার ছলনা।[১১৩]

বিক্রমদেব সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করেছিলেন, নিজ কর্তব্য অবহেলা করে আত্মসুখে নিমগ্ন হয়েছিলেন বলেই দেখা দিল বিপর্যয়।

বিক্রমদেবের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে দু'ভাবে। রাণী সুমিত্রা যখন রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে কাশ্মীরে চলে যায় তখন বিক্রমদেবের আত্মমগ্নতার ঘোর যায় কেটে। হৃদয়ে জন্ম নেয় প্রতিহিংসা। তাঁর মনে হয়—

একি মুক্তি! একি পরিত্রাণ! কী আনন্দ
হৃদয় মাঝারে! অবলার ক্ষীণ বাহু
কী প্রচন্ড সুখ হতে রেখেছিল মোরে
বাঁধিয়া বিবর মাঝে! ... (৪র্থ অ/১ম দৃ)

এই বিবর থেকে বেরিয়ে এসে মনে হয় মুক্তি পাওয়া গেল। কিন্তু এতো প্রকৃত মুক্তি নয়। এ প্রতিহিংসার লেলিহান অগ্নিশিখা। কিন্তু প্রকৃত মুক্তির জন্য বিক্রমদেবকে দিতে হয়েছে চরম মূল্য। যখন রাণী সুমিত্রা তাঁর সামনে কুমার সেনের ছিন্ন মুন্ড নিয়ে উপস্থিত হয় এবং নিজে মৃত্যু বরণ করে। এই তীব্র আঘাতেই বিক্রমদেবের সত্যকার মুক্তি অর্থাৎ উত্তরণ সাধিত হয়। নির্বাপিত হয় হিংসার লেলিহান শিখা। তাই বিক্রমদেবকে শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ করতে হয়—

দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জনাও করিলেনা? রেখে
গেলে চির অপরাধী করে? ইহ জন্ম
নিত্য অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব; তাহারও দিলে না অবকাশ?

দেবতার মত তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,
অমোঘ তোমার দন্ড, কঠিন বিধান! (৫ম অ/ ৯ম দৃ)

'রাজা ও রানী'তে 'পথ'-এর দৃশ্য আছে দুইটি। প্রথম অঙ্ক/ দ্বিতীয় দৃশ্য 'রাজপথ'। এই 'রাজপথ' 'লোকারণ্য'। বিক্রমদেবের উদাসীনতায় বিদেশীরা সাধারণ প্রজাদের উপর অত্যাচার শুরু করেছে। প্রজারা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য একজোট হয়েছে রাজপথে। তারা বিদ্রোহ করতে চায় কিন্তু রাজার বাল্যসখা ব্রাহ্মণ দেবদত্ত যখন তাদের বোঝায় 'কান্নাই তোমাদের অস্ত্র' তখন তারা তাকেই সত্য বলে মনে করে। রবীন্দ্রনাটকের বিশিষ্ট জনতা চরিত্রের প্রকাশ এই দৃশ্যটিতে দেখা যায়। নির্বুদ্ধিতা যাদের বৈশিষ্ট্য এবং যারা অপরের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'পথ' কোন প্রতীকী মাত্রায় প্রকাশ পায় না। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য কাশ্মীর, প্রাসাদ সম্মুখে রাজপথ। এই দৃশ্যে দেখা যায় দু'জন সৈনিককে যারা কুমার সেন কবে রাজা হবে এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে। এছাড়া রয়েছে কুমারের বৃদ্ধ ভৃত্য শংকর। পুরুষবেশী রাণী সুমিত্রাকেও দেখা যায় এই দৃশ্যে। এই দৃশ্যের পথও কোন প্রতীকী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারে না। এছাড়া পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটি সংঘটিত হচ্ছে 'হাট'-এ। এই হাট-এ রয়েছে 'লোক সমাগম'। শ্রী প্রমথ নাথ বিশী রবীন্দ্রনাটকের pattern সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন এই দৃশ্যটি তা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি বলেছেন, ''শেষ পর্যন্ত যে pattern বা কাঠামোয় তিনি উপনীত হইয়াছেন তা একটি মেলা ও মেলাটির নিকটবর্তী একটি পথ।''[১১৬] কিন্তু এই একটি মাত্র দৃশ্যের দ্বারা প্রমাণ করা যায় না যে 'রাজা ও রানী' নাটকে রবীন্দ্রনাটকের নিজস্বতা প্রকাশ পেয়েছে। জনতা চরিত্র, নাটকে দৃশ্যপট হিসেবে পথের প্রয়োগ ইত্যাদি দু'একটি ছোট-খাটো আভাস থাকলেও 'রাজা ও রানী' শেক্‌স্‌পীয়রীয় রীতিতেই লেখা। কিন্তু নাটকের যে বিষয়বস্তু তা পুরোপুরিভাবেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। যেখানে রয়েছে বন্ধন মুক্তির কথা।

বিসর্জন

'রাজা ও রানী'র মত পাঁচ অঙ্কের শেক্‌স্‌পীয়রীয় রীতিতে রচিত হল 'বিসর্জন'। 'বিসর্জন'-এর প্রকাশকাল এবং এর বিভিন্ন সংস্করণ প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন—

> বিসর্জন প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালে [২ জ্যৈষ্ঠ]। প্রথম সংস্করণের পাঁচটি অঙ্ক ও ঊনত্রিশটি দৃশ্য ছিল। ১৩০৩ আশ্বিনের 'কাব্যগ্রন্থাবলী' সংস্করণে নাটকটি বহুল সংস্কার হয় ও দৃশ্য সংখ্যা হয় একুশটি; হাসি, কেদারেশ্বর, অপর্ণার অন্ধপিতা প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্র বর্জিত হয়। প্রধানত 'কাব্যগ্রন্থাবলী'—

সংস্করণকে ভিত্তি করে 'দ্বিতীয় সংস্করণ' প্রকাশিত হল ১ আষাঢ় ১৩০৬ সালে। এতে কাব্যগ্রন্থাবলী-র পঞ্চম অংকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্য মিলিয়ে প্রথম দৃশ্য এবং প্রথম ও চতুর্থ দৃশ্য মিলিয়ে দ্বিতীয় দৃশ্য গঠিত হয়, শেষ দৃশ্যের সমাপ্তি অংশটি নূতন রচনা। কাব্যগ্রন্থাবলী ও 'দ্বিতীয় সংস্করণ' মিলিয়ে আর একটি সংস্করণ প্রস্তুত হয় কাব্যগ্রন্থ নবমভাগের [১৩১০] অন্তর্ভুক্ত 'বিসর্জন'-এ। ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত 'তৃতীয় সংস্করণ' -এ প্রথম সংস্করণের অনেক অংশ নানা পরিবর্তন সহ গৃহীত হয়, 'হাসি' চরিত্রটির পুনঃ-প্রবর্তন ঘটে। পরবর্তীকালে ১৩৩৮ সালে ১৩১০-এর কাব্যগ্রন্থ সংস্করণটি আবার ফিরে এল—মোটের উপর এই পাঠটিই বর্তমানে প্রচলিত।[১২৭]

'বিসর্জন' 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রথম অংশের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ত্রিপুরার রাজমহিষী ছিলেন নিঃসন্তান। সন্তান লাভের জন্য তিনি কালী প্রতিমার কাছে পশু বলি দেওয়ার সংকল্প করেন। এই সংকল্প থেকেই 'বিসর্জন' নাটকে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। ভিখারিনী অপর্ণা রাজা গোবিন্দমাণিক্যের কাছে অভিযোগ করে যে রাজার অনুচরেরা তার ছাগশিশু ধরে নিয়ে এসেছে বলি দেওয়ার জন্য। অপর্ণা তার ছাগশিশুকে নিজের সন্তানের মত স্নেহ করে। রাজপুরোহিত রঘুপতির পালিত পুত্র এবং কালী মন্দিরের সেবক জয়সিংহ যখন তাকে বলে—

আপনি নিয়েছে
যারে বিশ্বমাতা, তার তরে ক্রন্দন কি
শোভা পায়? (১অ/ ১দৃ:)

এর উত্তরে অপর্ণা তাই বলে—

কে তোমার বিশ্বমাতা! মোর
শিশু চিনিবে না তারে। মা হারা শাবক
জানে না সে আপন মায়েরে। আমি যদি
বেলা করে আসি, খায় না সে তৃণদল,
ডেকে ডেকে চায় পথপানে—কোলে করে
নিয়ে তারে, ভিক্ষা-অন্ন কয়জনে ভাগ
করে খাই। আমি তার মাতা। (ঐ)

জয়সিংহ আবারও যখন বলে 'মা তাহারে নিয়েছেন' তার প্রতিবাদ করে অপর্ণা বলে, 'মিছে কথা! রাক্ষসী নিয়েছে তারে!' ভিখারিণী বালিকার করুণ আকুতি রাজা গোবিন্দমাণিক্যের অন্তরে আঘাত করে এবং তার অন্তরে করুণার সঞ্চার হয়। একারণেই তিনি রাজ্যে বলি বন্ধ করে দেন। বলি বন্ধ করে দেওয়ার ফলে রাজপুরহিত রঘুপতির সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের বিরোধ শুরু হয়। এ বিরোধকে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "Church ও State-এর বিবাদ—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের চিরন্তন কলহ।"[১১৮] আরেক দিকে মন্দির থেকে বলি ফিরিয়ে দেওয়ার কারণে রাণী গুনবতীর সঙ্গেও রাজার বিরোধ দেখা দেয়। রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে এবং যুবরাজ নক্ষত্ররায়কে গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যার জন্য প্ররোচিত করে। সে বোঝায় এ হচ্ছে মাতৃ-আজ্ঞা। কিন্তু জয়সিংহ গুরুর এ আদেশ মাতৃ-আজ্ঞা বলে প্রচার করাকে মেনে নিতে পারে না। এর মধ্য দিয়েই জয়সিংহের অন্তরে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। একদিকে ভিখারিনী অপর্ণার মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে আসার আহ্বান অন্যদিকে গুরুর আদেশ জয়সিংহকে ক্ষতবিক্ষত করে। একসময় জয়সিংহের মনে হয়—

তুমি
সত্য, গুরুদেব, তোমারি আদেশ সত্য—
সত্যপথ তোমারি ইঙ্গিতমুখে। হত্যা
পাপ নহে, ভ্রাতৃহত্যা পাপ নহে, নহে
পাপ রাজহত্যা!— সেই সত্য, সেই সত্য! (২ অ:/৩ দৃ:)

কিন্তু এই জটিল চিন্তাজাল ছিন্ন করে মুক্তির স্বাদ গ্রহণের জন্য পরক্ষণেই আবার বেরিয়ে পড়বার বাসনা জাগে—

কোথা যাও ভাই-সব, মেলা আছে বুঝি
নিশিপুরে? কুকী রমনীর নৃত্য হবে?
আমিও যেতেছি। (ঐ)

গান গেয়ে ওঠে মন—

আমার এই বাধা টুটে নিয়ে যা লুটে পুটে,
পড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে। (ঐ)

আর অপর্ণাকে উদ্দেশ্য করে জয়সিংহ তাই বলে ওঠে—

আয় সখী,

চিরদিন চলে যাই দুইজনে মিলে

সংসারের 'পর দিয়ে, শূন্য নভস্তলে

দুই লঘু মেঘখন্ড-সম। (ঐ)

এই মুক্তি আকাঙ্ক্ষার আত্মমগ্নতা থেকে জয়সিংহ রঘুপতিকে বলে—

তোমারে চিনিনে আমি। আমি চলিয়াছি

আমার অদৃষ্টভরে ভেসে নিজ পথে,

পথের সহস্র লোক যেমন চলেছে।

তুমি কি বলিছ মোরে দাঁড়াইতে? তুমি

চলে যাও—আমি চলে যাই। (ঐ)

কিন্তু কিছু পরেই জয়সিংহকে পুনরায় বলতে হয়—

প্রভু! পিতা! গুরুদেব!

কী বলিতেছিনু! স্বপ্নে ছিনু এতক্ষণ। (ঐ)

জয়সিংহের এই দ্বন্দ্বময়তায় একদিকে গুরুদেবসম পালিত পিতা রঘুপতি এবং তার মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ অন্যদিকে মুক্তিপথের দিশারী অপর্ণা। অপর্ণা যখন জয়সিংহকে আহ্বান জানিয়েছে এই বলে, 'তুমি চলে এসো জয়সিংহ, এমন্দির ছেড়ে/ দুইজনে চলে যাই।' কিন্তু জয়সিংহ মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না। বলে, 'বন্দী আমি সত্য-কারাগারে'। জয়সিংহের কাছে মন্দির ছেড়ে চলে যাওয়াটা সত্য নয়, সত্য হচ্ছে মন্দিরে থেকে গুরুর আদেশ পালন করা। তাই নক্ষত্ররায় যখন গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করতে পারে না তখন রঘুপতি জয়সিংহকেই আদেশ করে গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করার জন্য। জয়সিংহ প্রতিজ্ঞা করে—

আমি এনে দিব রাজরক্ত, শ্রাবণের

শেষ রাত্রে দেবীর চরণে। (২ অ:/৪ দৃ:)

জয়সিংহ গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করতে পারেনি। শ্রাবণের শেষ রাত্রে নিজেই আত্মঘাতি হয়েছে প্রতিমার সামনে। গুরুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে রাজরক্ত নিয়ে আসবে সেই প্রতিজ্ঞাই সে পালন করে—

রাজরক্ত

চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী

মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না

তৃষা? আমি রাজপুত, পূর্বপিতামহ

ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর

মাতামহবংশ—রাজরক্ত আছে দেহে।

এই রক্ত দিব। এই যেন শেষ রক্ত

হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন

অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ততৃষাতুর। (৫ম অ:/১ম দৃ:)

একে মৃত্যু না বলে জয়সিংহের আত্ম-বিসর্জন বললেই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত বলে আমরা মনে করি। রঘুপতির সমস্ত ধরনের কর্মকান্ডকেই জয়সিংহের কাছে অন্যায় এবং অসত্য মনে হয়েছে কিন্তু তবুও সে রঘুপতির আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি। অপর্ণা তাকে যে আহ্বান জানিয়েছিল সে আহ্বানে সে সাড়া দিতে পারে নি কিন্তু অন্তরে ছিল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। আর এই মুক্তির পথ হিসেবে সে বেছে নিল আত্ম-বিসর্জন। এই আত্ম-বিসর্জনের মধ্যদিয়ে বিসর্জিত হল মিথ্যা বিশ্বাস। রঘুপতির দীর্ঘদিনের অন্ধ বিশ্বাসের সৌধ জয়সিংহের মৃত্যুর মুহূর্তেই ভেঙ্গে গেল। রঘুপতির অন্ধকার অন্তরে আলোর প্রবেশ ঘটলো জয়সিংহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। পুত্রসম এই শিষ্যের মৃত্যুর আঘাতেই রঘুপতির ঘটলো উত্তরণ। এই উত্তরণ অমানবিকতা থেকে মানবিকতায়, মিথ্যা থেকে সত্যে। এতদিন যে অপর্ণাকে অবহেলা করেছিল এই উত্তরণের কারণেই রঘুপতি তাকেই 'আয় মা অমৃতময়ী' বলে সম্বোধন করলো। আর অপর্ণাও রঘুপতিকে আহ্বান জানালো 'পিতা, এসো এ মন্দির ছেড়ে যাই মোরা'। অপর্ণা গোড়াতেই বুঝেছিল এই মন্দিরকে ঘিরেই মিথ্যা বিশ্বাস এবং অমানবিকতার অন্ধকার জমাট বেঁধেছে সুতরাং এখান থেকে মুক্তি প্রয়োজন। রঘুপতির অন্ধ বিশ্বাস চূর্ণ হওয়ার পরেই মনে হয়েছে দেবী কোথাও নেই। কারণ যে দেবীকে তুষ্ট করার জন্য এত হত্যা, এত রক্ত, এত ষড়যন্ত্র সেই দেবীই তার সবচেয়ে আপনার জনকে কেড়ে নিল। তাই বিশ্বাস গেল ভেঙ্গে। দেবীকে মনে হল 'জড়/ পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্বোধের মতো।/ মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির'। এ কারণেই সে কালী প্রতীমাকে নিক্ষেপ করে নদীর জলে। রানী গুণবতী যখন মন্দিরে পূজা দিতে এসে দেখে মন্দিরে দেবী নেই তখন রঘুপতিকে জিজ্ঞেস করে 'দেবী কই'? তার উত্তরে রঘুপতি দৃঢ় ভাবে বলে—

কোথাও সে

নাই। ঊর্দ্ধে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে

নাই, কোথাও সে ছিলনা কখনো। (৫ অ:/৪ দৃ:)

রঘুপতির এই কথা বিশ্বাস করে গুণবতী এবং তারও অন্তরে পরিবর্তন ঘটে। অন্তরের পরিবর্তনের কারণেই এত দিনের দ্বন্দ্ব ভুলে মিলন হয় রাজার সঙ্গে এবং রাজাকে উদ্দেশ্য করে গুণবতী বলে ওঠে—

আজদেবী নাই-

তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা। (ঐ)

'বিসর্জন' বন্ধন মুক্তির নাটক। গোবিন্দমাণিক্য, গুণবতী, রঘুপতি সকলেরই বন্ধন-মুক্তি ঘটে। আত্ম-বিসর্জনের মধ্য দিয়ে জয়সিংহরও বন্ধন-মুক্তি ঘটে। 'বিসর্জন' একদিকে যেমন জয়সিংহের আত্ম-বিসর্জন তেমনি অন্যদিকে মিথ্যা বিশ্বাস বিসর্জনও বটে।

'বিসর্জন'-এ 'পথ' দৃশ্যপট হিসেবে দেখা দিয়েছে একবার। ২য় অংকের ৩য় দৃশ্যটি 'মন্দির-সম্মুখে পথ'। জয়সিংহ বসে আছে। মানুষজন পথ দিয়ে চলেছে মেলার দিকে। পথের এই দৃশ্যরূপ তার অন্তরে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয়। তারও ইচ্ছে জাগে মন্দিরের এই অবরুদ্ধতা থেকে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আনন্দ করতে, নিজেকে বিলিয়ে দিতে সকলের মাঝে। একারণেই জয়সিংহ গেয়ে ওঠে, "আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে।" এই আত্ম-মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকেই অপর্ণাকে সঙ্গী করে সংসার থেকে চিরদিনের জন্য ভারহীন মেঘের মত বেরিয়ে পড়ার বাসনা দেখা দেয়। আকাঙ্ক্ষার এই আত্মমগ্নতায় রঘুপতিকে তার মনে হয় অপরিচিত —

তোমারে চিনিনে আমি। আমি চলিয়াছি
আমার অদৃষ্টভরে ভেসে নিজ পথে,
পথের সহস্র লোক যেমন চলেছে।

দেবী অথবা মন্দির প্রাঙ্গন ছেড়ে সংসারের রাজপথই তারকাছে মুক্তির নিশানা মনে হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত জয়সিংহ মুক্ত হতে পারে না, তার মুক্তি আসে অনেক পরে অন্যভাবে। তবুও পথের চলমান দৃশ্যপটকে সামনে রেখে জয়সিংহের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এই পথকে প্রতীকী মাত্রায় উজ্জ্বল করে তোলে। পথ হয়ে ওঠে মুক্তির প্রতীক, যা পরিণত রবীন্দ্রনাট্যের অনন্য সংযোজন।

'বিসর্জন'-এ সাধারণ জনতার উপস্থিতি রয়েছে তিনটি দৃশ্যে। ১ম অঙ্কের ৫ম দৃশ্য, ২য় অঙ্কের ৪র্থ দৃশ্য এবং ৩য় অঙ্কের ১ম দৃশ্যে জনতার উপস্থিতি রয়েছে। এইসব দৃশ্যের সাধারণ জনতা রবীন্দ্রনাট্যের বিশিষ্ট জনতা। যারা অশিক্ষিত এবং নির্বুদ্ধিতাই যাদের বৈশিষ্ট্য। একারণেই রঘুপতি যখন প্রতিমার মুখ

পিছনে ফিরিয়ে দিয়ে বলে যে দেবী বিমুখ হয়েছে তখন তারা তাই বিশ্বাস করে আবার যখন অপর্ণা সেই ফেরানো মুখকে সামনে ঘুরিয়ে দেয় তখন তারা বিশ্বাস করে যে দেবী পুনরায় সদয় হয়েছে। নিজেদের বিচার বুদ্ধি বলে তারা কোন কিছুই নির্ধারণ করতে পারে না।

নির্দেশিকা

১. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯০। পৃ: ১০১।

২. ঐ, পৃ: ১৪।

৩. ঐ, পৃ: ৯৯।

৪. মহলানবিশ, প্রশান্তচন্দ্র, 'রবীন্দ্রপরিচয়', *প্রবাসী*, শ্রাবণ ১৩২৯।

৫. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* - ১ম খন্ড, পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৯২। বিশ্বভারতী। পৃ: ১০৭।

৬. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* - ৩য় খন্ড, মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৩৫৩, পৃ: ৪১।

৭. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* - ১ম খন্ড। পৃ: ১০৭ - ৮।

৮. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড। পৃ: ১০২।

৯. ঐ।

১০. সিকদার, অশ্রুকুমার, *রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য*, প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৩। পৃ: ২০০।

১১. ঐ।

১২. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* - ৩য় খন্ড। পৃ: ৪৭।

১৩. '' 'নাটিকা' ছাপ সত্ত্বেও 'রুদ্রচন্ড' গাথা-কাব্যেরই সগোত্র, এবং ইহাই রবীন্দ্রনাথের শেষ গাথাকাব্য।''—সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* - ৩য় খন্ড। পৃ: ৪৭।

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*, পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪০১, বিশ্বভারতী। পৃ: ১০৮।

১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা, ভগ্নহৃদয়। *রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ*-১ম খন্ড। বিশ্বভারতী।

১৬. সমাদ্দার, শেখর, *নাট্যমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ*, প্যাপিরাস, জানুয়ারি ১৯৯৮। কোলকাতা। পৃ: ১৩-১৪।

১৭. গ্রন্থপরিচয়, *রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ* - ১ম খন্ড।

১৮. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, 'বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ', *বঙ্কিম মৃত্যুবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ*, সম্পাদক অশোক কুন্ডু। দি নিউ বুক ষ্টল, কলকাতা। ৯ মে ১৯৯৪।

১৯. গ্রন্থপরিচয়, *রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ* - ১ম খন্ড।

২০. সিকদার, অশ্রুকুমার, 'খেদের গান', *রাতের তারা দিনের রবি*, সম্পাদনা উজ্জলকুমার মজুমদার। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম সংস্করণ ১লা বৈশাখ ১৩৯৫। পৃ: ৯০।

২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১০৮।

২২. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড।পৃ: ১৪।

২৩. ঐ, পৃ: ৫৪।

২৪. ঐ।

২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১০৮।

২৬. বিশী, প্রমথনাথ, 'ভগ্নহৃদয়', *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা। বৈশাখ - আষাঢ়, ১৩৫১।

২৭. *রবীন্দ্ররচনাবলী* - ৩০ খন্ড। বিশ্বভারতী।

২৮. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* - ১ম খন্ড। পৃ: ১১৩।

২৯. ঐ।

৩০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১০৮।

৩১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভগ্নহৃদয়-এর ভূমিকা। *রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ*-১ম খন্ড।

৩২. ঐ।

৩৩. ঐ।

৩৪. বিশী, প্রমথনাথ, 'ভগ্নহৃদয়', *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা। বৈশাখ - আষাঢ়, ১৩৫১।

৩৫. সিকদার, অশ্রুকুমার, *রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য*। পৃ: ৪৩।

৩৬. গুপ্ত, ড: সুশীলকুমার, *রবীন্দ্রনাট্য প্রসঙ্গ: কাব্যনাটক*, প্রকাশকাল ১৩৬৮। পৃ: ৩১।

৩৭. চৌধুরী, শ্রীভূদেব, *বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের ইতিকথা* (প্রথম পর্ব), ['বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'-তৃতীয় পর্যায়], প্রথম প্রকাশ: আষাঢ়, ১৮৯২ শকাব্দ। পৃ: ৬৭।

৩৮. ঐ, পৃ: ৬৮।

৩৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *যোগাযোগ*।

৪০. *বান্ধব*, কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত। আষাঢ় ১২৮৮ (১৮৮১)। পৃ: ১৪৩।

৪১. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, 'রবীন্দ্রনাটকের ধারা' (একটি ঐতিহাসিক আলোচনা), *শনিবারের চিঠি*, বৈশাখ ১৩৬৭।

৪২. শেঠ, জীবনকৃষ্ণ, *রবীন্দ্রনাটক প্রসঙ্গ*, প্রথম সংস্করণ, পৌষ ১৩৬৩। পৃ: ১১।

৪৩. গুপ্ত, ড: সুশীলকুমার, *রবীন্দ্রনাট্য প্রসঙ্গ: কাব্যনাটক*, প্রকাশকাল ১৩৬৮। পৃ: ৪৪।

৪৪. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড।পৃ: ১০২।

৪৫. শেঠ, জীবনকৃষ্ণ, *রবীন্দ্রনাটক প্রসঙ্গ*। পৃ: ১১।

৪৬. Thompson Edward, *Rabindranath Tagore Poet and Dramatist*, Second Edition, 1948, London. p. 30.

৪৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সংঘমিত্রা, *রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব*, প্রথম প্রকাশ ১৫ এপ্রিল ১৯৭৮, কলকাতা। পৃ: ২৩১- ৩২।

৪৮. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী*- ২য় খন্ড। পৃ: ৮৫।

৪৯. ঐ, পৃ: ৮৩।

৫০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতির প্রথম পান্ডুলিপি, *রবীন্দ্রবীক্ষা*, সংকলন ১৩, শ্রাবণ ১৩৯২। বিশ্বভারতী, পৃ: ৩৯।

৫১. রায়, শ্রীবার্ণিক, 'রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য, *গীতবিতান পত্রিকা*, রবীন্দ্রজন্ম শত বার্ষিকী, ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৮। পৃ: ৯৮।

৫২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বিহারীলাল', *আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী*- নবমখন্ড। বিশ্বভারতী। পৃ: ৪২১।

৫৩. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপদ, *রবীন্দ্রচর্যা*, জেনারেল ১৯৭৩। পৃ: ১১৭-১৮।

৫৪ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সূচনা, *বাল্মীকি প্রতিভা, রবীন্দ্র-রচনাবলী*- প্রথম খন্ড। বিশ্বভারতী।

৫৫. রায়, নীহাররঞ্জন, *রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ২২শে শ্রাবণ, ১৩৬৯। কলকাতা। পৃ: ২৫৩।

৫৬. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপদ, *রবীন্দ্রচর্যা*, জেনারেল১৯৭৩। পৃ: ১১৯।

৫৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১১৬।

৫৮. Thompson Edward,*Rabindranath Tagore Poet and Dramatist*, Rddhi edition 1979. p. 32.

৫৯. গ্রন্থপরিচয় অংশ, *রবীন্দ্র রচনাবলী*-১৭শ খন্ড, বিশ্বভারতী, পৃ: ৪৭২।

৬০. সেন, ড: সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* - ৩য় খন্ড। পৃ: ২৪৭।

৬১. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী*- ২য় খন্ড। পৃ: ৮৩।

৬২. চক্রবর্তী, সুধীর, 'গানের দুই রাজা: রবীন্দ্রনাথ ও রবার্ট বার্নস', *গানের লীলার সেই কিনারে*, ১৩৯২। পৃ: ৪২। —আমরা এই উদ্ধৃতিটি সংগ্রহ করেছি প্রশান্তকুমার পালের রবিজীবনী- ২য় খন্ড থেকে। পৃ: ৮৩।

৬৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতির প্রথম পাণ্ডুলিপি, *রবীন্দ্রবীক্ষা*, সংকলন - ১৩,শ্রাবণ ১৩৯২। বিশ্বভারতী। পৃ: ৩৯।

৬৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বিহারীলাল', *আধুনিক সাহিত্য*, রবীন্দ্ররচনাবলী - নবম খন্ড, বিশ্বভারতী। পৃ: ৪৩২।

৬৫. ঐ।

৬৬. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী*- ২য় খন্ড। পৃ: ৮০।

৬৭. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপদ, *রবীন্দ্র-চর্যা*। পৃ: ১২২।

৬৮. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* - ১ম খন্ড। পৃ: ১০১।

৬৯. ঐ।

৭০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১১৭।

৭১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা', *সংগীত চিন্তা*, অগ্রহায়ণ ১৩৯৯। বিশ্বভারতী। পৃ: ২৭৪।

৭২. বসু, সৌমিত্র, *রবীন্দ্রনাটকের নির্মাণ শৈলী: উনিশ শতক*, প্রথম প্রকাশ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯৩। কলকাতা, পৃ: ৮৩।

৭৩. রায়, বার্ণিক, *রবীন্দ্রনাটকের উৎস*, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭ ডিসেম্বর, কলকাতা। পৃ: ২১।

৭৪. সিকদার, অশ্রুকুমার, 'রবীন্দ্রমঞ্চ ও নাট্যাদর্শ,' *বাক্যের সৃষ্টি: রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮১। কলকাতা। পৃ: ১২৩।

৭৫. দাস, পুলিন, *মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ ২৫ শে বৈশাখ, ১৩৯৮। কলকাতা, পৃ: ৬।

৭৬. ভট্টাচার্য, ড: গৌরীশঙ্কর, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, প্রথম প্রকাশ ১লা অক্টোবর, ১৯৭২, কলকাতা। পৃ: ৬১১।

৭৭. ঐ।

৭৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি* । পৃ: ১১৬।

৭৯. J. Dent, Edward, *Opera*, Penguin 1949, P. 16-17.

৮০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি* । পৃ: ১১৭।

৮১. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী*- ২য় খন্ড। পৃ: ১৫৭।

৮২. ঐ, পৃ: ১৫৮।

৮৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১১৭।

৮৪. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী*- ২য় খন্ড। পৃ: ১৫৮।

৮৫. রায়, শ্রীবার্ণিক, 'রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য', *গীতবিতান পত্রিকা*, ২৫ শে বৈশাখ ১৩৬৮। পৃ: ১০১-২।

৮৬. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, / চন্দ, শ্রীমতী রাণী, *ঘরোয়া*, পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৯৮। বিশ্বভারতী। পৃ: ৯৯।

৮৭. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* - ১ম খন্ড। পৃ: ১৬৯।

৮৮. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* - ৪র্থ খন্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৬। পৃ: ১৯২।

৮৯. ঐ, পৃ: ১৯৪ - ৯৫।

৯০. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী*- ২য় খন্ড। পৃ: ২০৮।

৯১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১৪১।

৯২. ঐ, পৃ: ১৪২।

৯৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সূচনা, প্রকৃতির প্রতিশোধ, *রবীন্দ্ররচনাবলী* - ১ম খন্ড। বিশ্বভারতী।

৯৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১৪১।

৯৫. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* - ৪র্থ খন্ড। পৃ: ১৯৩ - ৯৪।

৯৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১৪১ - ৪২।

৯৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *আত্মপরিচয়*, সংস্করণ ১৪০০। বিশ্বভারতী। পৃ: ২১।

৯৮. ঐ, পৃ: ২৫।

৯৯. ঐ, পৃ: ২৬।

১০০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সীমার সার্থকতা', *পথের সঞ্চয়*, *রবীন্দ্ররচনাবলী* ষড়্বিংশ খন্ড, বিশ্বভারতী। পৃ: ৫৬০ - ৬১।

১০১. *চিঠিপত্র* - ৮, বিশ্বভারতী। পৃ: ৪৫- ৪৬।

১০২. ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, *আত্মজীবনী*, সম্পাদনা অরবিন্দ মিত্র, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৬২। পৃ: ১১৭।

১০৩. ঐ, পৃ: ১৫৮।

১০৪. ঐ, পৃ: ১৫৯।

১০৫. আইয়ুব, আবু সয়ীদ, *পথের শেষ কোথায়*, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ অক্টোবর ১৯৯২। পৃ: ১০৬।

১০৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১৪১।

১০৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১৪২।

১০৮. চৌধুরী, শ্রীভূদেব, 'রবীন্দ্রনাথ ও সাংকেতিক নাটক'। *রবীন্দ্রভাবনা*, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৬। পৃ: ৮।

১০৯. ঘোষ, শঙ্খ, *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯৫। পৃ: ৬১।

১১০. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা*, ওরিয়েন্ট বুক কম্পানী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬১। পৃ: ২১৮।

১১১. বিশী, শ্রীপ্রমথনাথ, *রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ*, প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ ১৫ই আগস্ট, ১৯৬৬। পৃ: ৪৮৫ - ৮৬।

১১২. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড। পৃ: ২০৯।

১১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'মায়ার খেলা' নাটকের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন। *রবীন্দ্ররচনাবলী* - ১ম খন্ড। বিশ্বভারতী।

১১৪. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* - ১ম খন্ড। পৃ: ১৯৩।

১১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'মায়ার খেলা' নাটকের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন। *রবীন্দ্ররচনাবলী*-১ম খন্ড। বিশ্বভারতী।

১১৬. চৌধুরাণী, ইন্দিরা দেবী, *রবীন্দ্রস্মৃতি*, পুনরমুদ্রণ বৈশাখ ১৩৯৬। বিশ্বভারতী। পৃ: ৩৩।

১১৭. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী*- ৩য় খন্ড, প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কোলকাতা। পৃ: ১০৫।

১১৮. ঐ, পৃ: ৭৬।

১১৯. 'মায়ার খেলা' নাটকের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, *রবীন্দ্ররচনাবলী* - ১ম খন্ড। বিশ্বভারতী।

১২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সূচনা, *বাল্মীকি প্রতিভা*। *রবীন্দ্ররচনাবলী* - ১ম খন্ড। বিশ্বভারতী।

১২১. দাস, পুলিন , *মঞ্চঅভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ* । পৃ: ১১

১২২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১১৭।

১২৩. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী*- ৩য় খন্ড। পৃ: ১২১।

১২৪. ঐ, পৃ: ১০৮।

১২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সূচনা, *রাজা ও রানী*, *রবীন্দ্ররচনাবলী* - প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী।

১২৬. বিশী, প্রমথনাথ, *রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ* - ২য় খন্ড। প্রথম ওরিয়েন্ট সংস্করণ - সেপ্টেম্বর ১৯৫৮। কোলকাতা। পৃ: ১৭।

১২৭ পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী*- ৩য় খন্ড । পৃ: ১৩২ - ৩৩।

১২৮. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* - ১ম খন্ড । পৃ: ২৮৫।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ কবি ও নাট্যকার

এক

এই অধ্যায়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের কাব্য ও নাটকগুলির আলোচনা করেছি। এই আলোচনায় আমরা কাব্যের ভাব বস্তুগত পরিচয় এবং নাটকের সঙ্গে তার যোগসূত্র, যোগসূত্রের আভাস ইত্যাদি বিষয়গুলি উদ্‌ঘাটনে মনোযোগী হব। এ ছাড়া কাব্য ও নাট্যের উপমাগত, শব্দগত অর্থাৎ প্রকাশরীতির সম্পর্ক নিরূপণ করতে সচেষ্ট হব।

'রবীন্দ্রনাট্যের অভিব্যক্তির ধারা' অধ্যায়ে আমরা প্রথম পর্যায়ের নাটকগুলির বিস্তারিত পরিচয় উপস্থাপন করেছি এবং পাশাপাশি আলোচনা করেছি গাথাকাব্যগুলি। (বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয়)। এই অধ্যায়ে সে কারণেই নাটকগুলির বিস্তারিত পরিচয় থাকছে না বা থাকছে না গাথাকাব্যগুলির আলোচনা। আমরা শুধুমাত্র প্রথম পর্যায়ের কাব্যগুলির পরিচয় উপস্থাপন এবং নাটকগুলির সঙ্গে তার যোগসূত্র উদ্‌ঘাটনে মনোনিবেশ করব। কবি রবীন্দ্রনাথ এবং নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোথাও কি কোন বিরোধ রয়েছে, অথবা এ দু'য়ের মধ্যে কি কোন ভেদরেখা টানা যায়, নাকি এ পর্যায়ে কবি ও নাট্যকার মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছেন---এসবেরই অনুসন্ধান আমাদের বর্তমান অধ্যায়ে উপস্থাপিত হবে।

শেষ জীবনে ''বাক্যের সৃষ্টির উপরে''[১] রবীন্দ্রনাথের সংশয় জন্মেছিল। কেননা জীবন ও জগতের অনেক বিষয়কেই প্রকাশ করা যাচ্ছে না বাক্যের সীমাবদ্ধতায়। তাই ''এই টলমলে অবস্থায় এখনো দুটো পাকা ঠিকানা পেয়েছি আমার বানপ্রস্থের---গান আর ছবি।''[২] কারণ, ''গান যখন সম্পূর্ণ জাগে মনের মধ্যে, তখন চিত্ত অমরাবতীতে গিয়ে পৌঁছায়''[৩]। আর ছবিতে উঠে এসেছে অশান্ত সময়ের রক্তময় রেখা। যারা ''আমার চৈতন্য-অন্তঃপুরে রেখারূপের জাদু নর্তকীরা একদিন পর্দানশীন ছিল, আজ পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এসেছে''[৪]। এসবই হয়তো প্রকাশ করা যাচ্ছিল না 'বাক্যের সৃষ্টিতে', তাই এই সংশয়। ভাবতে অবাক লাগে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা এই চিঠিতে 'বাক্যের সৃষ্টি'র প্রতি সংশয় প্রকাশ করার

কয়েক বছর আগেই তাঁর সত্তরতম জন্মদিনের ভাষণে বলেছেন, ''একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র''[৫]। তবে বাক্যের সৃষ্টির উপর না হলেও কাব্যের ক্ষমতার উপর তাঁর মধ্য যৌবনে একবার সংশয় জন্মেছিল। ১৩.৭.১৮৯৩-এ সাজাদপুর থেকে ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন, ''এক-এক সময় মনে হয় — আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয়...''[৬]। আবার ঐ চিঠিতেই লিখেছেন, ''অতএব একলা কবিতাটিকে নিয়ে থাকাই আমার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধে—বোধ হয় যেন উনিই আমাকে সবচেয়ে বেশী ধরা দিয়েছেন—আমার ছেলেবেলাকার ভালোবাসা, আমার বহুকালের অনুরাগিনী সঙ্গিনী''[৭]। আর সে কারণেই এই 'বহুকালের অনুরাগিনী সঙ্গিনী' জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি ভিন্ন পরিচয়ের সঙ্গে। নাট্যকার, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, চিত্রকর, সংগীতস্রষ্টা, প্রাবন্ধিক —এই প্রতিটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই জড়িয়ে আছেন, ছড়িয়ে আছেন কবি রবীন্দ্রনাথ। তাই নিজেকে 'নানাখানা' করে দেখে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে, ''একটি পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র''[৮]।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা লেখার সূত্রপাত হয়েছিল কি ভাবে 'জীবনস্মৃতি' পাঠে সে খবর জানা যায়।

> আমার বয়স তখন সাত-আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃ প্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়ো। তিনি তখন ইংরেজী সাহিত্যে প্রবেশ করিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে স্বগত উক্তি আওড়াইতেছেন। আমার মতো শিশুকে কবিতা লিখাইবার জন্য তাঁহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। একদিন দুপুর বেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, ''তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে।'' বলিয়া, পয়ার ছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। ... কোনো-একটি কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীল কাগজের খাতা জোগাড় করিলাম। তাহাতে স্বহস্তে পেন্‌সিল দিয়া কতকগুলো অসমান লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে শুরু করিয়া দিলাম।[৯]

এই হ'ল বিশ্বকবির কবিতা লেখার সূত্রপাত। আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের কালসীমা নির্দেশ করেছি ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ 'শৈশব সংগীত' থেকে 'ছবি ও গান' পর্যন্ত। আমাদের এই কালসীমা নির্দেশের পিছনে যে যুক্তি - তা হচ্ছে নাট্য-আলোচনার ক্ষেত্রেও আমাদের মূল লক্ষ্য 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' পর্যন্ত, যা রচিত হয় ১৮৮৪ সালে। যেহেতু প্রথম পর্যায়ের কাব্য ও নাট্যের ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্যের আলোচনাই এই

অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় সেকারণেই এই সীমানা নির্দেশ। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম তাঁর নিজস্ব নাট্যরীতির সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই কাব্য ক্ষেত্রেও এই কালসীমা। যদিও নাট্য-আলোচনা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' অতিক্রম করে 'বিসর্জন' পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে কিন্তু সে সম্প্রসারণ শুধুমাত্র এই পর্বের সমগ্র নাট্যরচনাবলীর পরিচয় উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজনে অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

এই সময়-কালের মধ্যে যে কাব্যগুলি থাকছে সেগুলি হচ্ছে, 'শৈশব সঙ্গীত', সন্ধ্যা সঙ্গীত', 'প্রভাত সংগীত', ও 'ছবি ও গান'।

'ছবি ও গান' প্রকাশিত হওয়ার মাস তিনেক পর প্রকাশিতহ'ল 'শৈশব সঙ্গীত'। ''বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক তালিকায় গ্রন্থটির প্রকাশ তারিখ 29 May 1884 [বৃহ ১৭ জ্যৈষ্ঠ]-।''[১০] কিন্তু ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হলেও 'শৈশব সঙ্গীত'-এর কবিতা গুলি লেখা হয়েছিল অনেক আগেই। গ্রন্থটির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতা গুলি প্রকাশ করিলাম, সুতরাং ইহাকে ঠিক শৈশব সঙ্গীত বলা যায় কিনা সন্দেহ''[১১]।

'শৈশব সঙ্গীত'-এ ১৭টি কবিতা রয়েছে, এর মধ্যে পাঁচটি গাথা। গাথা গুলি হচ্ছে, 'ফুলবালা', 'প্রতিশোধ', 'লীলা', 'অপ্সরা-প্রেম', 'ভগ্নতরী'। ১৭টি কবিতার মধ্যে নীচের ১৩টি কবিতা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

ছিন্ন লতিকা — অগ্রহায়ণ ১২৮৪

ভারতী বন্দনা — মাঘ ১২৮৪

ফুলবালা (গাথা)—কার্তিক ১২৮৫

দিকবালা — আষাঢ় ১২৮৫

প্রতিশোধ (গাথা)—শ্রাবণ ১২৮৫

লীলা (গাথা)—আশ্বিন ১২৮৫

অপ্সরা-প্রেম (গাথা)—ফাল্গুন ১২৮৫

প্রেম মরীচিকা—ফাল্গুন ১২৮৬

ভগ্নতরী (গাথা)—আষাঢ় ১২৮৬

কামিনী ফুল —ভাদ্র ১২৮৭

গোলাপবালা —অগ্রহায়ণ ১২৮৭

হরহৃদে কালিকা — আশ্বিন ১২৮৭

পথিক — পৌষ ১২৮৭

এছাড়া অন্য চারটি কবিতা অর্থাৎ 'অতীত ও ভবিষ্যৎ', 'ফুলের ধ্যান', 'প্রভাতী', ও 'লাজময়ী' বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে 'লাজময়ী' কবিতাটি 'ভগ্নহৃদয়'-এর সপ্তম সর্গে অনিলের গান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[১২]

'শৈশব সঙ্গীত'-এর ১৭টি কবিতার মধ্যে যে ৫টি গাথা কবিতা রয়েছে আমরা সে গুলির আলোচনা পরে করব আগে অন্য ১২টি কবিতার আলোচনা করছি।

'অতীত ও ভবিষ্যৎ' কবিতাটির সন্ধান পাওয়া যায় 'মালতীপুঁথিতে'।[১৩] 'মালতীপুঁথি'র পাণ্ডুলিপির 54/২৮খ পৃষ্ঠায় 'শৈশব সঙ্গীত' নামে কবিতাটি লিপিবদ্ধ আছে। কবিতাটির উপরে লেখা আছে—

বোটে লিখিয়াছি
মঙ্গলবার
২৪ আশ্বিন
১৮৭৭।

প্রবোধচন্দ্র সেন অনুমান করেছেন সম্ভবত এটাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম তারিখ দেওয়া কবিতা।[১৪] এই কবিতাটি কোথাও প্রকাশিত হয়নি। পরে 'শৈশব সঙ্গীত' কাব্য গ্রন্থে 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' নামে প্রকাশিত হয়। 'ভারতী'তে যখন এই সময় রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কবিতা ('ছিন্নলতিকা'- অগ্রহায়ণ ১২৮৪, 'ভারতীবন্দনা'-মাঘ ১২৮৪) প্রকাশিত হল তখন কেন এই কবিতাটি প্রকাশ করা হল না? প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন, "এই কবিতাটিতে কবির সেই সময়কার অবসন্ন চিত্তের বেদনা অতি করুণ ভাবে ফুটে উঠেছে"।[১৫] এই 'অবসন্ন চিত্তের বেদনা' প্রকাশ করতে কি কোন কুণ্ঠা বোধ ছিল? হয়তো সে কারণেই প্রকাশ করা হয়নি একান্ত ব্যক্তি বেদনার চালচিত্র।

কবিতাটিতে রয়েছে অতীত সুখস্মৃতির মন্থন এবং রয়েছে অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা। আর রয়েছে বর্তমানের 'অবসন্ন চিত্তের বেদনা'র চিত্র। অতীতের স্মৃতির রোমন্থন করে কল্পনা বালাকে বলা হচ্ছে—

জানত কল্পনা বালা, কত সুখে ছেলেবেলা
সেইখানে করেছি যাপন—
সেদিন পড়িলে মনে প্রাণ যেন কেঁদে ওঠে,
হু হু ক'রে ওঠে যেন মন।

বিশ্ব প্রকৃতিতে অতীতে যা ছিল এখনও তাই আছে কিন্তু কবির অন্তর বেদনায় আক্রান্ত। বর্তমানের এই করুণ পরিণতি তার ভবিষ্যৎকে এক অর্থহীন অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে।

প্রভাত এখনও আছে, এরি মধ্যে কেন তবে
আমার এমন দুরদশা —
অতীতে সুখের স্মৃতি, বর্ত্তমানে দুখজ্বালা,
ভবিষ্যতে এ কিরে কুয়াশা!
যেন এই জীবনের আঁধার সমুদ্র মাঝে
ভাসায়ে দিয়েছে জীর্ণ তরী,
এসেছি যেখান হতে অস্ফুট সে নীল তট
এখনো রয়েছে দৃষ্টি ভরি!

কিন্তু এই ভেসে যাওয়ার শেষে কি রয়েছে?

যেতেছি যেখানে ভাসি সে দিকে চাহিয়া দেখি
কিছুই ত না পাই উদ্দেশ—
আঁধার সলিলরাশি সুদূর দিগন্তে মিশে,
কোথাও না দেখি তার শেষ!
ক্ষুদ্র জীর্ণ ভগ্নতরি একাকী যাইবে ভাসি
যতদিন ডুবিয়া না যায়,
সমুখে আসন্ন ঝড়, সমুখে নিস্তব্ধ নিশি
শিহরিছে বিদ্যুৎ শিখায়।

এই কবিতা যদি আত্ম-প্রক্ষেপণ হয় তবে কি ছিল সে সময়ের অবস্থা? কি কারণে বিষাদময়তার দীর্ঘ নিঃশ্বাস? এ প্রসঙ্গে আমরা তুলে আনতে পারি 'জীবনস্মৃতি'র দুটি চিত্র, যার সাহায্যে প্রমাণিত হয়ে যাবে আত্ম-প্রক্ষেপণের অভিধাটি।

১. দাদারা মাঝে মাঝে এক-আধবার চেষ্টা করিয়া আমার আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন। আমাকে ভর্ৎসনা করাও ছাড়িয়া দিলেন। একদিন বড়দিদি কহিলেন, 'আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম, বড়ো হইলে রবি মানুষের মতো হইবে, কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল।" আমি বেশ বুঝিতাম,

ভদ্র সমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে কিন্তু তবু যে-বিদ্যালয় চারিদিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জেলখানা ও হাসপাতাল-জাতীয় একটা নির্মম বিভীষিকা, তাহার নিত্য আবর্তিত ঘানির সঙ্গে কোনোমতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না।[১৬]

২. বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনোদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা, না-আমার না-আর কাহারো মনে রহিল। কাজেই কোনো কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপনমনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম।[১৭]

এই দুটি চিত্রই 'অতীত ও ভবিষ্যত' কবিতার আত্মপ্রক্ষেপণের বিষয়টি প্রমাণ করে দেয়। আমাদের এই যুক্তির সমর্থন মেলে প্রবোধচন্দ্র সেনের লেখায়। তিনি লিখেছেন,"এই 'শৈশব সংগীত' (অতীত ও ভবিষ্যৎ) কবিতাটিই এই অশান্তি ও আক্ষেপের অন্যতম প্রধান নিদর্শন।"[১৮]

'অতীত ও ভবিষ্যৎ' কবিতাটির দূরাভাস যেন দেখতে পাওয়া যায় 'হরহৃদে কালিকা' কবিতাটিতে।

কে তুইলো হর-হৃদি আলো করি দাঁড়ায়ে,
ভিখারির সর্ব্বত্যাগী বুকখানি মাড়ায়ে?
নাই হোথা সুখ-আশা, বিষয়ের কামনা,
নাই হোথা সংসারের-পৃথিবীর ভাবনা।

'দিকবালা' কবিতায় 'দুর আকাশের পথ' থেকে নীচের পৃথিবীকে দেখার বর্ণনা রয়েছে। 'ছিন্নলতিকা' কবিতাটিতে ছিঁড়ে ফেলা একটি সুন্দর লতার অনুষঙ্গে কবির ব্যর্থতা বোধেরই প্রকাশ ঘটেছে। মনের সাধ, স্বপ্ন ছিন্নলতার প্রতীকে প্রকাশ পেয়েছে—

ছিন্ন-অবশেষটুকু এখনো জড়ানো বুকে -
এ লতা ছিঁড়িতে আছে নিরদয় বালিকা?

'ভারতী বন্দনা' কবিতাটি দেশবন্দনা অথবা পৃথিবীবন্দনারই কবিতা। 'ফুলের ধ্যান' কবিতায় ঊষার অপেক্ষায় ধ্যান ক'রে রাত্রি অতিবাহিত করার কথা প্রকাশ পেয়েছে—

দেখিতেছি শুধু ঊষার স্বপন,
তরুণ রবির তরুণ কিরণ,
তরুণ রবির অরুণ চরণ

জাগিছে হৃদয়-'পরি!

তাহাই স্মরিয়া ধেয়ান করিয়া

কাটাইব বিভাবরী

'প্রভাতী', 'লাজময়ী', 'প্রেম মরীচিকা', 'গোলাপবালা'- এই কবিতাগুলিতে বিষয়বস্তু প্রেম। এখানে মান-অভিমান আছে, প্রেমকে মরীচিকা মনে হওয়ার কথা আছে, প্রেয়সীকে জাগানোর বাসনা আছে এবং নবজীবনের গান শোনাবার আকাঙ্ক্ষাও আছে—

তবে তুমি গো সজনি জাগিবেনা কি,
আমি যে তোমারি কবি।
শুন আমার কবিতা তবে,
আমি গাহিব নীরব রবে
ভবে নবজীবনের গান। (প্রভাতী)

এই গেয়ে ওঠা নবজীবনের গানের সঙ্গে প্রকৃতিও মিশে যাবে, কবির গান এবং প্রকৃতির গান মিলেমিশে সৃষ্টি হবে এক ঐকতান।

প্রভাত জলদ, প্রভাত সমীর,
প্রভাত বিহগ, প্রভাত শিশির
সমস্বরে তারা সকলে মিলি
মিশাবে মধুর তান! (প্রভাতী)

প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে ঐকতান সৃষ্টির পালা অথবা আকাঙ্ক্ষার স্পষ্ট প্রকাশ হয়েছে পরে, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'। এখানে কি তার ঈষৎ আভাস মেলে? মিলবার আকাঙ্ক্ষার আভাস যেন ধরা দিতে চায়। 'জগৎ প্লাবিয়া' গান গেয়ে বেড়ানোর খুবই সূক্ষ্ম আভাস যেন খেলে যেতে চায় ''ভবে নবজীবনের গান'' গাওয়ার মধ্যে।

'শৈশব সঙ্গীত'-এর 'পথিক' কবিতাটিতে প্রমথনাথ বিশী 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর আভাস পেয়েছেন। তাঁর মতে—

> যে সব লক্ষণের জন্য রবীন্দ্র-কাব্যের সূচনা হিসেবে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের এত প্রতিষ্ঠা তাহার সব লক্ষণই 'পথিক' কবিতাটিতে আছে। ... কবি রবীন্দ্রনাথ

> যে কবি- পথিক, শিখরের সুপ্তির মধ্যে যে তিনি সমুদ্রের আহ্বান শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়া সেই দিকে অগ্রসরশীল, দু'টি কবিতাতেই কবি-পথিকের সেই সমুদ্র-ব্যাকুলতা, পান্থজীবনের চিরচঞ্চলতা, জনতার মধ্যে থাকিয়াও নির্জনত্ব, বন্ধনকে গ্রহন করিয়াও তাহা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়া, রবীন্দ্রকাব্যের এ সমস্ত তত্ত্বই 'পথিক' কবিতাটিতে আছে। প্রভাত সংগীতের কবিতাটি যদি সত্যই রবীন্দ্র-কাব্যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়, তবে শৈশব সংগীতের কবিতাটি নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের স্বপ্ন। এই স্বপ্নভঙ্গের স্বপ্ন পরবর্তী কাব্যে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই হিসেবে এই কবিতাটিকেই ''আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা'' বলিয়া ধরিতে হইবে।[১৯]

প্রমথনাথ বিশীর এই বক্তব্যের ভিতর থেকে একটা বিষয় খুবই পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে 'পথিক' কবিতাটি যেন রবীন্দ্রকাব্যের আকর। তিনি এখানে রবীন্দ্রকাব্যের ভাবসম্পদের একটি তালিকাও দাঁড় করিয়েছেন। যেমন -

ক) সমুদ্র - ব্যাকুলতা।

খ) পান্থজীবনের চিরচঞ্চলতা।

গ) জনতার মধ্যে থেকেও নির্জনত্ব।

ঘ) বন্ধনকে গ্রহন করে বন্ধন থেকে উত্তীর্ণ হওয়া।

'দূর হতে' মহাসাগরের গান শোনার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'। পরবর্তীতে যে মহাসাগরকে তিনি 'মহামানব' বলে আখ্যা দিয়েছেন, এ প্রসঙ্গে আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। পান্থজীবনের চিরচাঞ্চল্যের কথা প্রকাশ পেয়েছে অনেক গানে এবং কবিতায়। যেমন - 'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ', 'আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী' ইত্যাদি। জনতারমধ্যে থেকেও নির্জনত্ব অথবা বন্ধনকে গ্রহন করে বন্ধন থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা পরিষ্কার ভাবে উঠে এসেছে এই কবিতায় —

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। (৩০ নম্বর কবিতা/ নৈবেদ্য)

প্রমথনাথ বিশী চিহ্নিত এই সূত্র গুলি কতটুকু উঠে এসেছে 'পথিক' কবিতায় তা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। কবিতাটি, 'প্রভাত' ও 'মধ্যাহ্ন' দুটি অংশে বিভক্ত। শুরু হয়েছে জেগে উঠবার আহ্বান দিয়ে—

উঠ, জাগ তবে - উঠ, জাগ সবে—

হের ওই হের, প্রভাত এসেছে

স্বরণ-বরণ গো!

অন্ধকারের প্রাচীর ভেদ করে সূর্য উদিত হয়েছে, চারদিক আলোয় আলোকময়। প্রভাতের আলোয় পৃথিবী হাসছে। এই দেখে —

সারা দেহে যেন অধীর পরাণ

কাঁপিছে সঘনে গো,

অধীর চরণ উঠিতে চায়

অধীর চরণ ছুটিতে চায়,

অধীর হৃদয় মম

প্রভাত বিহগ সম

নব নব গান গাহিতে গাহিতে

অরুণের পানে চাহিতে চাহিতে

উড়িবে গগনে গো!

প্রকৃতির এই আনন্দময়তার মাঝে বেরিয়ে পড়ার বাসনা জাগে। সকলে মিলে একসাথে গান গাইবার আকাঙ্ক্ষায় হৃদয়-মন উদ্বেল হয়ে ওঠে। কিন্তু কি গান গাওয়া হবে?

যাহা প্রাণ চায় তাহাই গাইব,

গাইব আমরা প্রভাতের গান,

হৃদয়ের গান, জীবনের গান-

এই প্রভাতের গান, হৃদয়ের গান, জীবনের গান গাইতে গাইতে কোথায় যাওয়া হবে? গন্তব্য কোথায়? জানা নেই সে গন্তব্য কোথায়। 'সমুখের পথ যেথা লয়ে যায়' — সেখানেই যাওয়া হবে।

কুসুম কাননে, অচল শিখরে,

নিঝর যেথায় শতধারে ঝরে,

মণিমুকতার বিরল গুহায়—

সমুখের পথ যেথা ল'য়ে যায়!

প্রভাত আলোর স্পর্শে প্রাণের এই উন্মাদনার সময়েও শক্তিহীনতার কথা, 'ভগ্ন আশা', 'ভগ্ন সুখ', 'ধূলিমাখা জীর্ণস্মৃতি'র কথা উঠে আসছে।

যদিও শকতি নাই এ দীন চরণে আর,
যদিও নাইক জ্যোতি এ পোড়া নয়নে আর,
শরীর সাধিতে নারে মন মোর যাহা চায়,
শতবার আশা করি শতবার ভেঙে যায় -...
চারিদিকে যৌবনের ভগ্ন জীর্ণ অবশেষ।
ভগ্ন আশা ভগ্ন সুখ ধূলিমাখা জীর্ণস্মৃতি।

কিন্তু এর মধ্যেও যাবার আকাঙ্ক্ষা— 'আমি যাব গো'। নতুন আশায় মেতে গান গেয়ে পথিকেরা চলেছে। সেই গান 'এ ভগ্ন প্রমোদালয়ে' প্রবেশ করে প্রতিধ্বনি তুলছে। অতীতের স্মৃতি ভিড় করে আসছে, যে স্মৃতিতে ধরা আছে 'দীপালোক', 'ফুল', 'পাখী', 'সুধামাখা কথা', 'হাঁসিমাখা আঁখি'। অতীত ছিল বর্ণময়, আনন্দে মুখরিত কিন্তু এখন সে প্রমোদালয় ভগ্ন। কঙ্কালরাশি পড়ে আছে, দীপ নিভে গেছে, ফুল শুকিয়ে গেছে, পাখী মরে গেছে। বর্তমান তাই শূন্যতায়, বেদনায় অবসিত। এর থেকে মুক্তি পাবার জন্য বার বার তাই বলতে হচ্ছে 'আমি যাব গো'। 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে অন্তর্গূঢ় বেদনার কথা। ব্যক্তিজীবনের বেদনাই বিষয় বস্তু হয়ে উঠেছে কবিতায়। এখানেও সেই বেদনাদগ্ধ রক্তময় বর্তমানের কথা এবং আনন্দ মুখরিত অতীতের কথারই প্রকাশ। এওতো সেই 'সন্ধ্যা সঙ্গীত'-এর অবরুদ্ধ জীবনের উপস্থাপন এবং সেই অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য 'আমি যাব গো' বলে ধূয়া তুলতে হচ্ছে বার বার। কিন্তু কবিতার 'প্রভাতে' অংশে 'আমি যাব গো' এই আকাঙ্ক্ষা বার বার ধ্বনিত হলেও 'মধ্যাহ্ন' অংশে একবারও উচ্চারিত হয় না এই আকাঙ্ক্ষা। কেন? এখানে এসে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে —

এ পথের বাকি কত আর!
কেন চলিলাম?

'প্রভাতে' অংশে ''জানি না আমরা কোথায় যাইব'' বললেও শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির আনন্দরাশির মাঝে নিজেকে মিলিয়ে দেবার কথাই ব্যক্ত হয়। কিন্তু 'মধ্যাহ্ন' অংশে এ প্রশ্ন উচ্চারিত হয় আক্ষেপের সুরে এবং এ প্রশ্নের সুরে তৈরী হয় এই চলার অর্থহীনতারই আবহ। ছেলে বেলাকার কথা মনে হচ্ছে, তরুণ আশায় মেতে উঠে যখন উচ্চারণ করা হয়েছিল—

সারা পথ আমাদের হবে না বিরহ,

মোরা সবে এক সাথে রব অহরহ।

কিন্তু অর্ধেক পথ না যেতেই বাল্য সখারা কে কোথায় চলে গেছে। তাই শ্রান্তপদে বাকী পথ একা ভ্রমণ করতে হয়েছে। আর সেই যাত্রা শেষ হয়েছে 'নিরাশ পুরিতে'। প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে —

ভগ্ন-আশা ভিত্তি 'পরে নব-আশা কেন
গড়িতে গেলাম হায় উন্মাদ হেন?

প্রথম অংশ যেখানে 'আমি যাব গো' ধূয়া শোনা যায় বার বার দ্বিতীয় অংশে পুরো বিপরীত ধূয়া উঠে আসে, 'কেন চলিলাম?' এ কারণেই প্রথম অংশ যেখানে আলোয় উদ্ভাসিত দ্বিতীয় অংশ সেখানে হতাশার অন্ধকারে জড়ানো। কবিতাটির শুরু অজস্র আলোকময়তার মধ্যে, শেষ আশা হীন অন্ধকারে। 'আমি যাব গো' ধ্বনি শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে যায় 'কেন চলিলাম'-এর অন্ধকারে। এই কি রবীন্দ্র কাব্যের মূল সুর? যা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতার গান শোনায়? রবীন্দ্রনাথের যাত্রা তো মহাসাগরের সঙ্গে মিলনের, অন্য অর্থে মহামানবের সঙ্গে মিলনের। কোথায় সেই মিলনের কথা। 'পথিক' কবিতাটি অন্যভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝে নেয়া যেতে পারে এর গতি প্রকৃতি। আর একটু গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান চালানো যেতে পারে এর বিষয় বস্তুর। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এই কবিতায় রয়েছে দুটি পর্যায় একটি 'প্রভাতে' অন্যটি 'মধ্যাহ্নে'। একটু ভালভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে এই দুটি পর্যায়ের মধ্যেও রয়ে গেছে আরও কিছু পর্যায়। আমরা এই পর্যায়গত ভাবে বিশ্লেষণ করে তুলে আনতে চাই কবিতার বিষয়বস্তুকে। রবীন্দ্রনাথ কি বলতে চাইছেন 'পথিক'-এ। 'পথিক'-এ রয়েছে এ কোন পথিকের পথ চলার কথা। এই চলার পথটি কেমন এবং পথের শেষে কি রয়েছে, "পথের শেষ কোথায় কি আছে শেষে?" এই চলার পথে একজন পথিককে অতিক্রম করতে হচ্ছে কিছু পর্যায়। এই পর্যায়গত বিশ্লেষণে নিশ্চয় তুলে আনা যাবে ভিতরের কথাটি।

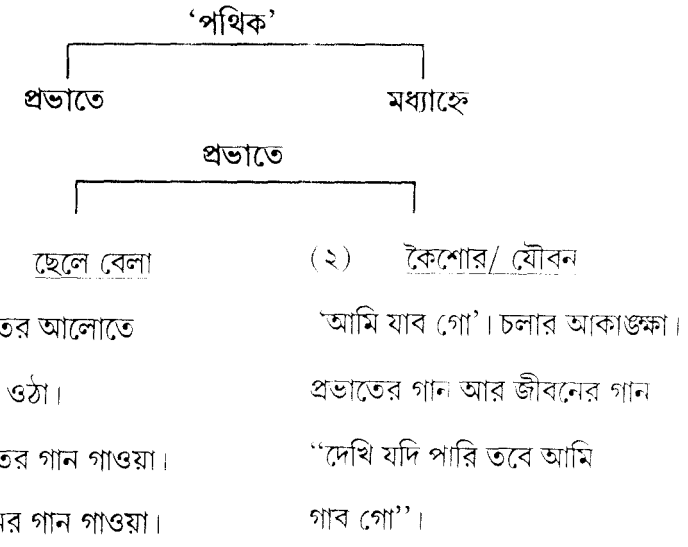

(১) যাত্রা শুরু।
গন্তব্য জানা নেই।
পথ যেখানে নিয়ে যায়।

সকলে মিলে এক সাথে
থাকার বাসনা। একসাথে
ভ্রমণ করবার বাসনা।

(২)' শক্তি নেই চরণে, চোখে জ্যোতি
নেই। মনের কামনায় শরীর
সাড়া দেয় না।
শতবার আশা করা এবং
শতবার ভেঙ্গে যাওয়া।

চারিদিকে যৌবনের ভগ্নদশা,
ভগ্ন আশা, ভগ্নসুখ, ধূলিমাখা
জীর্ণস্মৃতি।
ভগ্ন প্রমোদালয়।
অতীতের স্মৃতি জাগে—
'কত দীপালোক - কত ফুল - কত পাখী'
কত স্বপ্ন।

দীপ নিভে গেছে, ফুল
শুকিয়ে গেছে, পাখী মরে গেছে।

বীণার সব তার ছিঁড়ে গেছে, শুধু
দুটো বাকি। এখনো প্রভাতে
প্রাণ প্রফুল্ল হলে ভগ্ন বীণায়
যৌবনের গান বেজে ওঠে।

এখনো বসন্ত পাখীর গান শুনলে,
বসন্ত বাতাস প্রবাহিত হলে, দু'একটি
কিশলয় প্রস্ফুটিত হতে চায়।

তরুণ পাখী প্রভাতের বাতাসে উড়ছে।
শুষ্ক শাখায় পাখী একলা কিভাবে থাকে।

(২) সাধ যায় গান গাওয়ার কিন্তু তরুণ কণ্ঠের সঙ্গে পুরানো কণ্ঠের কি সুর বাজবে?

নীরব থেকে নতুনদের গান শোনার ইচ্ছা জাগে।

এত শ্রান্তি, এত ক্লান্তি, এত বেদনা তার পরও যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা- "আমি যাব গো।".

মধ্যাহ্ন

১. যাত্রা পথে
নিজের
সঙ্গে কথোপকথন।
প্রশ্ন দেখা দেয় -
আর কত দূর?
শ্যামল কাননের
মরীচিকা চোখে
ভাসে।
পথের শেষ কোথা?

২. অবশ শরীর।
কেন এই যাত্রা?

ছেলেবেলার স্মৃতি।
এই যাত্রায় একসাথে
থাকার প্রতিজ্ঞার কথা
স্মরণ হয়। কিন্তু
অর্ধেক পথে কে কোথায়
চলে গেল?
দীর্ঘপথ শ্রান্ত পদে
একা ভ্রমণ।

ছেলেবেলায় যে আশা
নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল
সে যাত্রা ব্যর্থ। প্রশ্ন দেখা
দিয়েছে কেন এই যাত্রা?

৩. আবার যাত্রা।
অনেকেই সঙ্গ
ত্যাগ করে
চলে গেল।

৪. যেও না
ফেলে মোরে
বলে আকুতি
কিন্তু সঙ্গীরা
সবাই চলে গেল।

৫. সকাল বেলায় আনন্দের মধ্য দিয়ে
সকলের সঙ্গে যে যাত্রা শুরু
হয়েছিল কিন্তু সন্ধ্যায় এসে
সকলেই পরিত্যাগ করে চলে গেল।

চারিদিকে অসীম মরু, নিস্তব্ধ।
জনহীন পথ, আঁধার নেমে
আসছে। দূর্বল শরীর।
প্রশ্ন দেখা দিল, 'কেন চলিলাম'?
কিসের আমদে মেতে নিজেকে
ভুলে এই যাত্রা?

যৌবন বীণার মাঝে কেন আর
থাকা। নিজেকে মনে হচ্ছে
কলঙ্ক-ধরা একটি বেসুরো
তার।

৫. অন্তরে এখন সন্ধ্যার আঁধার
আর শীতের বাতাস।

'কেন চলিলাম'?
নিজেকে কেন ভুললাম?

আর কোথাও যাব না।
এখান থেকে উঠব না।

সকালবেলা তরুণ যাত্রী দল
যখন যাবে তখন যেন মন
নেচে না ওঠে।

প্রভাতের মুখ দেখে উল্লসিত হয়ে
সায়াহ্নকে যেন কেউ
ভুলে না যায়।

এই বিশ্লেষণের সাহায্যে নিশ্চয়ই তুলে ধরা গেছে ভিতরের কথাটিকে। এই পথিকের কথা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের কথাই হয়ে ওঠে। 'জীবনস্মৃতি'র পাঠক মাত্রই আমরা জেনে গেছি সেই অব্যবস্থার কালের খবরটি, "আমার পনেরো-ষোল হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ-তেইশ বছর পর্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে, ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল।"[২০] অথবা তারও আগে বাড়ীর সকলের আশা-ভঙ্গের কথা যখন উঠে এল লেখায় অথবা যখন লেখা হল, "বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোন দিন আমার কিছু হইবে এমন আশা না আমার না আর-কাহারো মনে রহিল। কাজেই কোন কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম।"[২১] আর এই কবিতার খাতায় উঠে এল সেই ব্যক্তি জীবনের আঁধার-চিত্র। 'পথিক' কবিতা সেই ব্যর্থ জীবনের চিত্র। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

> আমার শিশুকালেই বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটা সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল।... তাহার পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবি করিতে লাগিল, তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল। তখন ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্তন শুরু হইল; চেতনা তখন আপনার ভিতরের দিকেই আবদ্ধ হইয়া রহিল।[২২]

'পথিক' কবিতাটি শুরু হয়েছে এই ছেলেবেলার আনন্দ উচ্ছ্বাসময়তা এবং প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্রতার কথা দিয়ে। যৌবনে এসে জীবন হয়ে পড়েছে অবরুদ্ধ। আশা-আকাঙ্ক্ষা হয়ে গেছে

ধূলিসাৎ। কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে আসার বাসনা ব্যক্ত হয়েছে। যাত্রা শুরু হয়েছে কিন্তু পথ পাওয়া যায় নি, ''ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্তন।'' 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' নিজের ব্যথিত হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসবার কথা আছে, মুক্তি পাবার কথা আছে। কিন্তু 'পথিক'-এ কোথাও কোন মুক্তির নিশানা নেই। এমনকি মুক্ত হওয়ার বাসনার কথাও নেই। আছে শুধু ব্যর্থতার বেদনার কথা। প্রমথনাথ বিশী এই কবিতাটিকে ''নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গের স্বপ্ন''[১২৩] বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্বপ্ন কোথায়? 'প্রভাতে'র প্রথমপর্যায়ে যে প্রভাতের গান, জীবনের গান এবং হৃদয়ের গান গাওয়ার উল্লসিত বাসনা প্রকাশ পেল সেই বাসনা দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে হয়ে পড়লো নিস্তেজ। খুবই ক্লান্ত স্বরে বলে উঠতে হ'ল ''দেখি যদি পারি তবে আমি যাব গো''। দ্বিতীয় পর্যায়ে খুব ক্লান্ত স্বরে, থেমে থেমে প্রায় বিকারের পর্যায়ে যেন 'আমি যাব গো' বলে যাবার বাসনা প্রকাশ হয়ে চললো। কিন্তু সব শেষে দুঃখ-বেদনাময় জীবনে ঋদ্ধ হয়ে বলতে হ'ল —

আবার নাচিয়া যেন উঠে নারে মন!
উল্লাসে অধীর হিয়া দুখ শ্রান্তি ভুলি গিয়া
আর উঠিস না কভু করিতে ভ্রমণ।
প্রভাতের মুখ দেখি উন্মাদ হেন
ভুলিসনে— ভুলিসনে— সায়াহ্নেরে যেন!

এই কবিতায় পান্থ জীবনের ক্ষণিক চঞ্চলতা (চির চঞ্চলতা নয়) থাকলেও 'সমুদ্র ব্যাকুলতা', 'জনতার মধ্যে থাকিয়াও নির্জনত্ব', 'বন্ধনকে গ্রহণ করিয়াও তাহা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়া'র কথা কোথায়? আর এ সবের অনুপস্থিতিতে কি ভাবে এই কবিতাটিকে আমরা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যের ভূমিকা হিসেবে ধরতে পারি? আমাদের বিচারে 'পথিক' 'শৈশব সঙ্গীত'-এর 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' এবং সর্বোপরি 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' পর্বের কবিতা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়।

'ফুলবালা' গাথা কবিতা। অশোক এবং মালতীর প্রেম-বিরহ এবং মিলনের বিষয়। পরিবেশগত বিচারে আমাদের মনে পড়ে যায় 'ভগ্নহৃদয়'-এর পরিবেশকে। দু'জায়গাতেই কাননে, ফুল বনে প্রেম বিরহের কাহিনী নির্মাণ হয়েছে। 'ফুলবালা'য় কবি কল্পনা বালাকে সঙ্গে নিয়ে ফুলের কাননে বসে অশোক এবং মালতীর প্রেম-বিরহের ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে। 'প্রতিশোধ' গাথা কবিতাটি অন্যান্য গাথা কবিতা থেকে বিষয়গত ভাবে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণই এর বিষয় বস্তু। কিন্তু প্রতিশোধ শেষ পর্যন্ত নেওয়া হয় না, জয় হয় প্রেম এবং ক্ষমাশীলতার। 'রুদ্রচন্ড' নাটকের সঙ্গে 'প্রতিশোধ'-এর এক দূরগত সাদৃশ্য রয়েছে বলে আমাদের ধারনা। 'লালী' গাথা কবিতাটির বিষয় বস্তু প্রেম। বিজয় লীলাকে

ভালবাসে কিন্তু লীলা ও রণধীর একে অন্যকে ভালবাসে। এ কারণে বিজয় রণধীরকে হত্যা করতে চায়। রণধীরের সঙ্গে বিজয়ের যুদ্ধ বাধে। লীলাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে বিজয় তাকে মিথ্যা সংবাদ দেয় যে সে নিজ হাতে রণধীরকে হত্যা করেছে। এই দুঃখে লীলা আত্মঘাতি হয়। আর বিজয় মারা যায় রণধীরের সৈণ্যদের হাতে। একা যন্ত্রণায় জ্বলতে থাকে রণধীর। 'বনফুল' গাথা কাব্যের সঙ্গে 'লীলা'র সাদৃশ্য রয়েছে বলে আমাদের ধারণা। সেখানেও বিজয়, নীরদ ও কমলার মধ্যে হৃদয়গত ত্রিভূজ সমস্যা। এখানেও বিজয়, লীলা ও রণধীরের একই সমস্যা। দুজায়গাতেই কাজ করছে ঈর্ষা। 'বনফুলে' নীরদকে হত্যা করেছে বিজয় এবং কমলা আত্মবিসর্জন দিয়েছে। সেখানে বিজয় শেষ পর্যন্ত রয়ে গেছে একা। এখানেও মৃত্যু হল দুটো, এবং একা রইল রণধীর। 'অপ্সরা প্রেম'-এ উঠে এসেছে একাকিত্বের কথা, অন্তরের বেদনা এবং না পাওয়ার কথা। কবিতায় অপ্সরা এবং নায়ক দু'জনেই কেউ কাউকে পায়নি। এই না পাওয়ার হাহাকার পুরো কবিতাটি ছেয়ে রয়েছে। 'ভগ্নতরী' গাথা কবিতাটিতে 'ভগ্নহৃদয়'-এর মতো সর্গ-বিভাগ দেখা যায়। পাঁচটি সর্গে বিভক্ত কবিতাটি। এই কবিতাটি লেখা হয়েছিল বিলেতে (১৮৭৮ সেপ্টেম্বর - ১৮৮০ ফেব্রুয়ারি)। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''সেই শিলাসনে বসিয়া মগ্নতরী নামে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম। সেই খানেই সমুদ্রের জলে সেটাকে মগ্ন করিয়া দিয়া আসিলে আজ হয়তো বসিয়া বসিয়া ভাবিতে পারিতাম যে, সে জিনিসটি বেশ ভালোই হইয়াছিল।''[২৪] এই 'মগ্নতরী' পরে ভারতীতে 'ভগ্নতরী' হয়ে ছাপা হয়। এ প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন—

> সেই শিলাসনে বসে যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন—তার নাম দিয়েছিলেন 'মগ্নতরী' - পরবর্তী আষাঢ় ১২৮৬-সংখ্যা ভারতী-তে সেটি 'ভগ্নতরী'/(গাথা) নামে পাঁচটি সর্গে বিভক্ত হয়ে মুদ্রিত হয়েছিল, পরে শৈশব সঙ্গীত (১২৯১) গ্রন্থে সংকলিত হয়।[২৫]

'ভগ্নতরী'তেও তিনটি নর-নারীর কাহিনী লেখা হয়েছে। অজিত, ললিতা ও সুরেশের হৃদয়গত উপাখ্যান 'ভগ্নতরী'। অন্যান্য গাথা গুলির মতোই এর বিষাদাত্মক পরিসমাপ্তি। বিষয় বস্তুগত দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে এই পাঁচটি গাথার মধ্যে সাধর্ম রয়েছে। বিষয় বস্তু নর-নারীর প্রেম, প্রতিটিতেই হৃদয় না পাওয়ার বেদনা এবং প্রতিটির পরিসমাপ্তি বিষাদাত্মক।

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশিত হয় ১৮৮২-এর পাঁচ জুলাই।[২৬] ১৮৮২ (বাংলা ১২৮৯) সালে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশিত হলেও এই গ্রন্থের কবিতা রচনার কাজ শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। প্রথমবার বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ১২৮৮ সালের শেষ পর্যন্ত সময়কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সন্ধ্যা সঙ্গীতের পর্ব বলে উল্লেখ করেছেন।[২৭] তাঁর মতে, ''জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ - আষাঢ় ১২৮৮ সালের মধ্যে সন্ধ্যা সঙ্গীতের

অধিকাংশ কবিতাই রচিত হয়। প্রথম সংস্করণের পঁচিশটি কবিতার [পুরাতন কবিতা 'বিষ ও সুধা' সমেত] মধ্যে বারোটি ভারতীতে মুদ্রিত হইয়াছিল।''[২৮]

'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র আলোচনার স্বার্থে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পর্বে রবীন্দ্রজীবন কিভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল তার পরিচয় নেয়া খুবই প্রাসঙ্গিক কেন না যখন রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

> অতি অল্প বয়স থেকেই স্বভাবতই আমার লেখার ধারা আমার জীবনের ধারার সঙ্গে সঙ্গেই অবিছিন্ন এগিয়ে চলেছে। চারিদিকের অবস্থা ও আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং অভিজ্ঞতার নতুন আমদানি ও বৈচিত্র্যে রচনার পরিণতি নানা বাঁক নিয়েছে ও রূপ নিয়েছে; একটা কোন ঐক্যের স্বাক্ষর তাদের সকলের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে নিশ্চয়ই পরস্পরের আত্মীয়তার প্রমাণ দিতে থাকে।[২৯]

আমরা রবীন্দ্রনাথের বাইশ-তেইশ বছর বয়সের ''একটি অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল''[৩০]-এর কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এই 'অব্যবস্থার কালে' 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কবিতা গুলি রচিত। এই সময়ের হৃদয়গত বেদনার পরিচয় মেলে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর প্রতিটি কবিতায়। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য, ''সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিতা গুলি একটু নিবিষ্ট ভাবে পড়লেই দেখা যাবে বিচিত্র মান-অভিমান বা রাগ-অনুরাগের দ্বন্দ্ব থেকে যে বিষাদ সৃষ্টি হয় তাই কবিতা গুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। তাই আগাগোড়া একটা নিরাশা ও ক্রন্দনের সুর শোনা যায়।''[৩১] এই কালে কি ছিল রবীন্দ্রনাথের দিনযাপনের গঠন প্রণালী? কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণের যন্ত্রণাময় এক নিঃসঙ্গতায় আবর্তিত তখন রবীন্দ্রনাথ। হৃদয়গত আবেগ গুলি তখন ''পরিমাণ বহির্ভূত অদ্ভুত মূর্তি ধারণ করিয়াএকটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত।''[৩২] যে উদ্দেশ্যে বিলেত গিয়েছিলেন সে উদ্দেশ্য সার্থক হয়নি। বাড়ির সকলের আশাকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এ জন্য রবীন্দ্রনাথের আত্মগ্লানিও ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

> বিলাত হইতেকিছুই-না-করিয়া কিছুই-না-হইয়া ফিরিয়া আসায় যে আত্মগ্লানি অনুভব করিতেন, তাহার সান্ত্বনাস্থল ছিল জ্যোতিদাদা ও বউঠাকুরাণী। পরমাত্মীয়দের মধ্যে পিতা কলিকাতা হইতে দূরে-দূরে থাকেন; জ্যেষ্ঠসহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথ আপনার কাব্য, দর্শন, গণিত, আলোচনায় মগ্ন; সত্যেন্দ্রনাথ দূরে বোম্বাই প্রদেশে। হেমেন্দ্রনাথ বাড়িতে থাকিলেও তাঁহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ তেমন দেখা যায় না; তাঁহার পত্নী এগারোটি ছেলেমেয়ে লইয়া নিজ

> সংসার গন্ডির মধ্যে এমনি আবিষ্ট থাকিতেন যে দেবরাদির প্রতি মনোযোগ দিবার অবসর হইত কম; তাছাড়া তাঁহারা অন্য সকলের হইতে একটু পৃথক থাকিতেই ভালোবাসিতেন। আসল কথা বাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে স্নেহ করিতে পারে এমন কেহ ছিলেন না।[৩৩]

একাকী জীবনে নিজের আবর্তে ঘুরে মরার বেদনাজাত নিঃসঙ্গতা বিশেষ করে বিলেতের বর্ণিল জীবনযাত্রা থেকে প্রত্যাগমনের ফলে এই নিঃসঙ্গতা আরও তীব্র আকার ধারণ করেছিল এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কিছু না করার ও কিছু না হয়ে ওঠার আত্মগ্লানি। 'ছেলেবেলা' এবং 'জীবনস্মৃতি'-এর পাঠক মাত্রই আমরা জানি 'ভৃত্যরাজক তন্ত্রে' বেড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকে কতটাই নিঃসঙ্গ ছিলেন। এই নিঃসঙ্গতার আদ্যোপান্ত উপস্থাপন আমরা তাঁর প্রথম পর্যায়ের প্রতিটি গ্রন্থের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি। এমন ধারণা করা নিশ্চয়ই অমূলক হবে না যে প্রথম পর্বের প্রতিটি রচনার একটি সাধারণ ধর্মের নাম নিঃসঙ্গতা। বেদনা বোধের এ আবছা আলোর চাদরে তাঁর সেই সময়কার প্রতিটি রচনাই আচ্ছাদিত। আর এই বেদনা বোধের উৎসারণ ভূমি হচ্ছে নিঃসঙ্গতা। তবে এই অন্ধকারময় এবং যন্ত্রণাময় আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসারও আলোকময় প্রবণতার আভাস রয়ে গেছে সে সময়ের রচনা গুলিতে।

'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কবিতা গুলিতে যেমন রয়েছে আত্মনিমজ্জিত দুঃখময়তার প্রকাশ তেমনি কিছু কবিতায় আবার রয়েছে আত্মনিমজ্জিত দুঃখময় জীবন থেকে বেরিয়ে আসবার আকাঙ্ক্ষা। আমরা এই দুটি স্তরে 'সন্ধ্যা সঙ্গীত'-এর কবিতা গুলিকে বিভক্ত করে এর আলোচনা করব।

যে সব কবিতায় আত্মনিমজ্জিত দুঃখময়তা প্রকাশিত সে গুলি হচ্ছেঃ ১. সন্ধ্যা, ২. তারকার আত্মহত্যা, ৩. আশার নৈরাশ্য, ৪. পরিত্যক্ত, ৫. সুখের বিলাপ, ৬. দুঃখ আবাহন, ৭. অসহ্য ভালোবাসা, ৮. আবার, ৯. পাষাণী, ১০. দুদিন, ১১. শিশির, ১২. আমি-হারা, ১৩. গান-সমাপন, ১৪. উপহার।

যে সব কবিতায় আত্মনিমজ্জিত দুঃখময় জীবন থেকে বেরিয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত সে গুলি হচ্ছেঃ ১. হৃদয়ের গীতি ধ্বনি, ২. শান্তি গীত, ৩. হলাহল, ৪. অনুগ্রহ, ৫. পরাজয়-সংগীত, ৬. সংগ্রাম-সংগীত।

'সন্ধ্যা' কবিতায় সন্ধ্যা 'একাকিনী', 'অনন্ত আকাশ তলে' 'কেশ এলাইয়া' আপন মনে যে গান গেয়ে চলেছে, যে কথা বলে চলেছে কবি সে গান বুঝতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে —

হৃদয়ের অতিদূর দূর দূরান্তরে
মিলাইয়া কণ্ঠস্বর তোর কণ্ঠস্বরে
উদাসী প্রবাসী যেন
তোর সাথে তোরি গান করে।

এই কবিতায় দুঃখময়তার প্রকাশ ঘটেছে। এখানে কবিও সন্ধ্যার মত একাকী।

'তারকার আত্মহত্যা' কবিতাটি প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করতে গিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন 'এই তারকা কে?'[৩৪] নিজেই তিনি উত্তর দিয়েছেন 'তারকা হইতেছেন কাদম্বরী দেবী'।[৩৫] কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার সঙ্গে এই কবিতা কতখানি সম্পর্কযুক্ত আমরা সে আলোচনায় না গিয়ে বলতে চাই যে এই কবিতাটির মধ্যেও রয়েছে এক অন্তর্লীন বেদনার প্রকাশ, এক দুঃখময়তার প্রকাশ। অশ্রুকুমার সিকদার এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, ''জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধারসাগরে উন্মাদের প্রায় যে তারকা 'আঁধারের তারাহীন বিজনের লাগি' ঝাপিয়ে পড়ে সে কখনো কাদম্বরী দেবী নয়, কবি সত্তারই প্রকাশ।''[৩৬] তাই কবিতার শেষে এসে যন্ত্রনাদগ্ধ তারাটির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে কবি বলছেন—

হৃদয়, হৃদয় মোর, সাধ কিরে যায় তোর
ঘুমাইতে ওই মৃত তারাটির পাশে
ওই আঁধার সাগরে
এই গভীর নিশীথে
ওই অতল আকাশে।

'আমার নৈরাশ্য' কবিতাটি শুরু হয়েছে এভাবে, ''ওরে আশা, কেন তোর হেন দীন বেশ!'' কবি আশাকেই বলছেন তুমি যে সুখ-আশ্বাস আমাকে দিতে এসেছ তা তুমি নিজেই বিশ্বাস করনা। তার চেয়ে-

বলো, আশা, বসি মোর চিতে,
''আরো দুঃখ হইবে বহিতে,
হৃদয়ের যে প্রদেশ হয়েছিল ভস্মশেষ
আর যারে হত না সহিতে,
আবার নতুন প্রাণ পেয়ে
সেও পুন থাকিবে দহিতে।''

'পরিত্যক্ত' কবিতায় দুঃখময়তা তীব্র আকার ধারণ করেছে।

চলে গেল, আর কিছু নাই কহিবার
চলে গেল, আর কিছু নাই গাহিবার।

কবিকে ফেলে সকলেই চলে গেল। কবি নিঃসঙ্গ, একাকী।

হৃদয় নিশ্বাস ছাড়ি কাঁদিয়া কহিল,
"সকলেই চলে গেল গো,
আমারেই ফেলে গেল গো"।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের রচনা গুলি যে নৈর্ব্যক্তিক নয় একথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। তাঁর জীবনের অব্যবস্থার কালের চিত্র এই সময়কার রচনাগুলির মধ্যে আমরা খুঁজে পাই। 'পরিত্যক্ত' কবিতাটি প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

> আঘাত-অভিঘাত ব্যতীত মানুষের অসাড় মন জাগে না, এবং আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের এই কাব্য রচনার মধ্যেও সেই তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁহার পত্নী হঠাৎ বেড়াইতে চলিয়া গেলে কবির মনে যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহাই কি 'পরিত্যক্ত' কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে?[৩৭]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের এ অনুমান সত্যও হতে পারে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবী চলে যাওয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথ হয়ে পড়েন পুরোপুরি ভাবে নিঃসঙ্গ। কিন্তু এই নিঃসঙ্গতা একদিক দিয়ে তাঁর কাব্য রচনায় নিয়ে আসে এক বিরাট পরিবর্তন। অবশ্য এই পরিবর্তন ভাবগত নয় কাঠামোগত। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> এক সময়ে জ্যোতিদাদারা দূরদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন; তেতালার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। সেই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জন দিনগুলি যাপন করিতাম।
>
> এই রূপে যখন আপনমনে একা ছিলাম তখন, জানিনা কেমন করিয়া, কাব্য রচনার সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যে সব কবিতা ভালোবাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার

ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে-সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি
তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনা আপনি সেই সকল কবিতার শাসন হইতে আমার
চিত্ত মুক্তিলাভ করিল।[৩৮]

এই মুক্তি লাভের ফলেই তাঁর মনে হ'ল, ''বাঁচিয়া গেলাম, যাহা লিখিতেছি এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই।''[৩৯]

'সুখের বিলাপ' কবিতায় শূন্যতার হাহাকার প্রতিধ্বনিত। কিন্তু এ হাহাকার কবির জবানীতে নয় এখানে সুখ নিজেই বিলাপে মত্ত—

হৃদয়ে একলা শুয়ে শুয়ে
সুখ শুধু এই গান গায়,
''নিতান্ত একেলা আমি যে
কেহ, কেহ, কেহ নাই হায়।''

'দুঃখ আবাহন' কবিতায় আত্ম নিমজ্জিত দুঃখ বিলাসী কবির পরিচয় মেলে। কবি আহ্বান করেছেন দু:খকে ''আয় দু:খ, আয় তুই,/ তোর তরে পেতেছি আসন''। এখানেও কবির নি:সঙ্গতার কথা শোনা যাচ্ছে , কবি বলছেন, ''নিতান্ত একেলা এ হৃদয়।'' 'অহেতু ভালোবাসা' কবিতাটির মধ্যেও অন্তরের শূন্যতার কথা উঠে এসেছে, ''প্রাণের প্রাণের মাঝে কী করিলে তোমারে গো পাই। যে ঠাঁই রয়েছে শূন্য কী করিলে সে শূন্য পুরাই!''

'আবার' নামক কবিতাতেও দু:খ বিলাসী কবি --

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস
প্রতিদিন আসে মোর পাশ।
দেখে, আমি বাতায়নে, অশ্রু ঝরে দু নয়নে
ফেলিতেছি দু:খের নিশ্বাস।

'পাষাণী', 'দু দিন', 'শিশির', 'আমি-হারা' ইত্যাদি কবিতাগুলির মধ্যেও নি:সঙ্গ কবি-হৃদয়ের বেদনার হাহাকার প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের ধারনা 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'- এর 'গান সমাপন' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সে সময়ের ব্যক্তি জীবন খুব বেশি ভাবে প্রকাশিত। কবিতাটি শুরু হয়েছে —

জনমিয়া এ সংসারে কিছুই শিখিনি আর,
শুধু গাই গান।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কবিতাগুলি রচনার সময় যে মানসিক অব্যবস্থার মধ্যে ছিলেন তার কথা। বিলেত থেকে কিছুই না হয়ে প্রত্যাবর্তন মানসিক শূন্যতা এবং দুঃখময়তাকে যেন আরও বেশি করে ঘনীভূত করে তুলেছে। সেই সময়ের বিষাদময়তার চালচিত্র 'গান-সমাপন' কবিতাটিতে যেন অনেক বেশি পরিমানে উপস্থিত। সেই সময়কে উপস্থাপন করে কবি জানাচ্ছেন যে গান গাওয়া ছাড়া কবি আর কিছুই শেখেন নি।

এমন মহান্ এ সংসারে
জ্ঞানরত্নরাশির মাঝারে,
আমি দীন শুধু গান গাই,
তোমাদের মুখপানে চাই।
ভালো যদি না লাগে সে গান
ভালো সখা, তাও গাহিব না।

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' শুধু আত্মনিমজ্জিত দুঃখময়তায় ভরা নয়, দুঃখময়তা থেকে বেরিয়ে আসারও প্রবণতা কিছু কবিতায় লক্ষ করা গেছে, সে কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকেই কি এই নিষ্ক্রমণের চেষ্টা? নিজের আবরণ ছিন্ন করে বৃহতের সঙ্গে মিলবার আকাঙ্ক্ষা অথবা মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা কি পূর্বের কোন লেখায় ধ্বনিত হয়নি? আমরা কি স্মরণ করতে পারি না 'কবি কাহিনী'র সেই আলোকময় উক্তিটিকে ''মানুষের মন চায় মানুষেরি মন''? ''আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে'' দাঁড়ানোর যে উদাত্ত আহ্বান শুনব আমরা অনেক পরে তারই তো ইঙ্গিত রয়ে গেছে ''মানুষের মন চায় মানুষেরি মন''-এর মধ্যে যা অনেক ব্যাপ্তি নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে ছড়িয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি সৃষ্টিতে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' শুধু অন্ধকারের কাব্য নয়। সেখানে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসারও প্রচেষ্টা রয়েছে। সন্ধ্যা থেকে রাত্রি অতিক্রম করে প্রভাতে মিলবার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। সদর স্ট্রীটের চরম উৎকর্ষতায় পৌঁছানোর আগে 'বনফুল' 'কবিকাহিনী' হয়ে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এ যেন তারই প্রস্তুতি চলছে।

অশ্রুকুমার সিকদার মন্তব্য করেছেন, '' 'সন্ধ্যা সঙ্গীত'-এ তীব্রতা পেয়েছে এই দ্বন্দ্ব।''[৪০] কিসের দ্বন্দ্ব? ''নেতি-ইতির দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে অনির্দিষ্টতার কুহেলিকা ভেদ করে নিজেকে আবিষ্কার''[৪১] করা। অবরুদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসার দ্বন্দ্ব।

'হৃদয়ের গীতিধ্বনি' কবিতাটি শুরু হয়েছে এভাবে, ''ও কী সুরে গান গাস হৃদয় আমার''? একই দুঃখভারাক্রান্ত গান কবির আর ভালো লাগছে না, তাই হৃদয়ের কাছে এই প্রশ্ন—

ভূমি-পানে চেয়ে চেয়ে, একই গান গেয়ে গেয়ে —
দিন যায়, রাত যায়, শীত যায়, গ্রীষ্ম যায়,
তবু গান ফুরায় না আর?

এই একই গান শোনার আকাঙ্ক্ষা আর নেই, তাই বলতে হচ্ছে "কখন থামিবি তুই, বল্ মোরে বল্ প্রাণ!" ক্লান্তিকর এই জীবন থেকে, বিষাদময় এই আবরণ থেকে এখন মুক্তি লাভই শুধু কাম্য। একারণে শেষ পর্যন্ত বলে উঠতে হয়েছে —

তবে থাম্ থাম্ ওরে প্রাণ,
পারিনে শুনিতে আর একই গান, একই গান।

'দুঃখ আবাহন' কবিতায় যেমন "আয় দুঃখ, আয় তুই/ তোর তরে পেতেছি আসন", বলে দুঃখকে আহ্বান করার আয়োজন দেখা যায় তেমনি 'শান্তিগীত' কবিতায় দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। কবিতা শুরু হয় এভাবে —

ঘুমা দুঃখ হৃদয়ের ধন,
ঘুমা তুই ঘুমারে এখন।

দুঃখময়তা এখন আর কাম্য নয় বরং সেখান থেকে মুক্তি লাভের কামনা তীব্র হয়ে উঠেছে —

তুই থাম্ দুঃখ, থাম।
তুই ঘুমা দুঃখ, ঘুমা।

'অসহ্য ভালোবাসা' কবিতায় রয়েছে 'অতি ভালোবাসা'র কথা। 'হলাহল' কবিতায় ভালোবাসার অনুভূতি পরিণত হচ্ছে হলাহলে। ভালোবাসাবাসির আত্মমগ্নতা আর ভালো লাগছে না —

এমন ক'দিন কাটে আর!
ললিত গলিত হাস, জাগরণ, দীর্ঘশ্বাস,
সোহাগ, কটাক্ষ, মান, নয়ন সলিল ধার,
মৃদু হাসি- মৃদু কথা - আদরের, উপেক্ষার -
এই শুধু, এই শুধু, দিন রাত এই শুধু —
এমন ক'দিন কাটে আর!

শুধু যেন একই আবর্তে ঘুরপাক। আর সে কারণেই ভালোবাসাকেও শেষ পর্যন্ত মনে হয় 'বিকৃত'। এই

বিকৃতির হাত থেকে তাই উদ্ধার পাওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বলতে হয় শেষ পর্যন্ত —

দূর করো, দূর করো, বিকৃত এ ভালোবাসা,
জীবন দায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয় নাশা।

এই 'হৃদয় নাশা' অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তি প্রয়োজন। অশ্রুকুমার সিকদার এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, ''আত্মনিমজ্জিত দুঃখ-বিলাস থেকে, বিচ্ছিন্নতার বেদনা থেকে আত্ম বোধের জাগরণ এই ভাবে হতে চলেছে''।[৪২] 'অনুগ্রহ' কবিতায় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে বৃহতের সঙ্গে মিলবার আকাঙ্ক্ষায় —

আকাশে উঠিতে চায় প্রাণ —
আপনারে ভুলে গিয়ে হৃদয় হইতে চাহে
একটি জগতব্যাপী গান।

'পরাজয়-সংগীত' কবিতায় অনুশোচনার সুর শোনা যাচ্ছে—

সংসারে যাহারা ছিল সকলেই জয়ী হল
তোরি শুধু হল পরাজয়—

কিন্তু এ পরাজয় তো মেনে নেয়া যায় না। তাই নিজের প্রতি নিজের জেগে উঠবার আহ্বান—

জাগ্ জাগ্ জাগ্ ওরে, গ্রসিতে এসেছে তোরে
নিদারুণ শূন্যতার ছায়া,
আকাশ-গরাসী তার কায়া।

এই 'নিদারুণ শূন্যতার ছায়া'র হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন অন্ধকার থেকে আলোতে বেরিয়ে আসার। তাই বলতে হয়—

এই বেলা প্রাণ পণ কর্।
এই বেলা ফিরে দাঁড়া তুই,
স্রোত মুখে ভাসিস নে আর।
যাহা পাস আঁকড়িয়া ধর্ —
সম্মুখে অসীম পারাবার,
সম্মুখেতে চির অমানিশি,
সম্মুখেতে মরণ বিনাশ।

গেল, গেল, বুঝি নিয়ে গেল
আবর্ত করিল বুঝি গ্রাস!

এ তো আত্মসংঘাতের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসবার প্রচেষ্টা। ভালো-মন্দের বিভাজন পরিষ্কার করে, আলো-অন্ধকারের বিভাজন পরিষ্কার করে মুক্তি-পথের অন্বেষণ করা। 'পরাজয়-সংগীত'-এর আহ্বান 'সংগ্রাম-সংগীত'-এ এসে আরও তীব্রতা পেল। এখানে সরাসরি ঘোষণা করা হ'ল ''হৃদয়ের সাথে আজি/ করিব রে করিব সংগ্রাম।'' কারণ অন্ধকার পাখা বিস্তার করছে, চোখ থেকে সবই ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। ফুল ফোঁটা, পাখীর গান, দিনের আলো সবই ঢাকা পড়ে যাচ্ছে কিছুই হচ্ছে না দেখা। চারিদিকে শুধু 'পাখার অন্ধকার'। একারণেই - ''মিছা বসে রহিব না আর''। হৃদয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাই সমস্ত কিছু ফিরিয়া নেবার আকাঙ্ক্ষা। রবিশশীতারা, সন্ধ্যা, ঊষা, 'পৃথিবীর শ্যামল যৌবন', কাননের ফুল, হারানো সংগীত, মৃতের জীবন সমস্ত কিছু ফিরিয়ে নিয়ে

জগতের ললাট হইতে
আঁধার করিব প্রক্ষালন।

এবং সবশেষে

বেঁধে দেব বিজয়ের মালা
শান্তিময় ললাটে আমার।

'পরাজয়-সংগীত' এবং 'সংগ্রাম-সংগীত'-এ প্রকাশ পেল যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তা কি বাইরের কোন অভিঘাত জনিত? আমরা তো এমন কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারি না যেখানে বাইরের অভিঘাতের কোন চিহ্ন রয়ে গেছে দ্বন্দ্ব চলছিল ভিতরেই। হৃদয়-অরণ্যের অবরুদ্ধতায় ঘুরপাক খেতে খেতে কবি নিজেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই পথ খোঁজা হয়ে পড়েছিল জরুরী। অন্ধকার গুহা সদৃশ জীবন থেকে মুক্তি লাভ শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ভালোবাসা, হৃদয়, দুঃখময়তা সবকিছু বিষময় হয়ে উঠেছে। মুক্তি লাভের জন্য হৃদয় তাই আকাশ স্পর্শ করতে চাইছে। নিজেকে নিয়ে রচিত হয়েছিল যে 'আপনারই আবরণ' তার দ্বার খুলে 'আনন্দ নিকেতন'-এর অন্বেষণ মুখ্য হয়ে দেখা দিল, আর এই বোঝাপড়া হল নিজের সঙ্গেই। ''আসলে ভিতরে ভিতরে জমছিল নেতির বিরুদ্ধে ইতিবাচক প্রতিবাদ''[১১]। শেষ পর্যন্ত তাই 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' শুধু মাত্র আর দু:খময়তায় নিমজ্জিত কাব্য হিসেবে সীমাবদ্ধতার কলঙ্কময় আবর্তে পড়ে থাকে না বরং সেখান থেকে মুক্তি লাভের আলোকময়তায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এরই ভূমিতে রোপিত হয় 'প্রভাত সঙ্গীত'-এর বীজ, সর্বোপরি সদর স্ট্রীটের অভিজ্ঞতার বীজ।

'প্রভাতসংগীত' প্রকাশিত হয় 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশের পরের বছর, অর্থাৎ১৮৮৩ সালে।[৪৪] 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর পর রচিত কবিতা গুলি স্থান পেল 'প্রভাতসংগীতে'। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি 'প্রভাতসংগীত'-এর বীজ রোপিত হয়েছিল 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'ই। বিশেষ করে 'পরাজয়-সংগীত' এবং 'সংগ্রাম-সংগীতে'। এই কবিতা দুটিতে অবরুদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে আসার প্রাণপন চেষ্টা দেখা যাচ্ছে, তার জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে এবং এই সংগ্রামের শেষে মুক্তি লাভ ঘটছে। এ কারণেই মোহিতকুমার সেন সম্পাদিত গ্রন্থে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পর্বের কবিতা গুলির নামকরণ করা হয়েছিল 'হৃদয় অরণ্য' এবং 'প্রভাতসংগীত' পর্বের কবিতা গুলি চিহ্নিত হয়েছিল 'নিষ্ক্রমণ' নামে। 'প্রভাতসংগীত' অন্ধকার থেকে আলোতে, হৃদয় অরণ্যের অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তিতে 'নিষ্ক্রমণ'-এর কাব্য, উত্তরণের কাব্য।

'প্রভাতসংগীত'-এর কবিতাগুলি আলোচনার আগে আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণে আনতে চাই। এই সময়েই ঘটে গেছে সদর স্ট্রীটের অভিজ্ঞতা। কি ছিল সে অভিজ্ঞতায়?

> সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রি-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সেই সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।[৪৫]

এই অভিজ্ঞতায় চোখের সামনে থেকে সরে গেল পর্দা এবং প্রত্যক্ষ হল:

১. আনন্দে এবং সেই সৌন্দর্যে তরঙ্গিত বিশ্বসংসার অপরূপ মহিমায় সমাচ্ছন্ন।

২. হৃদয়ের স্তরে স্তরে জমে থাকা বিষাদের আচ্ছাদন ভেদ করে সেখানে বিশ্বের আলো প্রবেশ করল।

৩. জগতের কোন কিছুই রইল না অপ্রিয়।

এই অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে উৎসারিত হল 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' এবং 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এ গাঁথা হল ভাবি কালের কাব্যের ভিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ''একটি অপূর্ব্ব অদ্ভুত হৃদয় স্ফূর্তির দিনে ''নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'' লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।''[৪৬] সদর স্ট্রীটের এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অনেক পরে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ''আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে।''[৪৭] আধ্যাত্মিক এখানে আত্মিক অর্থে। এই অভিজ্ঞতা আত্মমুক্তিরই পরিচয় বহন করে। এই আত্মিক মুক্তির ফলে দর্শন হল সত্যের।

> যেমনি সূর্যের আবির্ভাব হল গাছের অন্তরাল থেকে, অমনি মনের পর্দা খুলে গেল। মনে হল, মানুষ আজন্ম একটা আবরণ নিয়ে থাকে। সেটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হলে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু, সে দিন সূর্যদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হল, সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম। দুজন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলেছে। তাদের দেখে মনে হল, কী অনির্বচনীয় সুন্দর। মনে হলনা তারা মুটে। সেদিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখলুম, যেখানে আছে চিরকালের মানুষ।[৪৮]

সদর স্ট্রীটের এই 'আধ্যাত্মিক' অভিজ্ঞতার পূর্বে প্রায় একই ধরনের একটি অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথ লাভ করেছিলেন। তবে এই অভিজ্ঞতার স্থান এবং সময় দুটোই ছিল ভিন্ন। তখন লেখা চলছিল 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস এবং 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কবিতা গুচ্ছ। 'জীবনস্মৃতি' থেকে তুলে দেওয়া হচ্ছে সেই অভিজ্ঞতার বিবরণ—

> একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর অপরাহ্নের শেষে বেড়াইতে ছিলাম। দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সেদিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষ ভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়া ছিল। পাশের বাড়ির দেয়ালগুলা পর্যন্ত আমার কাছে সুন্দর হইয়া

> উঠিল। আমি মনে-মনে ভাবিতে লাগিলাম, পরিচিত জগতের উপর হইতে এই যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল এ কি কেবল মাত্র সায়াহ্নের আলোকসম্পাতের একটি জাদুমাত্র। কখনোই তা নয়। আমি বেশ দেখিতে পাইলাম, ইহার আসল কারণটি এই যে, সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে, আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। দিনের আলোতে আমিই যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়া ছিলাম তখন যাহা কিছুকেই দেখিতে শুনিতে ছিলাম সমস্তকে আমিই জড়িত করিয়া আবৃত করিয়াছি। এখন সেই আমি সরিয়া আসিয়াছি বলিয়াই জগৎকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। সে-স্বরূপ কখনোই তুচ্ছ নহে-তাহা আনন্দময়, সুন্দর।[৪৯]

পূর্বের অভিজ্ঞতায় স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হয়েছিল বলে, আবরণ খসে গিয়েছিল বলে সত্য ও সুন্দর দর্শন সম্ভব হয়েছিল। এখানেও লুপ্ত হল স্বাতন্ত্র্য। দিনের আলোয় আমিত্বের যে উগ্রতা ছিল, ঘনায়মান সন্ধ্যায় সেই আমিত্ব ঢাকা পড়ে গেল। এই 'আমি' অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য (individuality) সরে গেল বলেই জগৎকে দেখা গেল জগতের স্বরূপে। জগতের স্বরূপটি কী? 'তাহা আনন্দময়, সুন্দর'।

এই দুটো ঘটনায় যা অর্জন হ'ল তা হচ্ছে - জগতের সুন্দর আনন্দময় স্বরূপ, মানুষের অনির্বচনীয় সুন্দর অন্তরাত্মা এবং যে অন্তরাত্মায় রয়েছে চিরকালের মানুষ। এই উপলব্ধিজাত দর্শন থেকে আমরা তিনটি বিষয়ের রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্যাখ্যা কি তার অনুসন্ধান করতে পারি - এক. সুন্দর, দুই. চিরকালের মানুষের স্বরূপ, তিন. সত্যের স্বরূপ।

১. "সুন্দর কাকে বলি। বাইরে যা অকিঞ্চিৎকর, যখন দেখি তার আন্তরিক অর্থ তখন দেখি সুন্দরকে। একটি গোলাপ ফুল বাছুরের কাছে সুন্দর নয়। মানুষের কাছে সে সুন্দর, যে মানুষ তার কেবল পাপড়ি না, বোঁটা না, একটা সমগ্র আন্তরিক সার্থকতা পেয়েছে।"[৫০]

২. "আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জানানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব।"[৫১]

৩. "যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে, সেই জানে সত্যকে।[৫২]

এই ত্রিমাত্রিক আত্মিক মুক্তির পর্বে লেখা হল 'প্রভাত সংগীত'-এর কবিতা গুচ্ছ। গাঁথা হয়ে গেল ভাবিকালের সাহিত্যর ভিত সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। চিরকালের মানুষ আর বিশ্বপ্রকৃতি এবং এ দু'য়ের

সত্যস্বরূপ এই নিয়ে সৃজন হয়ে চললো পরবর্তী রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশাল সম্ভার। সেখানে রবীন্দ্রনাথ আর individuality-এর অহং-এ বিচ্ছিন্ন নন। অনেক পরে (১৩১১) আবারও তিনি বলেছিলেন, "আমার স্বাতন্ত্র্যগর্ব নাই—বিশ্বের সহিত আমি আমার কোন বিচ্ছেদ স্বীকার করি না।

মানব-আত্মার দম্ভ আর নাহি মোর
চেয়ে তোর স্নিগ্ধশ্যাম মাতৃমুখ-পানে;
ভালোবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর।"[৫৩]

'প্রভাত সংগীত'-এ আত্মিক মুক্তির কথা কতটা গাঢ়ত্ব লাভ করেছিল? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "প্রভাত সংগীতের ঋতুতে আপনা-আপনি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে একটা আধটা মননের রূপ, অর্থাৎ ফুল নয় সে ফসলের পালা, সেও অশিক্ষিত বিনা চাষের জমিতে।"[৫৪]

নিজের অবরুদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে আসার যে আকাঙ্ক্ষা 'সন্ধ্যা সঙ্গীত'-এর 'পরাজয়-সংগীত' এবং 'সংগ্রাম-সংগীত' কবিতায় ব্যক্ত হয়েছিল সেই আকাঙ্ক্ষারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল 'প্রভাত সংগীত'-এর প্রথম কবিতা 'আহ্বান সংগীত'-এ। এখানে নিজেকে বলা হচ্ছে, "ওরে তুই জগৎ ফুলের কীট"। যে কীট নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে —

মড়কের কণা, নিজ হাতে তুই
রচিলি নিজের কারা,
আপনার জালে জড়ায়ে পড়িয়া
আপনি হইল হারা।

নিজের জগতে নিজে অবরুদ্ধ অবস্থায় "একটি রোগের মতো পড়ে থাকা"। এ জীবন থেকে মুক্তির প্রয়োজন। তাই বলতে হচ্ছে, "আজিকে বারেক ভ্রমরের মতো/ বাহির হইয়া আয়।" এই বের হয়ে আসার আহ্বানের পিছনে রয়েছে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষা। যে প্রকৃতি বাতাস, আলো, প্রভাত-কিরণ নিয়ে পরিপূর্ণ এবং যেখানে মানুষ একে অন্যের হাতে ধরা-ধরি করে গায় গান। বিশ্বপ্রকৃতির এই আনন্দে মিলবার জন্য সবাই যখন এগিয়ে চলেছে তখন—

তুই শুধু ওরে করিস রোদন,
ফেলিস দুখের শ্বাস!
ভূমিতে পড়িয়া আঁধারে বসিয়া
আপনা লইয়া রত

আপনারে সদা কোলেতে তুলিয়া

সোহাগ করিস কত!

এই আত্মিক বদ্ধতা থেকে, নিজেকে নিয়ে নিজের গড়া ভূবন থেকে, সর্বোপরি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অহং থেকে মুক্তি প্রয়োজন। তাই কবিতা শেষ হয় এভাবে—

ওই শোন্ ওই ডাকিছে সবাই,

বাহির হইয়া আয়।

'বাহির' হয়ে আসা গেল 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এ। কোন এক সকালে অতিদূর আকাশ থেকে ভেসে এল 'প্রভাত বিহগের' গান। আর সেই গানের পথহারা একটি তান অন্ধকার আত্মার গুহায় প্রবেশ করে তছ্নছ্ করে দিল সব—

আঁধার গুহায় ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া

গভীর গুহায় নামিয়া নামিয়া

আকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া

ছুঁয়েছে আমার প্রাণ।

শুধু পথ হারা পাখির তানই নয় তার সঙ্গে প্রবেশ করেছে 'পথহারা রবিকর'। কোথাও 'আলয় না পেয়ে' রবি-কিরণ বহুদিন পর এসে প্রবেশ করলো অন্ধকার গুহায়। প্রভাত বিহগের গান এবং রবির কিরণের স্পর্শে প্রাণের আবেগ আর ধরে রাখা গেলনা এবং কি জানি কেন আজ ''জাগিয়া উঠিছে প্রাণ''। এই আত্মজাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধ হল চারিদিকে ''পাষাণে রচিত কারাগার ঘোর'', বুকের উপর আঁধার বসে নিজের ধ্যান করছে। জেগে উঠবার কথা ছিল আগেই—

না জানি কেনরে এতদিন পরে

জাগিয়া উঠিছে প্রাণ।

এই জাগরণ বুঝিয়ে দিল নিজের মধ্যে নিজের আবদ্ধতা কতখানি—

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা

আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন, ''এইটেই হচ্ছে অহং, আপনাতে আবদ্ধ, অসীম থেকে বিচ্যুত হয়ে, অন্ধ হয়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যে। তারই মধ্যে ছিলুম, এটা অনুভব করলুম।''[৫৫] এই অহং-এর

আবর্তে ঘুরে মরা অসহ্য হয়ে পড়েছিল। যন্ত্রণাদগ্ধ পরিস্থিতির হাত থেকে মুক্তির জন্য যে আকুল কামনা দেখা গিয়েছিল 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর শেষে, সেই কামনা বিদ্রোহের আকার ধারণ করলো এই কবিতায়। চারিদিকে এত বাঁধন দেখে তাই বলতে হল —

ভাঙ্ রে হৃদয় ভাঙ্ রে বাঁধন
সাধ্‌রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পর আঘাত কর।
মাতিয়া যখন উঠিছে পরান
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ!
উথলি যখন উঠিছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর!

পাষাণ কারা ভেঙে বেরিয়ে আসার ফলে শোনা গেল মহাসাগরের গান—

'পাষাণ-বাধন টুটি, ভিজায়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,
সারা প্রাণ ঢালি দিয়া,
জুড়ায়ে জগৎ-হিয়া-
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা!'

এই 'মহাসাগর' যে নিজের প্রাণের সঙ্গে মিলবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে তা কি অর্থ নিয়ে প্রকাশিত হয়ে ওঠে? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "এই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁরসঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ডাক।"[১৫] এই ব্যাখ্যা অনেক পরের, যখন রবীন্দ্রনাথ ঋদ্ধ হয়েছেন তাঁর নিজস্ব দর্শনে। জগৎ, মানুষ এবং তার সত্যাসত্যের ব্যাখ্যার কুয়াশা নেই কোথাও। কিন্তু তারপরও আমরা সেই অপরিণত বয়সের অনুভূতিকে এভাবেই ব্যাখ্যা করতে চাই যে, একটি বৃহতের সঙ্গে মিলবার আকাঙ্ক্ষা এবং মিলতে পারার আনন্দ। এই বৃহৎ তখন কবির কাছে ছিল বিশ্বজগৎ এবং বিশ্বজগতের মানুষ। নিজের সঙ্গে নিজের নয়, নিজের সঙ্গে বিশ্বজগতের মিলনাকাঙ্ক্ষা, জগতে প্রাণ ঢেলে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। যে বিশ্বের কথা প্রভাত পাখীর গান এবং রবির কিরণের মধ্য দিয়ে কবির অন্ধকার আত্মার গুহায় প্রবেশ করেছিল।

'প্রভাত সংগীত'—এর কবিতা গুচ্ছকে তিনটি স্তরে ভাগ করে নেওয়া যায়।

ক. নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ
প্রভাত উৎসব
পূনর্মিলন
প্রতিধ্বনি
স্রোত
চেয়ে থাকা
সাধ
সমাপন।

খ. অনন্ত জীবন
অনন্ত মরণ।

গ. মহাস্বপ্ন
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়।

ক-বিভাগের কবিতা গুচ্ছ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এরই সম্প্রসারিত রূপ। এই গুচ্ছেই প্রকাশিত হয়েছে 'প্রভাত সংগীত'-এর মূল সুর। খ-বিভাগের কবিতা ভিন্ন মাত্রিক হলেও সেখানে রয়েছে ক-বিভাগেরই আলোকসম্পাত। গ-বিভাগের কবিতা দুটি নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু 'প্রভাত সংগীত'-এর মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এ অর্জিত বোধ 'প্রভাত উৎসব' কবিতায় আরও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অবরুদ্ধ হৃদয়ের অর্গল খুলে গেছে, আর তাই 'জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি'। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের স্থান হয়েছে প্রাণে। এছাড়া বিশ্ব প্রকৃতিও আজ প্রাণের মাঝে আসন নিয়েছে—

এসেছে রবি শশী, এসেছে কোটি তারা,
ঘুমের শিয়রেতে জাগিয়া থাকে যারা।
পরান পুরে গেল হরষে হল ভোর
জগতে যারা আছে সবই প্রাণে মোর।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' অফুরন্ত প্রাণের কথা বলা হয়েছিল—

যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ
ফুরাবে না আর প্রাণ।

এ কবিতাতেও একই কথা ঘোষণা করা হল—

পেয়েছি যত প্রাণ যতই করি দান
কিছুতে যেন আর ফুরাতে নারি তারে।

এই অফুরন্ত প্রাণে 'জগত আসে' এবং 'জগতে যায় প্রাণ' আর 'জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে এ কি গান।' জগতের সঙ্গে এই আত্মিক বন্ধনের কথা আরও গাঢ়ত্ব লাভ করে 'কড়ি ও কোমল'-এর 'প্রাণ' কবিতায়। যেখানে ঘোষণা করা হল —

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবার ইতিহাস ধরা পড়েছে 'পুনর্মিলন' কবিতায়। ছেলেবেলায় প্রকৃতির সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিল কবির তারই বিবরণ দিয়ে শুরু হয়েছে কবিতা —

সে তখন ছেলেবেলা—রজনী প্রভাত হলে,
তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়ি ছুটিয়া যেতেম চলে;
সারি সারি নারিকেল বাগানের একপাশে,
বাতাস আকুল করে আম্রমুকুলের বাসে।

এখনও মনে পড়ে দ্বিপ্রহরে জানালার ধারে বসে থাকা। সেখান থেকে দেখা যায় গলির ধারের পুকুর এবং পুকুরের ধারের প্রাচীন বট গাছটিকে।

পুকুর গলির ধারে,
বাঁধা ঘাট একপারে—
কত লোক যায় আসে, স্নান করে, তোলে জল—

এবং তারই

পূর্বধারে বৃদ্ধ বট
মাথায় নিবিড় জট,
ফেলিয়া প্রকান্ড ছায়া দাঁড়ায়ে রহস্যময়।

ছেলেবেলায় দেখা এই দৃশ্যেরই হুবহু বিবরণ রয়েছে 'জীবনস্মৃতি'র 'ঘর ও বাহির' অংশে। এখানে যা পদ্যে বর্ণনা করা হল 'জীবনস্মৃতি'তে তাই বর্ণিত হয়েছে গদ্যে। একারণেই বলা যায় 'পুনর্মিলন'-এ পুরোপুরি ভাবে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথই প্রকাশিত হয়েছে। ছেলেবেলার এই সুখস্মৃতি বর্ণনার পরে উঠে এসেছে অবরুদ্ধ জীবনের যন্ত্রণাময় অনুভূতির অলেখ্য। যে অলেখ্য ধারণ করেছে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'। ছেলেবেলার সেই বর্ণিল দিনগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেল—

তারপরে কী যে হল - কোথা যে গেলেম্ চলে।
হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাহিকো কিনারা,
তারি মাঝে হ'নু পথ হারা।

হৃদয় অরণ্যের অবরুদ্ধতার মধ্যে প্রবেশ করে শুধুই একলা থাকা। সেখানে 'আমি শুধু একেলা পথিক'। একদিন এই হৃদয় অরণ্যের অন্ধকার থেকে, একলা থাকার যন্ত্রণাময়তা থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব হল—

আজিকে একটি পাখি পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য বাহিরে
আনন্দের সমুদ্রের তীরে।

আত্মজাগরণ এভাবেই হয়েছে যে জগৎ এবং জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। জীবন ও জগতের সঙ্গে নিজের প্রাণের মিলনের মধ্য দিয়েই সম্ভব সত্যকার মুক্তি। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সন্ন্যাসীও জীবন ও জগৎ বিবিক্ত হয়ে স্বাতন্ত্র্যের জালে জড়িয়ে মুক্তি লাভ করতে চেয়েছিল কিন্তু সম্ভব হয়নি, তাকেও ফিরতে হয়েছে জীবন ও জগতে। 'পুনর্মিলন' কবিতায় তাই শেষে গিয়ে বলতে হয়—

ছাড়িবনা তোর কোল, রব হেতা অবিরাম,
তোর কাছে শিখিবরে স্নেহ,
সবারে বাসিব ভালো—কেহনা নিরাশ হবে
মোরে ভালো বাসিবে যে কেহ।

"প্রভাত সংগীতের গান থামিয়া গেল, শুধু তার দূর প্রতিধ্বনিস্বরূপ 'প্রতিধ্বনি' নামে একটি কবিতা"[৫৮] লেখা হল দার্জিলিঙে। জগতের সমস্ত গান প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে বলেই—

অয়ি প্রতিধ্বনি,
বুঝি আমি তোরে ভালোবাসি,
বুঝি আর কারেও বাসি না।

"আসল কথা হৃদয়ের মধ্যে যে - একটা ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল সে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। যাহার জন্য ব্যাকুলতা তাহার আর কোনো নাম খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাকে বলিয়াছি প্রতিধ্বনি...।"[৫৯] এই কবিতাটি সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন—

> এই প্রতিধ্বনি কবিতাটি মহৎ ভাবের ক্ষুদ্র বীজ। সুন্দরের চেয়ে সৌন্দর্যের আকর্ষণ, সীমাকে অতিক্রম করিয়া অসীমে পৌঁছিবার আকুতি, দৃশ্য জগতের পরপারবর্তী অসীম অদৃশ্য জগতের অনুভূতি, যে-সব ভাব রবীন্দ্রকাব্যের প্রাণবস্তু সবগুলিই গুপ্তাকারে এই কবিতায় বর্তমান।[৬০]

'স্রোত' কবিতায় জগতের স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলবার কথা প্রকাশিত হয়েছে, "আমি তো শুধু ভেসে যাব, দেখিব চারিপাশে।" এর পাশাপাশি রয়েছে 'এ আমির আবরণ' ছিন্ন করার বাসনা—

> অবোধ ওরে, কেন মিছে করিস 'আমি আমি'।
> উজানে যেতে পারিবি কি সাগর পথগামী?
> জগৎ পানে যাবি নে রে, আপনা-পানে যাবি—
> সে যে রে মহা মরুভূমি, কী জানি কী যে পাবি।

এই আমিত্বের গন্ডি অতিক্রম করে মহাসাগরে মিলনাকাঙ্ক্ষা যে মহাসাগরকে তিনি মহামানব বলে চিহ্নিত করেছেন। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো রবীন্দ্রনাথের কবি ধর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যাকে বলেছেন "Hunger of unity"[৬১] অর্থাৎ ঐক্যের ক্ষুধা। এই মিলনাকাঙ্ক্ষার কথাই প্রকাশ পেল 'স্রোত' কবিতায়, "জগৎ হয়ে রব আমি, একেলা রহিব না।" অথবা—

> সবার সাথে আছি আমি, আমার সাথে নাই,
> জগৎ-স্রোতে দিবানিশি ভাসিয়া চলে যাই।

'চেয়ে থাকা' কবিতাটিও রচিত হয়েছে individuality থেকে বেরিয়ে আসার কামনায়—

> দেখিব শুধু, দেখিব শুধু
> কথাটি নাহি কব।

আর—

> জগতে যেন ডুবিয়া রব
> হইয়া রব ভোর।

'সাধ' কবিতাটিতেও বিশ্বজগতের সঙ্গে মিলবার সাধ ব্যক্ত হয়েছে—

> হৃদয় মোর আকাশ মাঝে
> তারার মতো উঠিতে চায়,

আপন সুখে ফুলের মতো
আকাশ পানে ফুটিতে চায়।

নতুন প্রাণ জেগে উঠেছে, নতুন গান বাজছে চারিদিকে, দুঃখের আঁধার রাত্রির অবসান হয়ে গেছে। 'সমাপন' কবিতায় তাই বলা হল—

আজ আমি কথা কহিব না।
আর আমি গান গাহিব না।

কেন? 'জগতে হয়েছে হারা প্রাণের বাসনা'। এখানেও আমিত্বের অহংকে বিসর্জন দেওয়া হল। প্রকাশ পেল জগতের সঙ্গে মিলবার বাসনা।

'অনন্ত জীবন' ও 'অনন্ত মরণ' কবিতা দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। 'এ জগতে কিছুই মরে না' এই একটি তত্ত্বকথা 'অনন্ত জীবন' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। 'এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে', সেই সাগরে চারিদিক থেকে জীগনের স্রোত গিয়ে মিলিত হচ্ছে। সূর্য, চন্দ্র, তারা থেকে ঝরে পড়ছে যে ধারা, জগতের সকল হাসি, গান, প্রাণ, সেই সাগরে মিশবার জন্য ছুটে চলেছে। আমরাও ছুটে চলেছি—

অবিশ্রাম চলিয়াছি ভেসে—
সাগরে পড়িব অবশেষে।

এই সমস্ত কিছুই মিলে-মিশে রচিত হচ্ছে 'অনন্ত জীবন মহাদেশ'। তাই প্রাণকে আহ্বান করা হচ্ছে—

তাই বলি প্রাণ ওরে, গান গা পাখীর মতো,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ শোক ভুলি—
তুই যাবি, গান যাবে, এক সাথে ভেসে যাবে
তুই আর তোর গান গুলি।
মিশিবি সে সিন্ধু জলে অনন্ত সাগর তলে,
এক সাথে শুয়ে রবি প্রাণ,
তুই আর তোর এই গান।

'অনন্ত মরণ'-এ বলা হচ্ছে—

এ ধরণী মরণের পথ,
এ জগৎ মৃত্যুর জগৎ।

কিন্তু এই মরণের স্বরূপ কি রকম? মরণের মধ্য দিয়েই জীবনকে স্পর্শ করা, 'মরণ বাড়িবে যত জীবন বাড়িবে তত'। এ মরণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া অর্থে নয়, জীবনকে অন্য অর্থে স্পর্শ করবার জন্য। আর তাই, ''জীবন যাহারে বলে মরণ তাহারি নাম''। 'অনন্ত জীবন' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, ''বিশ্বজগতে আসা এবং যাওয়া দুটোই থাকারই অন্তর্গত, ঢেউয়ের মত আলোতে ওঠা এবং অন্ধকারে নামা।''[৬২] তেমনি 'অনন্ত মরণ' সম্পর্কে বলেছেন, ''জীবন সব-কিছুকে রাখে আর মৃত্যু সব-কিছুকে চালায়। প্রতি মুহূর্তেই মরছি আমি, আর সেই মরার ভিতর দিয়েই আমি বাঁচার রাস্তায় এগোচ্ছি,- ।''[৬৩] এদুটি কবিতা তাই শেষ পর্যন্ত জীবনের কথা বলে এবং জীবনে মিলবার কথা বলে। আর সে কারণেই আমরা পূর্বে বলেছি এদুটি কবিতায় 'ক' গুচ্ছের কবিতার আলোকসম্পাত রয়েছে।

'মহাস্বপ্ন' এবং 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতা দুটি পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক হওয়া সত্তেও 'প্রভাত সংগীতের' মূল কবিতা গুচ্ছের সঙ্গে জীবন ও জগৎ সংলগ্নতার ক্ষেত্রে সম্পর্ক যুক্ত। 'প্রভাত সংগীতে'র মূল স্রোত যেমন জীবন ও জগৎকে ঘিরে প্রবাহিত তেমনি 'মহাস্বপ্ন' এবং 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়'-এ জীবন ও জগৎ প্রকাশিত। তাই শেষ পর্যন্ত এই দুটি কবিতাও যুক্ত হয়ে যায় মূল স্রোতেরই সঙ্গে।

'ছবি ও গান' প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে। প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, ''বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুযায়ী গ্রন্থটি প্রকাশের তারিখ 23 Feb 1884 (শনি ১২ ফাল্গুন)[৬৪] ।'' এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ''এই গ্রন্থে প্রকাশিত ছোট ছোট কবিতা গুলি গত বৎসরে লিখিত হয় - কেবল শেষ তিনটি কবিতা পূর্বেকার লেখা, এই নিমিত্ত তাহারা কিছু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।''[৬৫] এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে 'ছবি ও গান'-এর উৎসর্গ পত্র। সেখানে লেখা হয়েছে, ''গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার / বসন্তে মালা গাঁথিলাম।'' সুতরাং বিগত বছর বলতে এখানে ১৮৮৩কেই বোঝানো হয়েছে।

১৮৮৩ সালের মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ কারোয়ারে গিয়েছিলেন ।[৬৬] সেখানেই লেখা হল 'ছবি ও গান'-এর 'পূর্নিমায়' কবিতাটি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করে লিখেছেন, ''কারোয়ার বাস-কালে 'নিশীথ চেতনা' নিশীথ জগৎ' 'যোগী' কবিতা গুলি লিখিত হয় বলিয়া আমাদের মনে হয়-''[৬৭] এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি যে, কারোয়ারে আর একটি লেখার সূচনা হয়েছিল সেটি হচ্ছে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটক। ১৮৮৩ সালের জুন মাসের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ কারোয়ার থেকে কোলকাতায় ফিরে আসেন, একথা জানিয়েছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।[৬৮] প্রশান্তকুমার পাল অবশ্য এ প্রসঙ্গে রবিজীবনীতে লিখেছেন, ''বিবাহের (২৪ অগ্র) কিছুদিন পূর্বেই তিনি কারোয়ার থেকে ফিরে আসেন।[৬৯]

কারোয়ার থেকে ফিরে এসে শুরু হ'ল 'ছবি ও গান'-এর কবিতা রচনার পালা। 'জীবনস্মৃতি'র 'ছবি ও গান' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''ছবি ও গান নাম ধরিয়া আমার যে-কবিতা গুলি বাহির হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ এই সময়কার লেখা।''[৭০] এ সময় চৌরঙ্গির কাছাকাছি সার্কুলার রোডের বাগান বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ বাস করতেন। দোতলা বাড়ির কোন এক জানালার ধারে বসে তিনি লোকালয়ের দৃশ্য দেখতেন, ''তাহাদের সমস্তদিনের নানা প্রকার কাজ, বিশ্রাম, খেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগিত — সে যেন আমার কাছে বিচিত্র গল্পের মতো হইত''।[৭১] এসময় ''নানা জিনিসকে দেখিবার যে-দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল''।[৭২] এই দেখা শুধু মাত্র দেখে যাওয়া নয়, ''চোখ দিয়া মনের জিনিসকে ও মন দিয়া চোখের দেখাকে দেখিতে পাইবার ইচ্ছা''।[৭৩] দেখবার এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিই বদলে দিল কাব্য রচনার রাস্তাটিকে। শুরু হল নতুন পথ চলা। এই নতুন পথ কি বিশেষ অর্থ নিয়ে প্রকাশিত হয়ে উঠল? ক্ষুদ্রকেও বৃহৎ করে দেখা, ''নিতান্ত সামান্য জিনিসকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার একটা পালা এই ছবি ও গানে আরম্ভ হইয়াছে''।[৭৪] 'প্রভাত সংগীত'-এ শেষ হয়েছে একটি পালা, নতুন পালা শুরু হ'ল 'ছবি ও গান'-এ এসে। কিন্তু এ পালা কি একেবারেই নতুন? কোন যোগসূত্র রইল না 'প্রভাত সংগীত' পর্বের সঙ্গে? একেবারেই কি বিচ্ছিন্ন? আমরা মনে করি এখানে অন্য রকম ভাবে শুরু হলেও 'ছবি ও গান' 'প্রভাত সংগীত'-এর ধারা বেয়ে এগিয়ে গেছে। অবরুদ্ধ জীবন থেকে আত্মমুক্তির পরই সম্ভব হয়েছে সামান্য জিনিসকে বিশেষ করে দেখবার প্রবণতা। 'ছবি ও গান' যেমন 'কড়ি ও কোমল'-এর ভূমিকা রচনা করে দিয়েছে,[৭৫] তেমনি 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' 'প্রভাত সংগীত'-এর এবং 'প্রভাত সংগীত' 'ছবি ও গান'-এর ভূমিকা রচনা করেছে। অনুসন্ধানে ধরা পড়বে 'ছবি ও গান'-এর নির্মাণে কোথাও কোথাও 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ও 'প্রভাত সংগীত'-এর ছায়া পরশ রেখে যাচ্ছে। তাই রবীন্দ্রনাথ পরে প্রমথ চৌধুরীকে চিঠিতে লিখেছেন—

> তুমি ঠিকই বলেছ—'আর্তস্বর' এবং 'রাহুর প্রেম' 'ছবি ও গানে'র মধ্যে অসঙ্গত হয়েছে, এদের মধ্যে যে একটা তীব্রতা আছে অন্যান্য গানের মধুরতার সঙ্গে তার অনৈক্য হয়েছে। আরেকটা কবিতা আছে সেটা আর এক রকমে অসঙ্গত—যথা 'পোড়ো বাড়ি'।[৭৬]

'আর্তস্বর', 'রাহুর প্রেম', 'পোড়ো বাড়ি' ছাড়াও 'পূর্ণিমায়', 'নিশীথ জগৎ' এবং 'নিশীথ চেতনা' কবিতা গুলিও স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে। 'ছবি ও গানে'র কবিতা গুলিও দুটি অংশে তাই বিভাজিত। এই কবিতা গুলি সম্পর্কে মন্তব্য করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ''এগুলির মধ্যে বহির্বিষয়ী জাগতিক চিত্র অপেক্ষা অন্তরবিষয়ী সংগ্রাম চিত্র ফুটিয়াছে বেশি''।[৭৭] এই 'অন্তরবিষয়ী সংগ্রাম চিত্র'-এর পরিচয় আমরা

পেয়েছি 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কিছু কবিতায় এবং 'প্রভাত সংগীত'-এর সকল কবিতায়। 'ছবি ও গান'-এর মূল বিষয় হচ্ছে দূর থেকে দেখা বিভিন্ন বিষয়ের চিত্র অংকন। কিন্তু 'অন্তরবিষয়ী সংগ্রাম চিত্র'-এর কবিতাগুচ্ছকে বাদ দিলেও 'ছবি ও গান'-এ আরও দুটো ধারা রয়েছে, একটি ছবি ও অন্যটি গান, ''আমার অল্প বয়সের লেখা গুলিকে একদিন ছবি ও গান এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছিলাম। তখন আমার মনে ছিল আমার কবিতার সহজ প্রবৃত্তিই ঐ দুটি শাখায় নিজেকে প্রকাশ করা। বাইরে আমার চোখে ছবি পড়ে, অন্তরে আমি গান গাই''।[৭৮] এই অন্তরের গান এবং বাইরের ছবি মিলেমিশে তৈরী হয় 'ছবি ও গান'। অর্থাৎ রূপ ও রসের মিশ্রণ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, ''সাহিত্যের যে দুটি দিক আছে —রূপ ও রস, তাহা ছবি ও গান শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে''।[৭৯]

'আর্তস্বর', 'পোড়োবাড়ি', 'নিশীথ জগৎ', 'নিশীথ চেতনা'—এই কবিতা গুলি রাত্রির গভীর অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে। 'আর্তস্বর' শুরু হয়েছে এই ভাবে—

শ্রাবণে গভীর নিশি দিগ্‌বিদিক আছে মিশি
মেঘেতে মেঘেতে ঘন বাঁধা,
কোথা শশী কোথা তারা মেঘারণ্যে পথ হারা
আঁধারে আঁধারে সব আঁধা।

এই চরাচর ব্যপ্ত অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিশাচর। এই অনন্ত মহা অন্ধকারে কেউ যেন কাউকে খুঁজছে। এই খোঁজা কিসের জন্য?

তুই কি রে নিশীথিনী অন্ধকারে অনাথিনী
হারাইলি জগতেরে তোর?

জগৎকে হারিয়ে ফেলার কারণে তাই এই তুমুল আলোড়ন তুলে জগৎকে খুঁজে ফেরা।

'পোড়ো বাড়ি' কবিতার মধ্য দিয়ে নিঃসঙ্গতার কথাই প্রকাশ পেয়েছে। যে বাড়ি একদিন জনকোলাহলে ছিল পূর্ণ আজ সে জীর্ণ, নিঃসঙ্গ। তার চারিদিকে কেউ নেই, সে 'একা ভাঙ্গা বাড়ি'। সন্ধ্যেবেলা ছাদে বসে থাকা কাকের ডাক, মুখ বাড়িয়ে থাকা নিবিড় আঁধার, ভগ্ন শুষ্ক দীর্ঘ দেবদারু তরু, চন্দ্রলোকে শৃগালের চিৎকার ইত্যাদি বর্ণনা পোড় বাড়ির জীর্ণতা এবং নিঃসঙ্গতাকে বেশিভাবে ঘনিভূত করেছে। এই নিঃসঙ্গতার প্রকাশ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পর্বকে। 'নিশীথজগৎ' কবিতায় রাত্রির অন্ধকারে বসে প্রভাতের আলোর জন্য প্রতিক্ষার কথা আছে।

জন্মেছি নিশীথে আমি, তারার আলোকে
রয়েছি বসিয়া।

এই বসে থাকা আলোর জন্য, "কবে রে প্রভাত হবে, আনন্দে বিহঙ্গগুলি/ উঠিবে গাহিয়া।"

'নিশীথ চেতনা' কবিতায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'নিশীথজগৎ' কবিতার দূরতর প্রতিধ্বনি শুনেছেন।[৮০] এখানেও অন্ধকারের কথা আছে, আছে অন্ধকারে আকাশের পানে চেয়ে জেগে বসে থাকার কথা। অন্ধকারের তলে আকাশ পূর্ণ করে স্বপ্নেরা আনাগোনা করে। স্বপ্নেরা কেউ মাথায়, কেউ কোলে, কেউবা হৃদয়ে উঁকি দিয়ে যায়, কেউবা চোখের পাতার উপর বসে দোল খায়, কেউবা মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে যায়। স্বপ্ন যেন চকিতে দেখা দিয়ে পালিয়ে যায়। তাই কবিকে বলতে হয়, "অয়ি স্বপ্ন মোহময়ী, দেখা দাও একবার।" কবির আকাঙ্ক্ষা—

স্বপ্ন, তুমি এসো কাছে, মোর মুখপানে চাও,
তোমার পাখার 'পরে মোরে তুলে লয়ে যাও।
হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে ভ্রমি মোরা সারা নিশি
প্রাণে প্রাণে খেলাইয়া প্রভাতে যাইব মিশি।

আর শেষ পর্যন্ত যে কবির দিকে ফিরে তাকায় না তার প্রাণে স্বপ্ন হয়ে প্রবেশ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে। দিবসে যে প্রাণ উন্মোচন করে না, কথা শোনে না,গান বোঝে না রাতে তাই স্বপ্ন হয়ে তার অন্তরে প্রবেশ করবার বাসনা। স্বপ্ন হয়ে প্রবেশ করে মায়ামন্ত্রে তার প্রাণ খুলে দিয়ে গান বুঝিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এ সর্বগ্রাসী ভালোবাসা বিষয়ে লেখা হয়েছিল 'অসহ্য ভালোবাসা' এবং 'হলাহল' আর 'ছবি ও গান'-এ লেখা হল 'রাহুর প্রেম'। 'অসহ্য ভালোবাসা'য় প্রকাশ পেয়েছিল কবির আকুতি। ভালোবাসার ধনকে সার্বক্ষণিক ভাবে পাবার জন্য মন পাগল প্রায়, "প্রাণের প্রাণের মাঝে কী করিলে তোমারে গো পাই।" 'হলাহল'-এ এসে প্রণয় সম্পর্কে সংশয় জেগেছে "প্রণয় অমৃত একি? এযে ঘোর হলাহল—।" প্রেম যখনই হলাহলে পরিণত হয় তখনই জাগে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা। তাই বলতে হয়—

দূর করো, দূর করো বিকৃত এ ভালোবাসা,
জীবন দায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয় নাশা। (হলাহল)

এই প্রেম থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগলেও পুনরায় এই আকাঙ্ক্ষা ফিরে আসে 'রাহুর প্রেমে'। এখানে ভালোবাসার ধনকে প্রতিমুহূর্তে রাহুর মত জড়িয়ে ফেলবার কামনা দেখা দিল। আমাকে তোমার ভালো না লাগলো তাতে কি, "নাই-বা লাগিল তোর", তবু আমি "চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া।" পাবার জন্য

এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা কেন? কারণ—

অনন্ত এ ক্ষুধা অনন্ত এ তৃষা
করিতেছে হাহাকার।

আর সে কারণেই—

ও রূপের কাছে চিরদিন তাই
এ ক্ষুধা জাগিয়া রবে!

অতৃপ্ত প্রাণের আকাঙ্ক্ষার যে ধ্বনি আমরা শুনেছিলাম 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' এবং 'প্রভাত সংগীত'-এ সেই ধ্বনি 'রাহুর প্রেম' কবিতাতেও বেজে উঠেছে। ঘন্টা ধ্বনি থেমে গেলেও যেমন তার রেশ থেমে যায় না তেমনি 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' এবং 'প্রভাত সংগীতে'র রেশ রয়ে গেছে 'ছবি ও গান'-এ, বিশেষ করে এই সব কবিতায়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ কারণে মন্তব্য করেছেন, '' 'রাহুর প্রেম' কবির একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা— ইহাতে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর মনোবিকার প্রত্যাখ্যান - না - মানা প্রেমের প্রচন্ড অনুসরণ ও দুর্জয় ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগরূপে অসাধারণ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।''[৮১]

'পূর্ণিমায়' কবিতাটি লেখা হয়েছিল কারোয়ারে। এই লেখার মূলে ছিল একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন—

> সমুদ্রের মোহনার কাছে আসিয়া পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইল। সেইখানে নৌকা হইতে নামিয়া বালুতটের উপর দিয়া হাঁটিয়া বাড়ির দিকে চলিলাম। তখন নিশীথরাত্রি, সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, ঝাউবনের নিয়ত মর্মরিত চাঞ্চল্য একেবারে থামিয়া গিয়াছে, সুদূর বিস্তৃত বালুকারাশির প্রান্তে তরু শ্রেণীর ছায়াপুঞ্জ নিস্পন্দ দিক্‌চক্রবালে নীলাভ শৈলমালা পান্ডুরনীল আকাশ তলে নিমগ্ন। এই উদার শুভ্রতা এবং নিবিড় স্তব্ধতার মধ্য দিয়া আমরা কয়েকটি মানুষ কালো ছায়া ফেলিয়া নীরবে চলিতে লাগিলাম। বাড়িতে যখন পৌঁছিলাম ঘুমের চেয়েও কোন্ গভীরতার মধ্যে আমার ঘুম ডুবিয়া গেল। সেই রাত্রেই যে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম — তাহা সুদূর প্রবাসের সেই সমুদ্রতীরের একটি বিগত রজনীর সহিত বিজড়িত।[৮২]

এই সময় লেখা কবিতাটি হচ্ছে 'পূর্ণিমায়'। উদার বিশ্বপ্রকৃতির গভীরতার মধ্যে আত্মনিমগ্নতাই 'পূর্ণিমায়'

কবিতার বিষয়বস্তু।

যাই যাই ডুবে যাই—
আরো আরো ডুবে যাই,
বিহ্বল অবশ অচেতন।

চারিদিকে কিছুই নেই। গান, কথা, শব্দ, স্পর্শ, ঘুম, জাগরণ ''কোথা কিছু নাহি জাগে''। বিশ্ব কোথায় যেন ভেসে গেছে, ''তারে যেন দেখা নাহি যায়।'' আর এই নিস্তব্ধ, দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নার প্লাবনে—

মহান্ একাকী আমি
অতলেতে ডুবিরে কোথায়।

প্রকৃতির এই বিশাল উদারতার মাঝে, মহান সৌন্দর্যের মাঝে এবং নিস্তব্ধতার মাঝে নিজের একাকিত্বও মহত্ব লাভ করে।

আত্মনিমগ্ন ভাবনার এক অপরূপ প্রকাশ রয়েছে 'ছবি ও গান'-এর 'কে?' কবিতায়। বসন্ত-বাতাসের পেলব পরশ বুলিয়ে যে প্রাণের উপর দিয়ে চলে গেল এবং শুধু চলে গেল না শত শত ফুল ফুটিয়ে দিয়ে গেল তাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না শুধু তার পরশ অনুভব করা যায়। সে যেন 'অধরা-মাধুরী'। তার পরশ পেয়ে তাই আপন মনে কুসুম বনে বসে থাকতে হয়। এই সুখ অনুভূতিতে তাই—

হৃদয় আমার আকুল হল,
নয়ন আমার মুদে এল
কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে!

এই সুখ স্বপ্নের প্রকাশ 'সুখ স্বপ্ন' এবং 'জাগ্রত স্বপ্ন' কবিতা দুটিতেও রয়েছে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বিভিন্ন জিনিসের ছবি অংকনই 'ছবি ও গান'-এর মূল বিষয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রঙ দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু সে-উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ।''[৮৩] এই কথা ও ছন্দ দিয়ে আঁকা হল ছবি। যেমন—

১. ঝিকিমিকি বেলা;
গাছের ছায়া কাঁপে জলে,
সোনার কিরণ করে খেলা।...

শুধু নদীটি বহে যায় বনের ছায়া দিয়ে,
বাতাস ছুঁয়ে যায় লতারে শিহরিয়ে। (দোলা)

২. একটি মেয়ে একেলা
সাঁঝের বেলা,
মাঠ দিয়ে চলেছে।
চারিদিকে সোনার ধান ফলেছে। (একাকিনী)

৩. নবীন প্রভাত-কনক-কিরণে
নীরবে দাঁড়ায়ে গাছপালা-
কাঁপে মৃদু মৃদু কী যেন আরামে,
বায়ু বহে যায় সুধা-ঢালা। (গ্রামে)

৪. একটুখানি সোনার বিন্দু, একটুখানি মুখ
একা একটি বনফুল ফোটে-ফোটে হয়েছে,
কচি কচি পাতার মাঝে মাথা থুয়ে রয়েছে।
চারিদিকে তার গাছের ছায়া, চার দিকে তার নিষুতি,
চারিদিকে তার ঝোপে-ঝাপে আঁধার দিয়ে ঢেকেছে—
বনের সে যে স্নেহের ধন আদরিনী মেয়ে,
তারে বুকের কাছে লুকিয়ে যেন রেখেছে। (আদরিনী)

৫. মেঘের ঘটা আকাশ ভরা,
চারিদিকে আঁধার-করা,
তড়িৎ-রেখা ঝলক মেরে যায়।
শ্যামল বনের শ্যামল শিরে
মেঘের ছায়া নেমেছে রে,
মেঘের ছায়া কুঁড়ে ঘরের 'পরে
ভাঙাচোরা পথের ধারে
ঘন বাঁশের বনের ধারে
মেঘের ছায়া ঘনিয়ে যেন ধরে। (বাদল)

প্রতিটি কবিতায় এরকম ছবি আঁকা হয়েছে। 'স্মৃতি-প্রতিমা' কবিতায় শোনা যায় 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর সুর।

হা রে হা শৈশব মায়া অতীত প্রাণের ছায়া,
এখনো কি আছিস হেথায়?

এখনো অতীত স্মৃতি মাঝে মাঝে দোলা দিয়ে যায়। মনে পড়ে পুরানো দিনের কথা।

'ছবি ও গান'-এর সূচনা অংশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, '' 'ছবি ও গান' কড়ি ও কোমলের ভূমিকা করে দিলে''।[৮৪] এই ভূমিকায় থাকলো দূর থেকে দেখা বিভিন্ন বিষয়ের ছবি। জানালাবাসী কবিকে এক সময় নেমে আসতে হ'ল জানালা ছেড়ে। কবিতা জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ালো। কবিকে বলতে হ'ল, ''আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে''।[৮৫] কিন্তু শুধু দাঁড়ানোই, ভিতরে প্রবেশ করা যায়নি। আর 'কড়ি ও কোমল', ''মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার।—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্র-জীবনের এই আত্মনিবেদন।''[৮৬]

বিশ্বজীবনের সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা অথবা সীমার সঙ্গে অসীমের মিলনাকাঙ্ক্ষা, এই আকাঙ্ক্ষাবোধই রবীন্দ্র সাহিত্যেকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই এগিয়ে যাবার ক্রমিক উত্তরণ রবীন্দ্র কাব্যের প্রথম অধ্যায়ে আমরা লক্ষ করেছি। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'ছবি ও গান' হয়ে 'কড়ি ও কোমল' এই উত্তরণেরই চিহ্ন রেখে যায়। তবে পূর্ণ উত্তরণ সম্ভব হয় 'মানসী'তে এসে। বুদ্ধদেব বসু 'মানসী' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, ''কলা কৌশলে এবং ভাব বস্তুতেও, 'মানসী'কে রবীন্দ্রকাব্যের অণুবিশ্ব বলা যায়''।[৮৭] বুদ্ধদেব বসু আবিষ্কার করেছেন এই অণুবিশ্বে রয়েছে—

> এক তীব্র, সমগ্র দেশকাল ব্যাপী প্রেম, যার লক্ষ্য কখনো মানবী, কখনো এক অনির্ণীত ও অনির্ণেয় বিশ্বসত্তা, আর কখনো বা মানবীর মধ্যেই অনন্তের অনুভূতি, ('নিষ্ফল কামনা', 'ধ্যান', 'পূর্বকালে', 'অনন্ত প্রেম'); ঋতু রোমাঞ্চ ('একাল ও সেকাল', 'বর্ষার দিনে'); ব্যাপ্ত, বৃহৎ, তৃপ্তিহীন সেই 'বিশ্ববিষাদ', যা রোমান্টিকতার কুললক্ষণ ('নিষ্ফল কামনা', 'আকাঙ্ক্ষা', 'প্রকাশ বেদনা'); সেই ব্যর্থতা বোধের বেদনা মাধুরী, যার তীব্রতর প্রকাশ 'কল্পনা'র 'স্বপ্ন',

'খেয়া'র 'অনাবশ্যক' ('নিষ্ফল কামনা', 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি', 'মরণ স্বপ্ন'); নিজের অব্যবহিত পরিবেশের, অর্থাৎ স্বদেশের, নীতি ও আদর্শগত ক্ষুদ্রতায় যন্ত্রণা বোধ, এবং সেই সঙ্গে এক নিগূঢ় ও মেধাবী বিশ্বচেতনা ('দুরন্ত আশা', 'দেশের উন্নতি'); এই সব মূল সূত্র, যা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অফুরন্তভাবে ফিরে ফিরে এসেছে—এদের প্রথম সার্থক উচ্চারণ 'মানসী'তেই।[৮৮]

দুই

রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্যায়ে ('সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'ছবি ও গান') ভাব বস্তুর একটি ক্রমিক উত্তরণ লক্ষ করা যায়। উত্তরণ ঘটে অবরুদ্ধ জীবন থেকে বৃহত্তর জীবন ও জগৎ-এ মুক্তি লাভের মধ্যে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অহং থেকে বিশ্ব জগতে মিলনের মধ্যে এই মুক্তি নিহিত। আমরা ছয়টি স্তরে এই ক্রমিক উত্তরণের চিত্র প্রত্যক্ষ করতে পারি।

১. দুঃখময়তা।

২. নিঃসঙ্গতা।

৩. অবরুদ্ধ জীবনের যন্ত্রণা।

৪. অবরুদ্ধ জীবনের যন্ত্রণাময়তা থেকে পরিত্রাণ পাবার আকাঙ্ক্ষা।

৫. অবরুদ্ধ জীবন থেকে নিষ্ক্রমণ।

৬. অন্তরে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হতে পারার আনন্দ।

এই ধারাবাহিকতার চিত্র ক্রমিক উত্তরণেরই প্রকাশ ঘটায়। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের দুঃখময়তা, নিঃসঙ্গতা, অবরুদ্ধতার যন্ত্রণা, নিষ্ক্রমণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সর্বোপরি নিষ্ক্রান্ত হতে পারার বা মহাসাগরের সঙ্গে মিলিত হবার আনন্দ এই সবই তাঁর কাব্যে গাঁথা হয়ে গেছে পারস্পারিক সম্পর্কের জালে। বিষয়বস্তুর এই ক্রমপরিণতির সূত্র আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মহৎ পরিণামের পিছনে কবির নিজের সঙ্গে যে যন্ত্রণাময় সংগ্রাম তারই কথা। রবীন্দ্রনাথের প্রথমপর্যায়ের কাব্যগুলির পর্যালোচনার পিছনে বিষয়বস্তুর এই ক্রমিক উত্তরণের বিন্যাসই আমাদের কাছে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। আমরা মিলিয়ে দেখতে চাইব প্রথমপর্যায়ের নাট্য রচনার সঙ্গে কাব্যের বিষয়বস্তুগত উত্তরণের কতটুকু সাদৃশ্য রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য কবি ও নাট্যকার দুয়ের প্রেরণাগত এবং পরিণামগত ঐক্য আছে কিনা তা অনুসন্ধান করা। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'ছবি ও গান'-এ পৌঁছাতে কবিকে যে আত্ম-দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে নিষ্ক্রমণের রাস্তা আবিষ্কার করতে হয়েছে নাট্য রচনার ক্ষেত্রে ভাববস্তুর এই ক্রমিক উত্তরণ তিনি সম্পন্ন করেছেন প্রতিটি নাটকের প্রধান চরিত্র গুলির মধ্য দিয়ে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'ছবি ও গান'-এর যে ভাঙ্গাগড়ার পর্যায় সেই ভাঙ্গাগড়ার পর্যায় প্রতিটি নাটকের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কাব্যে মুক্তি এল দীর্ঘ পথ পরিক্রমণের মধ্যে আর নাটকে সেই মুক্তির কথাই প্রকাশ পেল একটি চরিত্রের দ্বন্দ্বময়তার মধ্য দিয়ে।

'রুদ্রচন্ড' (১৮৮১) নাটকের রুদ্রচন্ড চরিত্রের ক্রমিক উত্তরণ সাধিত হয়েছে কয়েকটি ধাপে। যদিও দ্বন্দ্বময়তার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়নি এই উত্তরণ কিন্তু তবুও কিছু পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে। পর্যায়গুলো এরকম —

রাজ্য থেকে বিতাড়িত > অরণ্যে আশ্রয় (নিঃসঙ্গতা) > পৃথ্বীরাজকে হত্যার সংকল্প > যন্ত্রণাময় জীবন > পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু > মানবিকতায় উত্তরণ।

রুদ্রচন্ডের উত্তরণ সম্ভব হল তখনই যখন তার আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু হল। তখনই সে নিজের কন্যাকে ''আয় মা অমিয়া মোর, কাছে আয় বাছা'' বলে ডাকতে পারল। আমরা 'প্রভাত সংগীত' আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অহং-এর কথা বলেছি। এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অহং থেকে মুক্তি লাভই প্রকৃত মুক্তি। 'রুদ্রচন্ডে'ও এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অহং চূর্ণের আভাস আছে। নিজের চারিদিকে রুদ্রচন্ড যে আবরণ তৈরী করেছিল সেই আবরণ ভেদ করে নিজ কন্যাও পিতার অন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি। আবরণ একদিন ছিন্ন হল, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অহং হল চূর্ণ, এরই ফলশ্রুতিতে বেরিয়ে এল পিতা রুদ্রচন্ড। এই নাটকেই ধরা রইল 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'ছবি ও গান'-এর ভাববস্তুর ক্রমিক উত্তরণের ইতিহাস। যদিও এই ইতিহাস তেমন গাঢ়ত্ব নিয়ে উঠে আসেনি কিন্তু তবুও সূচনা হল এইখান থেকেই। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাববস্তুর উন্মেষ কাব্যের আগে নাটকেই শুরু হয়েছিল। সদরস্ট্রীটের অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে কাব্য ক্ষেত্রে যে আলোকময় পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল সেই আলোকময়তার প্রক্ষেপণ অনেক আগেই হয়ে গেল 'রুদ্রচন্ডে'। যাকে বলা যায় অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তেরণ, অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তিতে।

'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এ যে নিঃসঙ্গতার হাহাকার আমরা শুনতে পাই সেই নিঃসঙ্গতা এবং দুঃখময়তার কথাই প্রকাশ পেল অমিয়া চরিত্রের মধ্য দিয়ে। নিঃসঙ্গতার কথা প্রকাশ পেয়েছে তার আত্মগত সংলাপের মধ্যদিয়ে।

১. আর আমি আনমনে গাহিনা ত গান,
আর আমি তরুদেহে জড়ায়ে দিই না লতা,
আর আমি ফুল তুলে গাঁথি না ত মালা! (দ্বিতীয় দৃশ্য)

২. কে জানে মনের মধ্যে কি হয়েছে মোর,
বরষার মেঘ যদি হইতাম আমি
বর্ষিয়া সহস্রধারে অশ্রুজল রাশি
বজ্রনাদে করিতাম আকুল বিলাপ। (ঐ)

৩. আর ত পারিনা, শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবর।
সঘনে ঘুরিছে মাথা, টলিছে চরণ। (পঞ্চম দৃশ্য)

৪. ওগো পান্থ, কেহ নাই, কেহ নাই মোর।
অমিয়া আমার নাম, বড় শ্রান্ত আমি,
সারাদিন পথে পথে করেছি ভ্রমণ। (ঐ)

৫. চ'লে গেল! — সকলেই চ'লে গেল গো! (দশম দৃশ্য)

'চ'লে গেল! —সকলেই চ'লে গেল গো' অমিয়ার এই সংলাপটির সঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'- এর 'পরিত্যক্ত' কবিতাটির সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।[৮৯] অমিয়া চরিত্রটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'- এর বিষয়বস্তুকে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'- এ যেমন প্রকাশ পেয়েছে অবরুদ্ধ জীবনের কথা সেই অবরুদ্ধ জীবনেরই জীবন্ত প্রকাশ 'রুদ্রচন্ডে'র অমিয়া। কাব্যের বিষয়বস্তু প্রকাশিত হল একটি চরিত্রের কাঠামোয়। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এ যেমন রয়েছে অবরুদ্ধ জীবন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তেমনি অমিয়ার মুখ থেকেই প্রকাশ পেয়েছে অবরুদ্ধ জীবন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষার কথা—

বড় সাধ যায় এই নক্ষত্র মালিনী
স্তব্ধ যামিনীর সাথে মিশে যাই যদি!
মৃদুল সমীর এই, চাঁদের জোছনা,
নিশার ঘুমন্ত শান্তি, এর সাথে যদি
অমিয়ার এ জীবন যায় মিলাইয়া!
আঁধার ভ্রূকুটিময় এই এ কানন,
সঙ্কীর্ণহৃদয় অতি ক্ষুদ্র এ কুটীর,
ভ্রূকুটির সমুখেতে দিনরাত্রিবাস,
শাসন-শকুনি এক দিনরাত্রি যেন
মাথার উপরে আছে পাখা বিছাইয়া—
এমন ক'দিন আর কাটিবে জীবন!
থেকে থেকে প্রাণ উঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া!
পাখী যদি হইতাম, দু-দন্ডের তরে
সুনীল আকাশে গিয়া ঊষার আলোকে
একবার প্রাণভ'রে দিতেম সাঁতার। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

অমিয়ার এই অবরুদ্ধ জীবনে মুক্তির আলোকময় পরশ বুলিয়ে যায় চাঁদ কবি এসে। অমিয়ার কাছে চাঁদ কবি এই রকম—

এমন মুরতি আহা, সে যেন দেবতা-সম,
এমন কে আছে তারে ভাল যে না বাসে!
এই যে আঁধার বন তার পদার্পণ হ'লে
এও যেন হেসে ওঠে মনের হরষে! (দ্বিতীয় দৃশ্য)

কিন্তু অমিয়ার মুক্তি সম্ভব হয়নি। মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এই মৃত্যু কি এক অর্থে মুক্তিরই আভাস দিয়ে যায়? মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল 'প্রভাত সংগীত'-এর 'অনন্ত মরণ' কবিতাটি দিয়ে। 'অনন্তমরণ' কবিতাটির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "মৃত্যু তাহলে কী। একরকম করে তার উত্তর এসেছিল এই যে, জীবন সব-কিছুকে রাখে আর মৃত্যু সব কিছুকে চালায়। প্রতি মুহূর্তেই মরছি আমি, আর সেই মরার ভিতর দিয়েই আমি বাঁচার রাস্তায় এগোচ্ছি, ...।"[৯০] এই বিশ্বাসেরই হয়তো প্রতীকী আভাস অমিয়া চরিত্রটির মধ্যে দেখা দিয়েছিল।

'বাল্মীকি প্রতিভা'তেও (১৮৮১) অবরুদ্ধ জীবন থেকে মুক্তির কথা প্রকাশ পেয়েছে। বাল্মীকির "স্বাভাবিক মানবত্ব যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে।"[৯১] এখানেও বাইরে বেরিয়ে আসার কথা, মুক্তির কথা। বাল্মীকির এই মুক্তি লাভের পিছনেও রয়ে গেছে কিছু পর্যায়ের অতিক্রমণ। **অরণ্যে দস্যুবৃত্তি > বালিকার দ্বারা অন্তরে করুণার সঞ্চার > যন্ত্রণাময় নিঃসঙ্গ জীবন > আত্মজাগরণ > আবরণ** ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা।

এও যেন 'রুদ্রচন্ড'-এর মতো 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'ছবি ও গান'-এর ক্রমিক উত্তরণের কাঠামোয় বাঁধা। বাল্মীকিকেও নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হয়েছে।

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই—
কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে? (চতুর্থ দৃশ্য)

অথবা

জীবনের কিছু হল না হায়—
হল না গো, হল না হায় হায়! (পঞ্চম দৃশ্য)

এই আক্ষেপ যেন 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কবির সুর। কাব্যে গীতিকবিতার কাঠামোয় আত্ম-প্রক্ষেপণের যে ভাব প্রকাশ পেল নাটকে এসে সেই বিষয়বস্তুরই উৎসারণ হয়ে চললো নাট্য চরিত্রের ভিতর দিয়ে।

'কালমৃগয়া' (১৮৮২) নাটকে অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তির কথা নেই। কিন্তু সেখানেও রয়ে গেছে মৃত্যু এবং দুঃখময়তার কথা। বিষয়বস্তুগত এই দুঃখময়তা মিলে যায় 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পর্বের কবিতার সঙ্গে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪) ও 'ছবি ও গান' (১৮৮৪) একই সময়ে রচিত হয়। সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, '' 'ছবি ও গানে'র মতই রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যটি রচনা করেন তাঁর কারোয়ার বাসের পর্বে। ভাবের দিক থেকেও তাতে লেগেছে ছবি ও গানের স্পর্শ।''[৯২] 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ও 'ছবি ও গান'-এর সাদৃশ্য উল্লেখ করে নীহাররঞ্জন রায় একই কথা বলেছেন। তাঁর মতে, ''এই নাটকটি কথার তুলিতে আঁকা ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়; টুকরা টুকরা ছবি যেন একটি মালায় গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। 'ছবি ও গান'ও ঠিক এই কথার রেখায় টানা ছবি।''[৯৩]

এই গ্রন্থ দুটি প্রকাশের পূর্বেই ঘটে গেছে সদর স্ট্রীটের অভিজ্ঞতা এবং এই অভিজ্ঞতার অভিঘাতেই রচিত হয়েছে 'প্রভাত সংগীত'-এর কবিতাগুচ্ছ। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি সদর স্ট্রীটের আত্মজাগরণ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, তার জন্য প্রস্তুতি চলছিল আগে থেকেই। অবরুদ্ধ জীবনের যন্ত্রণার কথা এবং পাশাপাশি এই জীবন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এরই চিত্র ধরা পড়েছে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' এবং 'প্রভাত সংগীত'-এ। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''জীবনের প্রথম বয়স কেটেছে বদ্ধঘরে নিঃসঙ্গ নির্জনে। সন্ধ্যাসঙ্গীত এবং প্রভাত সংগীতের অনেকটা সেই অবরুদ্ধ আলোকের কবিতা। নিজের মনের ভাবনা নিজের মনের প্রাচীরের মধ্যে প্রতিহত হয়ে আলোড়িত''।[৯৪] 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' অবরুদ্ধ জীবন থেকে মুক্তির নাটক। 'জীবনস্মৃতি'তে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটি অনির্দেশ্যতাময়, অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল—এই প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটি একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে।[৯৫]

সন্ন্যাসী জীবন ও জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে গুহার অন্ধকারে অহং-এর সাধনা করেছে কিন্তু সেই অহং-এর আবরণ একদিন ছিন্ন করে তাকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হ'ল। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'ছবি ও গান'-এর মুক্ত জগতে পৌঁছাতে কবিকে যে পর্যায়গুলি অতিক্রম করতে হয়েছে 'রুদ্রচন্ড' এবং

'বাল্মীকি প্রতিভা'তে আমরা দেখেছি সেই পর্যায়গুলি একটি নাটকের মধ্যেই সম্পন্ন হচ্ছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'ও সেই উত্তরণের ইতিহাস ধরা পড়েছে নাট্য কাঠামোয়।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর কবি অবরুদ্ধ জীবনের অন্ধকার গুহায় আবদ্ধ ছিল। সেখানে একদিন এলো প্রভাত পাখির গান, এবং সূর্যের আলো। জগৎ ও জীবনের সঙ্গে কবির অবরুদ্ধ আত্মার মিলন হল। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সন্ন্যাসীও বিশ্বজগত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে গুহার অন্ধকারে আশ্রয় নিয়েছে। নাটকের প্রথম দৃশ্যেই সন্ন্যাসী তার আত্মপরিচয় উপস্থাপন করছে—

আঁধারে গুহার মাঝে রয়েছি একাকী,
আপনাতে বসে আছি আপনি অটল।

একাকী এই অবস্থান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অহং-এরই কথা বলে। গুহা এই অহং-এর আবরণের প্রতীক। কিন্তু এই অহং-এরও প্রাচীর একদিন ভেঙ্গে গেল। রঘুর দুহিতা অন্ধকার গুহায় একদিন আলো ফেলে সন্ন্যাসীর জীবন বিবিক্ত ধ্যান ভঙ্গ করে দিল। সন্ন্যাসীর অন্তরে দ্বন্দ্ব শুরু হল এবং এই দ্বন্দ্বের মধ্য থেকেই এলো মুক্তি। কাব্যেও রয়েছে মুক্তির কথা, অবরুদ্ধ অরণ্য থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার কথা। এই নিষ্ক্রমণের কথা কবিতায় বলা হল এভাবে—

আজিকে একটি পাখি পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য-বাহিরে
আনন্দের সমুদ্রতীরে। (পুনর্মিলন/ প্রভাত সংগীত)

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর চতুর্দশ দৃশ্যের শুরুতেই দেখা যাচ্ছে যে সন্ন্যাসী অরণ্য থেকে ছুটে বের হয়ে এসে বলছে, ''যাক, রসাতলে যাক সন্ন্যাসীর ব্রত''। এর আগের দৃশ্যেই রয়েছে যন্ত্রণাময় আত্মদ্বন্দ্বের কথা। সেই আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যদিয়েই মুক্তি এলো। চারিদিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসী বলে উঠলো ''আজি এ জগৎ হেরি কী আনন্দময়।'' 'পুনর্মিলন' কবিতাতেও লেখা হল একই কথা—

সহসা দেখিনু রবিকর
সহসা শুনিনু কতগান।
সহসা পাইনু পরিমল,
সহসা খুলিয়া গেল প্রাণ।

সন্ন্যাসী তার রচিত আবরণের অর্থহীনতা বুঝতে পেরে বলেছে—

আপনারি ক্ষুদ্র এই খদ্যোত-আলোক

কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে। (চতুর্দশ দৃশ্য)

প্রায় একই কথা শোনা যাচ্ছে কবিতাতে—

ভালোবাসা খুঁজিবারে গেছিনু অরণ্যমাঝে,

হৃদয়ে হইনু পথহারা,

বরষিনু অশ্রু বারিধারা। (পুনর্মিলন)

অবরুদ্ধ জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জগতের আনন্দময়তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। এই উদ্ভাসনের কথা লেখা হল কবিতায়, নাটকে এবং 'জীবনস্মৃতি'র পাতায়। 'প্রভাত সংগীত'-এর 'প্রভাত উৎসব' কবিতায় লেখা হল—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!

জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

ধরায় আছে যত মানুষ শতশত

আসিছে প্রানে মোর, হাসিছে গলাগলি।

আত্মজাগরণের পর সন্ন্যাসীও বলে উঠলেন—

আজি এ জগৎ হেরি কী আনন্দময়।

সবাই আমারে যেন দেখিতে আসিয়াছে।

নদী তরুলতা পাখি হাসিছে প্রভাতে।

উঠিয়াছে লোকজন প্রভাত হেরিয়া,

হাসিমুখে চলিয়াছে আপনার কাজে।

ওই ধান কাটে, ওই করিছে কর্ষণ,

ওই গাভী নিয়ে মাঠে চলেছে গাহিয়া।

ওই—যে পুজার তরে তুলিতেছে ফুল;

ওই নৌকা লয়ে যাত্রী করিতেছে পার।

কেহ বা করিছে স্নান, কেহ তুলে জল,

ছেলেরা ধুলায় বসে খেলা করিতেছে,

সখরা দাঁড়ায়ে পথে কহে কত কথা। (চতুর্দশ দৃশ্য)

সদর স্ট্রীটের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে আত্মজাগরণ ঘটল রবীন্দ্রনাথের তাঁরই কথা লেখা হল 'জীবনস্মৃতি'র পাতায়—

> আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত; সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আর এক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত সেটাকে আমি সামান্য ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না—বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারিদিকে হাসির ঝরনা ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দেখিতে পাইতাম।[১৬]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই পর্বের কাব্য ও নাট্যে একটি মেলবন্ধন রচনা হয়ে গেছে। একই বিষয় বস্তুর প্রকাশ হয়ে চলেছে পাশাপাশি। কাব্য ও নাটকে এ ই বিষয় বস্তুটি হচ্ছে আত্মঅবরুদ্ধতা থেকে মুক্তি। রূপকল্প বা ফর্ম পৃথক, কিন্তু অন্তর্নিহিত থীম্ সদৃশ।

এই পর্বে কাব্য ও নাট্যের প্রকাশ রীতিরও সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। একই ধরনের শব্দের প্রকাশ হয়ে চলেছে দু'জায়গাতেই। শব্দের প্রতীকী প্রয়োগও একই রকম। 'অরণ্য', 'গুহা', 'আঁধার' জীবনের অবরুদ্ধতা, দুঃখময়তার প্রতীক রূপে উঠে আসছে নাটকে ও কাব্যে। 'রুদ্রচন্ড', 'বাল্মীকি প্রতিভা' এবং 'কালমৃগয়া'য় নাট্য ঘটনার স্থান অরণ্য। 'রুদ্রচন্ড'-এ যদিও পর্বতগুহা এবং পথ দৃশ্য পট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তবুও অরণ্য এই নাটকের মূল দৃশ্যপট। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'ও রয়েছে একটি অরণ্যের দৃশ্য। কাব্যে 'অরণ্য' প্রতীকী আভাস নিয়ে আসছে। যেমন, ''হৃদয়ের অরণ্য-আঁধারে'' (আমি হারা, সন্ধ্যাসঙ্গীত), ''হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে'' (পুনর্মিলন, প্রভাত সংগীত), ''আজিকে একটি পাখি পথ দেখাইয়া মোরে/ আনিল এ অরণ্য বাহিরে'' (পুনর্মিলন, প্রভাত সংগীত)। কাব্যে ও নাট্যে 'আঁধার'-এর অনুষঙ্গ এসেছে বহুবার। কিছু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে—, ''আজি চারিদিকে মোর এ কী অন্ধকার ঘোর'' (আমিহারা, সন্ধ্যাসঙ্গীত), ''জগতের ললাট হইতে/ আঁধার করিব প্রক্ষালণ'' (সংগ্রাম সংগীত, সন্ধ্যাসঙ্গীত), ''আঁধার গুহায় ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া'' (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, প্রভাত সংগীত), ''জাগিয়া দেখিনু আঁধারে রয়েছি আধা'' (নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ, প্রভাত সংগীত), ''আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে'' (পুনর্মিলন,

প্রভাত সংগীত), ''যেন এই জীবনের আঁধার সমুদ্র মাঝে'' (অতীত ও ভবিষ্যৎ, শৈশব সঙ্গীত), বনের আঁধার চিন্তা দিস ভাঙ্গাইয়া'' (রুদ্রচন্ড, দ্বিতীয় দৃশ্য), আঁধার ভ্রূকুটিয়া এই এ কানন'' (রুদ্রচন্ড, দ্বিতীয় দৃশ্য), ''আঁধার চৌদিক হতে আছে গ্রাস করি'' (রুদ্রচন্ড, তৃতীয় দৃশ্য), ''ঘোর অন্ধকার মাঝে একী জ্যোতি ভায়!'' (বাল্মীকি প্রতিভা, পঞ্চম দৃশ্য), ''অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে'' (বাল্মীকি প্রতিভা, ষষ্ঠ দৃশ্য), ''দুঃখের ঘনান্ধকারে দেছিস ফেলিয়া'' (প্রকৃতির প্রতিশোধ, প্রথম দৃশ্য), ''এক মুষ্টি অন্ধকারে সৃষ্টি ঢেকে ফেলে'' (প্রকৃতির প্রতিশোধ, দ্বিতীয় দৃশ্য), ''কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে'' (প্রকৃতির প্রতিশোধ, চতুর্দশ দৃশ্য)। 'গুহা' দৃশ্যপট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 'রুদ্রচন্ড' ও 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ গুহা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেয়েছে। 'প্রভাত সংগীতে'র কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে গুহার অনুষঙ্গ। এই ব্যবহারেও যুক্ত হয়েছে প্রতীকী মাত্রা। যেমন—

১. কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান। (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ)

২. বহুদিন পরে একটি কিরণ
গুহায় দিয়েছে দেখা (ঐ)

৩. দেখিব না আর নিজেরি স্বপন
বসিয়া গুহার কোনে। (ঐ)

৪. না জানি কী গুহার মাঝারে (প্রতিধ্বনি)

কবিতায় বা নাটকে যে সব উপমা বা ইমেজ উঠে আসে তার মধ্যে রচনার প্রসঙ্গ বা থীম প্রতিবিম্বিত হয়। সবসময় যে জ্ঞাতসারে হয় তা নয় অনেক সময় রচয়িতার অজ্ঞাতেও ঘটতে পারে। ঘটতে পারে কারণ বিষয় বা প্রসঙ্গের অপ্রতিরোধ্য টানেই এই সব উপমা, উৎপ্রেক্ষা বা ইমেজের আবির্ভাব হয়। কবি জীবনের একই উৎস থেকে উঠে এসেছিল এই সব প্রসঙ্গ অথবা ভাবনা। একাকিত্ব থেকে সংযোগের দিকে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে অভিযানের ভাবনা। ভাবনা একই, কখনো তাকে রবীন্দ্রনাথ নাট্য চরিত্রের মধ্যদিয়ে পরোক্ষ ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এই পরোক্ষতাও প্রায় প্রত্যক্ষতার নামান্তর কেননা নাট্য চরিত্রগুলি আসলে স্রষ্টারই কল্পিত স্বরূপ, যেন চরিত্রের মুখোশ পড়ে স্রষ্টাই আড়াল থেকে কথা বলছেন। অন্য দিকে এই সব ভাবনা কবি সরাসরি নিজের জবানীতে বলেছেন গীতিকবিতায়। নাট্যচরিত্রের মধ্যে আছে, এলিয়টের ভাষায় কবির second voice, আর সমকালে রচিত গীতিকবিতা গুলিতে আছে কৈশোরে এবং প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথের first voice।[৯৭]

নির্দেশিকা

১. ''বাক্যের সৃষ্টির উপরে আমার সংশয় জন্মে গেছে। এত রকম চল্‌তি খেয়ালের উপর তার দর যাচাই হয়, খুঁজে পাইনে তাঁর মূল্যের আদর্শ।''—১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯।— অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। *চিঠিপত্র* - ১১, বিশ্বভারতী, প্রকাশ আষাঢ়: ১৩৮১। পৃ: ২২৪।

২. ঐ, পৃ: ২২৯।

৩. ঐ, পৃ: ২৩০।

৪. ঐ, পৃ: ২৩৩।

৫. ''নানা-খানা করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘচক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায় কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।'' — *আত্মপরিচয়*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, সংস্করণ চৈত্র ১৪০০। পৃ: ৭৩।

৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ছিন্নপত্রাবলী*। নূতন সংস্করণ চৈত্র ১৩৯৯। বিশ্বভারতী ।পৃ: ১৬২।

৭. ঐ, পৃ: ১৬৩।

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *আত্মপরিচয়*। পৃ: ৭৩।

৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কবিতা-রচনারম্ভ', *জীবনস্মৃতি*। বৈশাখ ১৪০১। বিশ্বভারতী । পৃ: ২৭ -২৮।

১০. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড। প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯০। কলকাতা। পৃ: ২০৯।

১১. ভূমিকা, *শৈশব সঙ্গীত*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অচলিত সংগ্রহ: প্রথম খন্ড। বিশ্বভারতী । মাঘ ১৩৯২।

১২. আমরা এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছি *রবীন্দ্র রচনাবলী* (বিশ্বভারতী), অচলিত সংগ্রহের (প্রথম খন্ড) গ্রন্থ পরিচয়ের 'শৈশব সঙ্গীত' অংশ থেকে।

১৩. *রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা* - প্রথম খন্ড। সম্পাদক - শ্রী বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ১৯৬৫। বিশ্বভারতী।

১৪. সেন, প্রবোধচন্দ্র, 'মালতীপুঁথি/পান্ডুলিপি পরিচয়',*ভোরের পাখী ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। সম্পাদনা গার্গী দত্ত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, জানুয়ারি ১৯৯৮। পৃ: ৬৯।

১৫. ঐ, পৃ: ৭১।

১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ৬৮।

১৭. ঐ, পৃ: ৮১।

১৮. সেন, প্রবোধচন্দ্র, 'মালতীপুঁথি/পান্ডুলিপি পরিচয়', *ভোরের পাখী ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। পৃ: ৭১।

১৯. বিশী, শ্রী প্রমথনাথ, *রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৮১। পৃ: ৩৫৯-৬০।

২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১০৮।

২১. ঐ, পৃ: ৮১।

২২. ঐ, পৃ: ১৩৫।

২৩. বিশী, শ্রী প্রমথনাথ, *রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ*। পৃ: ৩৬০।

২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ৯৯।

২৫. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড।পৃ: ৩৬।

২৬. "বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশের তারিখ 5 Jul 1882 [বুধ ২২ আষাঢ়]...।" — *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড, প্রশান্তকুমার পাল। পৃ: ১৫০।

২৭. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* — ১ম খন্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৯২। পৃ: ১১৬।

২৮. ঐ, পৃ: ১১৭।

২৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা, *রবীন্দ্ররচনাবলী*-১ম খন্ড, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬। পৃ: ।।/০।

৩০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১০৮।

৩১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সংঘমিত্রা, *রবীন্দ্র সাহিত্যের আদিপর্ব*, এস,·গুপ্ত এন্ড ব্রাদার্স, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৫ এপ্রিল ১৯৭৮। পৃ: ১৯০।

৩২. ঐ, পৃ: ১০৮।

৩৩. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* — প্রথম খন্ড। পৃ: ১২০।

৩৪. ঐ, পৃ: ১১৮।

৩৫. ঐ, পৃ: ১১৯।

৩৬. সিকদার, অশ্রুকুমার, 'খেদের গান', *রাতের তারা দিনের রবি*, সম্পাদনা - উজ্জলকুমার মজুমদার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম সংস্করণ: ১লা বৈশাখ ১৩৯৫। পৃ: ৮৮।

৩৭. ঐ, পৃ: ১২৩।

৩৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১২০।

৩৯. ঐ।

৪০. সিকদার, অশ্রুকুমার, 'খেদের গান', *রাতের তারা দিনের রবি*, সম্পাদনা - উজ্জলকুমার মজুমদার। পৃ: ৯০।

৪১. ঐ, পৃ: ৯১।

৪২. ঐ, পৃ: ৯০।

৪৩. ঐ, পৃ: ৮৯।

৪৪. "বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক তালিকা অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশের তারিখ 11 May 1883 [শুক্র ২৯ বৈশাখ]..." — *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড, প্রশান্তকুমার পাল। পৃ: ১৭৪।

৪৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১২৯-৩০।

৪৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি: প্রথম পান্ডুলিপি, *রবীন্দ্রবীক্ষা* (রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্পের ষান্মাসিক সংকলন), সংখ্যা - ১৩, বিশ্বভারতী, ৭ আগস্ট ১৯৮৫।

৪৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'মানব সত্য', *মানুষের ধর্ম*, *রবীন্দ্র রচনাবলী* - দ্বাদশ খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃ: ৬০৭।

৪৮. ঐ, পৃ: ৬০৬।

৪৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১২৯।

৫০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'মানব সত্য', *মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্র রচনাবলী* - দ্বাদশ খন্ড। পৃ: ৬০৬।

৫১. ভূমিকা, *মানুষের ধর্ম*, ঐ।

৫২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *মানুষের ধর্ম*, ঐ, পৃ: ৫৬৯।

৫৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *আত্মপরিচয়* । পৃ: ২১।

৫৪. সূচনা, প্রভাত সংগীত, *রবীন্দ্র রচনাবলী* - প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬।

৫৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'মানব সত্য', *মানুষের ধর্ম* । পৃ: ৬০৮।

৫৬. ঐ, পৃ: ৬০৯।

৫৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১৫।

৫৮. ঐ, পৃ: ১৩২।

৫৯. ঐ, পৃ: ১৩৩।

৬০. বিশী, শ্রী প্রমথনাথ, *রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ*। পৃ: ৩৪-৩৫।

৬১. 'Many people had asked me "What is the Rabindranath Tagore's religion." At the end of my lecture I said, "I see only one way of explaining to you in a few words Tagore's religion. It is by quoting St. Thomas' definition of love: The hunger of Unity. Through Joy and through sorrow you will hear in his poemys the cry of that hunger of Unity." '— San Isidro, Dec. 1925.— A letter from Victoria Ocampa to Rabindranath Tagore. — *VICTORIA OCAMPO*, A cultural Bridge between Three continents — Krishna Kripalani. Tagore Research Institute. Calcutta. Second Edition. March 1982. p. 23.

৬২. সূচনা, *প্রভাত সংগীত, রবীন্দ্র রচনাবলী* - প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬।

৬৩. ঐ।

৬৪. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড। পৃ: ১৯২।

৬৫. গ্রন্থপরিচয়, *রবীন্দ্র রচনাবলী* - প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬।

৬৬. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* — প্রথম খন্ড। পৃ: ১৭০।

৬৭. ঐ। পৃ: ১৭১ - ৭২।

৬৮. ঐ। পৃ: ১৭৬।

৬৯. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড। পৃ: ১৮৪।

৭০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১৪৩।

৭১. ঐ। পৃ: ১৪৩।

৭২. ঐ।

৭৩. ঐ।

৭৪. ঐ। পৃ: ১৪৪।

৭৫. সূচনা, *ছবি ও গান*, *রবীন্দ্র রচনাবলী* - প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬।

৭৬. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* — প্রথম খন্ড। পৃ: ১৭৭।

৭৭. ঐ। পৃ: ১৭৮ - ৭৯।

৭৮. সূচনা, *চৈতালী কাব্য*, *রবীন্দ্র রচনাবলী* - প্রথম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৭৯. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* — প্রথম খন্ড। পৃ: ১৭৯।

৮০. " 'নিশীথ চেতনা'র সুর অন্যরূপ হইলেও ইহার মধ্যেও 'নিশীথ জগতে'র দূরতর প্রতিধ্বনি শোনা যায়।" ঐ। পৃ: ১৭৫।

৮১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা*, - প্রথম খন্ড, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, সুবর্ণজয়ন্তী সংস্করণ: বৈশাখ ১৪০০। পৃ: ১৬।

৮২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১৩৯।

৮৩. ঐ। পৃ: ১৪৩।

৮৪. সূচনা, *ছবি ও গান, রবীন্দ্র রচনাবলী* - প্রথম খন্ড।

৮৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১৫৭।

৮৬. ঐ।

৮৭. বসু, বুদ্ধদেব, *সঙ্গ: নি:সঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৬৩। পৃ: ১৭৮-৭৯।

৮৮. ঐ। পৃ: ১৭৮ - ৭৯।

৮৯. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* — প্রথম খন্ড। পৃ: ১২৩।

৯০. সূচনা, *প্রভাত সংগীত, রবীন্দ্র রচনাবলী* - প্রথম খন্ড।

৯১. সূচনা, *বাল্মীকি প্রতিভা*। ঐ।

৯২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সংঘমিত্রা, *রবীন্দ্র সাহিত্যের আদিপর্ব*। পৃ: ২৩৩।

৯৩. রায়, নীহাররঞ্জন, *রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা: লি: পঞ্চম সংস্করণ ২২শে শ্রাবণ ১৩৬৯। পৃ: ৪৫।

৯৪. সূচনা, *প্রকৃতির প্রতিশোধ, রবীন্দ্র রচনাবলী* - প্রথম খন্ড।

৯৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১৪১।

৯৬. ঐ। পৃ: ১৩০।

৯৭. Eliot. T. S. 'Three voices of poetry' *On Poetry and Poets*. Faber & Faber. London. 1969.

তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাটকের প্রথম পর্যায়ে পরিণত পর্যায়ের বীজানুসন্ধান

১৮৮১ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'রুদ্রচন্ড' নাটিকা। আর এর মধ্যদিয়েই শুরু হল তাব নাটক রচনার পালা। ১৮৮১ সালের সূচনা সম্প্রসারিত হল ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত। মৃত্যুর দু'বছর আগে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য রচনার মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটলো এই দীর্ঘ পথপরিক্রমার। এই পথপরিক্রমায় নাটক নিয়ে হল নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। নাট্যকাব্য রচনার মধ্যদিয়ে শুরু হয়ে শেষ হল নৃত্যনাট্যে এসে। মাঝের সময়গুলিতে নাট্যসৃজনে বিভিন্ন পরীক্ষার মাত্রা যুক্ত হল। রচিত হল গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, গদ্যনাটক, রূপক-সাংকেতিক নাটক ইত্যাদি।

আমরা আমাদের আলোচনা সম্প্রসারিত করেছি 'বিসর্জন' নাটক পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৮১ থেকে ১৮৯০ এই দশ বছর সময়কে আমরা রবীন্দ্রনাটকের প্রথম পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেছি। রবীন্দ্রনাটকে পরিণত পর্যায়ের সূত্রপাত ১৯০৮ থেকে 'শারদোৎসব' রচনার মধ্য দিয়ে। প্রথম পর্যায় অর্থাৎ অপরিণত পর্যায়, এই অপরিণত পর্যায়ের নাটকে পরিণত পর্যায়ের নাটকের বীজানুসন্ধান এই অধ্যায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। নাটকের আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তু এই দুই দিক থেকেই বীজানুসন্ধানে আমরা মনযোগী হব। প্রথমেই থাকছে আঙ্গিকগত আলোচনা।

১৮৮১ থেকে ১৮৯০ এই দশ বছরে রচিত হল নয়টি নাটক। 'রুদ্রচন্ড' (১৮৮১), 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১), 'কাল মৃগয়া' (১৮৮২), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪), 'নলিনী' (১৮৮৪), 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮), 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯) এবং 'বিসর্জন' (১৮৯০)। এখানে লক্ষ করবার বিষয় নাট্যরচনার প্রথম পর্যায়েও রবীন্দ্রনাথ নাটকের বিভিন্ন মাধ্যম নিয়ে কাজ করেছেন। যেমন - পদ্যনাট্য, 'রুদ্রচন্ড', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' পদ্যনাট্য, যদিও শুধুমাত্র পদ্যে রচিত নয়। সংলাপ পদ্যে লিখিত না হলেও অন্তর্নিহিত গুণে একটি রচনা কাব্য হয়ে উঠতে পারে। এখানে সন্ন্যাসীর সংলাপ নির্মাণ হয়েছে পদ্যে এবং সাধারণ মানুষের সংলাপে এসেছে গদ্যভাষা। গীতিনাট্য, 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'মায়ার খেলা'। গদ্যনাটক, 'নলিনী'। এই তিনটি মাধ্যমে পরবর্তীকালে সৃজন হয়ে চলবে রবীন্দ্রনাথের

নাটক এবং জীবনের শেষ প্রান্তে গিয়ে নতুন ভাবে শুরু হবে তাঁর নৃত্যনাট্য রচনার পালা। কারণ তখন বাক্যের সৃষ্টির উপর জন্মে গেছে সংশয়।[১] তাই সংগীত এবং নৃত্যের যুগলবন্দীতে উপস্থাপিতহ'ল জীবনের গভীর সত্য।

'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য রচনার পর রবীন্দ্রনাথ শেক্সপিয়রীয় রীতিতে লিখলেন দু'টি ট্রাজিডি ধর্মী নাটক, 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯) এবং 'বিসর্জন' (১৯৯০)। এরপর দীর্ঘ সময় অর্থাৎ ১৯০৭ সাল পর্যন্ত লেখা হল না কোন নাটক। শুধুমাত্র ১৮৯৭-এ প্রহসন 'বৈকুন্ঠের খাতা' এবং ১৯০৭-এ কৌতুক নাট্যগুচ্ছ 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' লেখা হল। এর ঠিক এক বছর পরেই ১৯০৮-এ লেখা হল 'শারদোৎসব'। 'বিসর্জন' থেকে 'শারদোৎসব' পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান দাঁড়ালো আঠারো বছর। এই আঠারো বছর ব্যবধানে তৈরী হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নাট্যরীতি। ইন্দিরা দেবী যাকে বলেছেন 'শান্তিপর্বের' নাটক।[২]

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নাট্যরীতির বৈশিষ্ট্যটি কি ধরণের? এ প্রসঙ্গে Edward Thompson মন্তব্য করেছেন—

> More and more, in his later work, he has deliberately cultivated the vernacular tradition, and has been drawing ever closer to the folk-play. From this, as I hope to show in the final consideration of his dramatic work, has come a great merit, a deeply interpetative quality in his plays, so that he do give the drifting pageant of an Indian road.[৩]

প্রমথনাথ বিশীও একই ধরণের মন্তব্য করেছেন, "শেষ পর্যন্ত যে pattern বা কাঠামোয় তিনি উপনীত হইয়াছেন তা একটি মেলা ও মেলাটির নিকটবর্তী একটি পথ।"[৪] দেশীয় লোকজীবনের যে pattern-এর কথা Thompson এবং প্রমথনাথ বিশী উল্লেখ করেছেন তা রবীন্দ্রনাথ কোথা থেকে আয়ত্ত করলেন? আমাদের ধারণা এই লোকজীবনের pattern উঠে এসেছে বাংলার লোকনাট্যের কাঠামো থেকে। রবীন্দ্রনাথ একসময় বলেছিলেন, "শেক্সপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ।"[৫] কিন্তু শেষ পর্যন্ত শেক্সপীয়র রবীন্দ্রনাথের কাছে নাটকের আদর্শ হয়ে থাকেনি। কারণ "বিলেতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটি স্ফীত পদার্থ।" [৬] তিনি পরিষ্কার বলেছেন, "বিলেতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।"[৭] যাত্রাই তাঁর কাছে আদর্শ হয়ে উঠেছে। কারণ, "যাত্রার অভিনয়ে

দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া ওঠে।"[৮] দেশীয় লোকনাট্যের রীতি গ্রহণের ফলে রবীন্দ্রনাটক হয়ে উঠেছে জাতীয়। এ প্রসঙ্গে অশ্রুকুমার সিকদার লিখেছেন—

> রবীন্দ্রনাটকে আমরা জাতীয় নাট্যরীতির সব উত্তরাধিকারকেই পেয়ে গেলাম —তত্ত্বকথা,গানের দলের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা, আসরে অভিনয়-উপযোগিতা এবং ব্যঞ্জনাময়তা। পেয়ে গেলাম বিবেকের মতো ঠাকুরদাকে, উঠে এলো বাউল বৈরাগী, ভ্রাম্যমান গায়কের দল, পথিকেরা চলে এলো বাংলাদেশের পথ প্রান্তর থেকে, মঞ্চ হয়ে এলো আসবাববিরল, পটহীন এবং পথ হলো পটভূমি।[৯]

'পথ' রবীন্দ্রনাটকে এক বিশেষ মাত্রায় যুক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে শঙ্খ ঘোষ জানিয়েছেন, "বস্তুত রবীন্দ্র রচনায় পথ যে-ভাবে ব্যবহৃত, তার ভঙ্গি ত্রিমুখী। কখনো তা আসে নিছক দৃশ্যপট হিসেবে, কখনো তা বিষয়ও বটে, আবার কখনো প্রতীক : পটই হয়ে ওঠে বিষয়ের প্রতীক"।[১০]

রবীন্দ্রনাটক বিষয়ে Thompson -এর মন্তব্য, 'vernacular Tradition' ও 'pageant of an Indian road', কাঠামোগত বিষয়ে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য, 'একটি মেলা ও মেলাটির নিকটবর্তী পথ', অশ্রুকুমার সিকদারের 'জাতীয় নাট্যরীতির' কথা এবং শঙ্খ ঘোষের রবীন্দ্রনাটকে 'পথ' সম্পর্কিত যে মন্তব্য এসবই রবীন্দ্রনাটকের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য। আমরা প্রথমে এরই আলোকে আঙ্গিকগত দিক থেকে বিচার করতে চাই রবীন্দ্রনাটকের এই নিজস্ব নাট্যরীতির বীজ কতটুকু তাঁর প্রথম পর্যায়ের নাটকে বর্তমান।

'রুদ্রচন্ড' নাটকে পথের দৃশ্য আছে পাঁচটি।

১. পঞ্চম দৃশ্য — অমিয়া রাজপথে প্রাসাদ সম্মুখে।

২. অষ্টম দৃশ্য — পথ।

৩. নবম দৃশ্য — নগর অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে নগরের পথ।

৪. দশম দৃশ্য — পথ।

৫. একাদশ দৃশ্য — স্থানের উল্লেখ নেই কিন্তু তবুও ধরে নেওয়া যায় দৃশ্যটি নগর পথের।

এই পাঁচটি পথের দৃশ্য 'নিছক দৃশ্যপট হিসেবে' উঠে এসেছে। নাটকের বিষয় অথবা প্রতীক হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু পরিণত পর্যায়ের নাটকে পথ যে বৈশিষ্ট্যময়তায় উন্নীত হবে হয়তো রবীন্দ্রনাথ নিজের অজ্ঞাতসারে তারই গৌরচন্দ্রিকা করেছেন 'রুদ্রচন্ড'-এ। এ কারণে মনে করা যেতে পারে টেকনিকগত দিক থেকে 'পথ'-এর প্রয়োগের বীজ 'রুদ্রচন্ড'-এ রোপিত হয়েছে যার প্রকাশ 'নিছক দৃশ্যপট হিসেবেই'।

'বাল্মীকি প্রতিভা' এবং 'কালমৃগয়া'য় বিষয়গত কারণেই স্থান হিসেবে দেখা দিয়েছে অরণ্য। তবে এ দুটি নাটকে যে লোকপালার প্রভাব রয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের পরিণত পর্যায়ের নাটকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে আমরা 'রবীন্দ্রনাটকের অভিব্যক্তির ধারা' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি কারণেই এখানে আর সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল না।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের নাটকের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। আমরা মনে করি রবীন্দ্রনাথ এ নাটকেই তাঁর নিজস্ব নাট্যরীতির সন্ধান পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাটকের যে আঙ্গিক এবং বিষয়গত বৈশিষ্ট্য তার সব বীজই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ বর্তমান। 'পথ'-এর বৈশিষ্ট্যময়তা, 'vernacular Tradition', 'মেলার pattern' সবকিছুই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'কে বৈশিষ্ট্যময় করে তুলেছে। সর্বোপরি এখানে প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রদর্শনের ভাববস্তু।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ ১৬ টি দৃশ্যের মধ্যে পথের দৃশ্য পাঁচটি।

১. দ্বিতীয় দৃশ্য — রাজপথ।
২. তৃতীয় দৃশ্য — পথ।
৩. সপ্তম দৃশ্য — পর্বত শিখরে সন্ন্যাসী। (পর্বত পথের পাশে মূলত এও পথেরই দৃশ্য।)
৪. একাদশ দৃশ্য — পথে সন্ন্যাসী।
৫. পঞ্চদশ দৃশ্য — পথে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে সন্ন্যাসী বসে আছে রাজপথের ধারে। প্রথম দৃশ্য 'গুহা'। এই গুহা থেকে বেরিয়ে এসেই সন্ন্যাসী মুখোমুখি হয় পথের। ভাবগত দিক থেকে প্রথম দৃশ্যের একেবারেই বিপরীত দ্বিতীয় দৃশ্য। এই দুটো দৃশ্যের বিপরীতার্থক ব্যঞ্জনা আভাস দিয়ে যায় সমগ্র নাটকের বিষয়বস্তুর। শুরু থেকেই 'গুহা' ও 'পথের' দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে নাটক। দ্বিতীয়দৃশ্যে সন্ন্যাসীর সামনে দিয়ে প্রবাহিত হয় নানা শ্রেণীর মানুষের স্রোত। এই স্রোতে মিশে থাকে কৃষক, বালক, স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণ, সাধারণ পথিক, মালিনী এবং ভিক্ষুক। তাদের জীবনের হাসি কান্না, বিভিন্ন সমস্যার কথা প্রকাশিত হয় ছোট ছোট সংলাপে। পথের এই রূপকেই Thompson-এর মনে হয়েছে "pageant of an Indian road"। প্রমথনাথ বিশী এ

প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, ''লোকজীবনের এই অতি সাধারণ, অথচ মনোরম ও বিচিত্র ছবিকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার তত্ত্বনাট্যের ছাঁচ-প্যাটার্ণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।''[১১] আমরা শঙ্খ ঘোষের মন্তব্যও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি, ''এই আদিকাল থেকে শুরু করে 'শারদোৎসব', 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা' প্রায় সর্বত্রই নাট্যপথের দুমুখ থাকে খোলা, যেন জীবনের বিচিত্র অঞ্চল থেকে উঠে আসা মানুষগুলি চলাচলের মধ্যদিয়ে ক্ষণকালের জন্য এখানে মিলিত হয়ে চলে যায়।''[১২] সুতরাং রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর দ্বিতীয় দৃশ্যেই তাঁর নিজস্ব নাট্যরীতির সন্ধান পেয়েছিলেন। তৃতীয় দৃশ্য 'পথ'। এই পথে সন্ন্যাসী ও অস্পৃশ্য রঘুর দুহিতার দেখা হয়। এই পথও বিচিত্র মানুষে পূর্ণ। এই মানুষ জনের দ্বারা রঘুর দুহিতা বিতাড়িত। এ যেন 'চন্ডালিকা' (১৩৪৫) নৃত্যনাট্যের পূর্বাভাষ। চন্ডালিকাও সাধারণ মানুষ জনের দ্বারা বিতাড়িত। চন্ডালিকা নৃত্যনাট্যে যেমন চন্ডালিকাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, ''ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছি,/ ওযে চন্ডালিনীর ঝি'' (প্রথম দৃশ্য), তেমনি এখানেও রঘুর দুহিতাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, ''ছুঁসনে ছুঁসনে মোরে—/ সরে যা অশুচি।'' পথের পটভূমিতে সন্ন্যাসী ও বালিকার সাক্ষাৎ কি কোন বিশেষ ইঙ্গিত বহন করে? আমরা মিলিয়ে দেখতে চাই 'রাজা' নাটকের ঊনিশতম দৃশ্যটি। রাণী সুদর্শনা পথে বেরিয়ে এসেই সাক্ষাৎ পেল রাজার, মিলন হল পথেই। ''যখন রাণী ছিলুম তখন কেবল সোনারূপোর মধ্যেই পা ফেলেছি, আজ তাঁর ধুলোর মধ্যে চলে আমার সেই ভাগ্যদোষ খন্ডিয়ে নেব। আজ আমার সেই ধুলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে এই ধুলোমাটিতে মিলন হচ্ছে।'' এই মিলন নিয়ে এলো মুক্তি আর মিলন হল পথের পটভূমিতে। সন্ন্যাসীর গুহাময় অন্ধকার জীবনে আলোর উদ্ভাসন হবে বালিকার মাধ্যমেই। বালিকাই তাকে জাগিয়ে দেবে এবং সন্ধান দেবে জীবনের প্রকৃত পথের। সুতরাং পথের এই দৃশ্যপটে বালিকার সঙ্গে সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ এক বিশেষ ইঙ্গিত বহন করে। এই 'পথ' যেন উন্নীত হতেচায় প্রতীকে। সপ্তম দৃশ্যে পর্বত শিখরে বসে আছে সন্ন্যাসী। পর্বতপথে গান গাইতে গাইতে চলেছে মানুষের দল। দু'জন স্ত্রীলোক গাইছে, ''বনে এমন ফুল ফুটেছে,/মান করে থাকা আজ কি সাজে।'' এরপর একদল পথিক গাইছে, ''মরিলো মরি, / আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।'' সবশেষে একজন পথিক গাইছে, ''যোগী হে, কে তুমি হৃদি আসনে।'' এইগান তিনটির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে জগতের সৌন্দর্যের কথা (এ প্রসঙ্গে আমরা 'রবীন্দ্রনাট্যের অভিব্যক্তির ধারা' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি)। এই দৃশ্যে পর্বত শিখরে সন্ন্যাসী এবং সামনের রাস্তায় আনন্দমুখর মানবজীবন বিপরীতার্থক ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত। একদিকে জীবন ও জগৎ বিমুখ সন্ন্যাসী অন্যদিকে জীবনের ও জগতের আনন্দরসে আপ্লুত সাধারণ মানুষ। আর এই সাধারণ মানুষ আনন্দ প্রকাশের জায়গা হিসেবে পথকেই বেছে নিয়েছে। এই পথও প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। একাদশ দৃশ্যে 'পথে সন্ন্যাসী'। এ পথও সাধারণ মানুষে পূর্ণ। বালিকাকে পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী দূরে চলে এসেছে। কিন্তু এই পথে পুনরায় বালিকার সঙ্গে সন্ন্যাসীর দেখা হয়। বালিকার মায়াজাল ছিন্ন করতে গিয়েও সন্ন্যাসী

তা পারেনা। পথেই আবারও সন্ন্যাসী ও বালিকার মিলন হয়। পথে এই মিলন দৃশ্য যেন বিশেষ ইঙ্গিত দিয়ে যায়। পঞ্চদশ দৃশ্যটি 'পথে'। এই পথ 'লোকারণ্য'। রাজপুত্রের বিয়ে উপলক্ষে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে। পথের এই দৃশ্যটি আমাদের সামনে এক বিশেষ ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়। এই দৃশ্যের পূর্ববর্তী দৃশ্যটিতেই সন্ন্যাসীর আত্মজাগৃতি ঘটে গেছে। সন্ন্যাসী সেখানে ঘোষণা করেছে ''যাক, রসাতলে যাক সন্ন্যাসীর ব্রত।'' 'পাষাণ সংকল্পভার' বিসর্জন দিয়ে 'আনন্দে নিশ্বাস ফেলে' সন্ন্যাসী এবার বাঁচতে চাইছে। কিন্তু বাঁচার রাস্তাটি কি? পঞ্চদশ দৃশ্যে সন্ন্যাসীকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় পথের মাঝে। আর এই পথের মাঝে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসী তার আনন্দে বাঁচবার পথটির সঠিক নিশানা আমাদের সামনে মেলে ধরে, ''আমিও যে একজন তোমাদেরি মতো,/ তোমাদেরি গৃহমাঝে নিয়ে যাও মোরে।'' সাধারণ মানুষের জীবনের মাঝেই জীবনের মুক্তি। সীমার মাঝেই অসীমের প্রকাশ। পথের এই পটভূমিতেই সন্ন্যাসী নির্দিষ্ট করে নেয় তার মুক্তির পথ। 'রাজা' নাটকের সুদর্শনা ধুলোমাটির পথের মধ্যেই রাজার সঙ্গে মিলিত হয়ে মুক্তিলাভ করেছিল, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। 'মুক্তধারা'য় অভিজিৎ দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে দেখেছিল ভাবীকালের পথ। 'ডাকঘর'-এর অমল দেখেছে, ''—রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে—বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কতদিন কতরাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরনার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে সে কেবলই চলে আসছে—।''(৩) 'রক্তকরবী'র রাজাকেও মুক্তির জন্য জাল ছিন্ন করে পথে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। সন্ন্যাসীও তেমনি গুহা ও অরণ্যময় অবরুদ্ধ জীবন থেকে মুক্তির জন্য নেমে এল পথে। এই 'পথ' দৃশ্যটিও প্রকাশিত হ'ল প্রতীকী মাত্রায়।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর এই পাঁচটি পথের দৃশ্যের মধ্যে আমরা আমাদের লোকজীবনের চিত্র লক্ষ করি। নানা শ্রেণীর মানুষের সমাগম ঘটেছে এই পথ-দৃশ্যে। প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাটকের টেকনিকের ক্ষেত্রে যে দেশীয় লোকজীবনের pattern লক্ষ করেছেন তার সূত্রপাত 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ হয়েছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী স্পষ্টতই মন্তব্য করেছেন, ''এই নাটক খানিতেই কবির নিজস্ব নাটকীয় টেকনিক প্রথমে নিঃসংশয় রূপে দেখা দিয়েছে। সেটা কি? নাটকখানির অধিকাংশ দৃশ্য আলোচনা করিলে দেখা যায়—এগুলি একটি পথ ও বিচিত্র জনসমাবেশের সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই নহে।''[১৩]

শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাটকে পথ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, ''কখনও তা নাটকের বিষয়ও বটে'', অশ্রুকুমার সিকদারও একই মন্তব্য করেছেন, ''রবীন্দ্রনাট্যে প্রধান বিষয় বন্ধন থেকে মুক্তি। পথ সেই মুক্তিস্পৃহার প্রতীক। রবীন্দ্রনাট্যের প্রধান বিষয় সর্বপ্রকার বন্ধন জড়ত্ব থেকে মুক্তি বলে সেই নাটকের ঘটনাস্থান প্রায় ক্ষেত্রেই পথ।''[১৪] 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ এই বন্ধন মুক্তি এবং পথ-এর অনুষঙ্গ কতটা

মিলতে পেরেছে? পথ কতটা হয়ে উঠতে পেরেছে নাটকের বিষয়বস্তু? বিষয়গত দিক থেকে বিচার করলে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' অবশ্যই বন্ধনমুক্তির নাটক। গুহাময় অন্ধকার জীবন থেকে সন্ন্যাসীর মুক্তিলাভ এই নাটকের বিষয়বস্তু। বিষয়বস্তু 'বন্ধনমুক্তি' কারণেই এখানে ঘটনাস্থান হিসেবে কয়েকটি দৃশ্যে উঠে এসেছে পথ। ফলে এমন দাবী করা চলে এখানে পথের দৃশ্য প্রতীকের পরমার্থতা পেয়েছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর দ্বন্দ্ব মূলতঃ সন্ন্যাসীর আত্মিক দ্বন্দ্ব। সন্ন্যাসীর এই আত্মিক দ্বন্দ্বই প্রতীক রূপে প্রকাশিত হয়েছে 'গুহা' ও 'পথ'-এর দ্বন্দ্বে। এ প্রসঙ্গে সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে, ''এই নাটকের গুহাটি আর কিছুই নয়, সন্ন্যাসীর বিশ্ববিহীন আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্ব মাত্র।''[১৫] গুহায় আত্মকেন্দ্রিত সন্ন্যাসী, পথে নানা বর্ণময় সাধারণ মানুষের স্বাধীন জীবন যাত্রা। ''এই আত্মকেন্দ্রিত বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানা রূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই কলরবের বিশেষত্বই হচ্ছে তার অকিঞ্চিৎকরতা। এই বৈপরীত্যকে নাট্যিক বলা যেতে পারে।''[১৬] গুহা ও পথের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত জয় হয় পথের। সন্ন্যাসীকে গুহার অন্ধকার ছেড়ে নেমে আসতে হয় পথে নানা শ্রেণীর সাধারণ মানুষের মাঝে, যেখানে জীবনের স্রোত প্রবাহিত। রবীন্দ্রনাথের সব নাটকই গুহা থেকে পথে বেরিয়ে পড়ার আহ্বান জানায়। আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বিশ্বজনীনতায়, অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে পড়ার পথ দেখায়। তাই 'রক্তকরবী'র জাল যায় ছিঁড়ে, 'মুক্তধারা'র বাঁধ যায় ভেঙ্গে, 'ডাকঘর'-এ, ''খুলে দাও, খুলে দাও যত দ্বার জানালা আছে সব খুলে দাও''(৩) বলে অমলের ঘরের সব দরজা-জানালা খুলে দেওয়া হয়, 'অচলায়তন'-এর দেয়াল যায় ভেঙ্গে এবং 'রাজা' নাটকের রাণী সুদর্শনাকে পথে বেরিয়ে আসতে হয়। সুতরাং পরিণত পর্যায়ের নাটকে বিষয়বস্তু হিসেবে যে পথের প্রয়োগ সেই প্রয়োগই দেখা যায় 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর পর রচিত হল 'নলিনী'। কিন্তু 'নলিনী'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নাট্যরীতির কোন পরিচয় নেই। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর মত একটি তত্ত্বমূলক নিজস্বরীতির নাটক রচনার পর 'নলিনী'র মত একটি 'অকিঞ্চিৎকর'[১৭] নাটক রচনার প্রয়োজন কেন হল? অভিনয়ের কারণে দেখা দিল সেই প্রয়োজন। বারোয়ারী পদ্ধতিতে একটি নাটক লেখা শুরু হয়েছিল। কিন্তু ''শেষকালে রবীন্দ্রনাথকেই সেই খসড়া ছাঁটিয়া কাটিয়া একটা চলনসই নাটক খাড়া করিতে হইল। নাটকখানির নাম রাখা হইল 'নলিনী'।''[১৮] এ কারণেই রবীন্দ্রনাথকে 'ভগ্নহৃদয়'-এর কাহিনী থেকে গেঁথে তুলতে হল 'নলিনী'কে। আর সে কারণেই এখানে রইল না 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর কোন প্রভাব। শুধুমাত্র নাট্যভাষা হিসেবে দেখা দিল গদ্য, যে গদ্যভাষায় পরবর্তী পর্যায়ে লেখা হল তত্ত্বমূলক নাটকগুলি। সুতরাং আঙ্গিকগত দিক থেকে 'নলিনী'র সার্থকতা সেই খানে যে 'নলিনী' লেখা হয়েছিল গদ্যে। 'নলিনী'র কাহিনী রূপান্তরিত হল গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'য়। কিন্তু 'মায়ার খেলা' প্রকৃতিগত দিক থেকে 'বাল্মীকি প্রতিভা' এবং 'কালমৃগয়া'

থেকে স্বতন্ত্র। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, ''বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা।''[১৯] একটিতে নাটক হয়ে উঠল মুখ্য, অন্যটিতে মুখ্য হল গান। গান ও নাটকের এই মেলামেশার পালা চলবে জীবনের শেষ পর্যন্ত। নাট্যরচনায় গান যে পরবর্তী পর্যায়ে একটি বিশেষ ভূমিকা নেবে এখানে তারই হল সূচনা। 'শারদোৎসব' থেকে যে যাত্রা পালার pattern হয়ে উঠবে প্রধান অবলম্বন তারই প্রস্তুতির চিহ্ন রইল 'বাল্মীকি প্রতিভা', ' কালমৃগয়া' এবং 'মায়ার খেলা'য়। এই গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা' পরবর্তী পর্যায়ে (১৩৪৫) রূপান্তরিত হ'ল নৃত্যনাট্য 'মায়ার খেলা'য়।

জনতা চরিত্রের উপস্থাপন রবীন্দ্রনাটকের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্রমথনাথ বিশী জনতা চরিত্র প্রসঙ্গে লিখেছেন, ''মূঢ়তা ও ভীরুতা, এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বুদ্ধি তাহার প্রধান লক্ষণ। সেই সঙ্গে যোগ করা যাইতে পারে মতিগতির আত্যন্তিক স্থিতিস্থাপকতার। কৌশলী ব্যক্তি অনায়াসে ইহাদিগকে অবাঞ্ছিত পথে চালিত করিতে পারে, এমন যে সম্ভব তাহার কারণ ব্যক্তিত্বের মেরুদন্ডের ইহাদের একান্ত অভাব, তদুপরি মূঢ়তা ও ভীরুতাতো আছেই।''[২০] শ্রী বিশীর এই মন্তব্য যথার্থ বলে আমরা মনে করি। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'বিসর্জন', 'রাজা', ইত্যাদি নাটকের জনতা চরিত্র বিশ্লেষণ করলে উপরের মন্তব্যের সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু 'রুদ্রচন্ড'-এর জনতার মধ্যে ভীরুতা, মূঢ়তা এবং কুসংস্কারাচ্ছন্নতার কোন আভাস পাওয়া যায় না। 'রুদ্রচন্ড'-এর জনতা সাহসী ও প্রতিবাদী। এই নাটকে জনতা চরিত্র দেখা দিয়েছে শুধুমাত্র একাদশ দৃশ্যে। এখানে তারা 'নাগরিকগণ' হিসেবে পরিচিত। পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের খবর শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে নাগরিকগণ। তারা ঘোষণা করে —

মরণ উৎসব আজ হইবে নগরে।
চিতার মশাল জ্বালি শোণিত মদিরা
যমরাজ আজ রাত্রে করিবেন পান।

এই সাহসিকতা ও প্রতিবাদী মনোভাবের দিক থেকে 'মুক্তধারা' নাটকের জনতা চরিত্রের এক দূরতম আভাস যেন পাওয়া যায় 'রুদ্রচন্ড'-এ।

'রুদ্রচন্ড'-এ যে জনতা চরিত্রের সূত্রপাত হল সেই জনতা চরিত্রই কয়েক বছর পর 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ রাবীন্দ্রিক জনতায় উন্নীত হল। এ নাটকের অনেকটা জুড়েই রয়েছে জনতা। প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় তারা ভীরু, মূঢ় এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন রবীন্দ্রনাটকের বিশিষ্ট জনতা।

প্রথম পর্যায়ের তিনটি নাটকে 'রুদ্রচন্ড', 'বাল্মীকি প্রতিভা' এবং 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ তিনটি

বালিকা চরিত্রের দেখা মেলে। 'রুদ্রচন্ড'-এ অমিয়া, 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় বালিকার বেশধারী সরস্বতী এবং 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ রঘুর দুহিতা। এই তিনজন বালিকার নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এরাই 'বিসর্জন'-এর অপর্ণার মধ্য দিয়ে সম্প্রসারিত হয়ে পৌঁছেছে 'রক্তকরবী'র নন্দিনীতে। আমাদের এ কথার সমর্থন মিলবে সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর লেখায়। তাঁর মতে—

> এই বালিকাই 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় দস্যুর মনে করুণা এনেছে, 'বিসর্জনে' (১৮৯০) অপর্ণা রূপে রঘুপতির প্রতিহিংসা নিবৃত্ত করেছে, 'ডাকঘরে' (১৯১১-১২) সেই সুধা, 'মুক্তধারা'য় (১৩২৯) একটি স্ত্রী লোকের ভূমিকা তারই এবং 'রক্তকরবী'তে (১৯২৬) নন্দিনীরূপে রাজার কঠিন শাসন ও দর্প সেই চুর্ণ করেছে। অর্থাৎ এই বালিকাই নানারূপে বারে বারে দেখা দিয়েছে রবীন্দ্রনাট্যে।[২১]

নাটকে বিষয়বস্তুগত দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্বতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিষয়বস্তুতে দৈনন্দিন সামাজিক সমস্যার উপস্থাপন না হয়ে , উপস্থাপিত হ'ল মানুষের চিরকালীন আত্মিক সমস্যার কথা। কোন নির্দিষ্ট দেশকালের গন্ডিতে বাঁধা পড়লো না কাহিনী। দেশ-কাল অতিক্রম করে কাহিনী হয়ে উঠলো সর্বদেশের, সর্বকালের। এ কারণে পাত্র-পাত্রীরাও বাঁধা পড়লো না কোন ভৌগোলিক গন্ডিতে। **পাত্র-পাত্রীর রক্তমাংসের বহিরাবরণ খসে গিয়ে উন্মোচিত হ'ল অন্তর। আত্মিক-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তারা উন্নীতহল চিরকালের মানব-মানবীতে, পরিণত হল মানবিক idea-য়।** আর এ কারণেই দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখা দিল দুটি বিরুদ্ধ ভাবের। Edward Thompson যথার্থই বলেছেন, "His dramatic work is the vehicle of ideas, rather than the expression of action"[২২] অশ্রুকুমার সিকদার মন্তব্য করেছেন, **"রবীন্দ্রনাট্যে তত্ত্বগত বিচারে বিষয়বস্তু একটি মাত্র, জড়শক্তির সঙ্গে প্রাণ শক্তির বিরোধ এবং পরিণামে** প্রাণের অবশ্যম্ভাবী জয়লাভ।"[২৩] তিনি আরো বলেছেন, "রবীন্দ্রনাট্যে প্রধান বিষয় বন্ধন থেকে মুক্তি।"[২৪]

রবীন্দ্রনাটকে এই বন্ধন-মুক্তির সূচনা তাঁর প্রথম পর্যায়ের নাটকগুলির মধ্যেই শুরু হয়েছে। একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, বিষয়বস্তুর এই আভাস তাঁর কাহিনীকাব্য গুলির মধ্যেও রয়েছে। যদিও রবীন্দ্রনাথ কতটুকু সচেতন ভাবে এই গুলি প্রয়োগ করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। তবুও সেখানেও পাত্র-পাত্রীর মানবিক অথবা মানসিক উত্তরণের মধ্যদিয়ে মুক্তির পথের ইশারা রয়ে গেছে। 'বনফুল'-এর কমলা মানুষ, সংসার কাকে বলে জানত না কিন্তু সেও একসময় বলে ওঠে, "এখন মানুষে বেসেছি ভালো/ হৃদয় খুলি মানুষ কাছে।" এই ভালোবাসার মধ্যদিয়েই তার মুক্তি ঘটে। 'কবি কাহিনী'র কবি ঘোষণা করে সেই চিরকালীন সত্য, "মানুষের মন চায় মানুষেরই মন"। মানুষের মনের সঙ্গে

মিলনের আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই নিহিত থাকে আত্মমুক্তির আভাস। 'ভগ্নহৃদয়'-এর নলিনীও 'হৃদয়ের দুয়ারের' বাইরে বসে প্রেমের খেলার বন্ধন ছিন্ন করে প্রকৃত ভালবাসার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। কাহিনীকাব্যের এই আত্মমুক্তির আভাস পরবর্তীকালে নাটক গুলিতে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠে।

'রুদ্রচন্ড'-এ পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে রুদ্রচন্ডের নিষ্ঠুর আকাঙ্খার মৃত্যু ঘটে। এই আকাঙ্ক্ষার মৃত্যুর ফলেই মুক্তিলাভ করে রুদ্রচন্ড। এও এক ধরণের বন্ধন থেকে মুক্তি, অহং-এর বন্ধন থেকে মুক্তি। এই মুক্তির ফলেই জেগে ওঠে পিতৃত্ব। এতদিন যে কন্যাকে সে অবহেলা করেছিল আজ তাকে, "আয় মা অমিয়া মোর কাছে আয় বাছা" বলে বুকে জড়িয়ে ধরে। 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় অভ্যাসের কঠোরতায় বাল্মীকির 'স্বাভাবিক মানবত্ব' আচ্ছাদিত ছিল। একদিন 'দস্যুর নির্মমতা ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হল তার অন্তর্গূঢ় করুণা।" করুণার উদ্রেকের ফলেই বাল্মীকির মুক্তি লাভ হল। 'কালমৃগয়া' নাটকে এই বন্ধনমুক্তির বিষয়টি উপস্থাপন না হলেও সেখানে ক্ষমাশীলতার মহত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে। পুত্র হত্যাকারী দশরথকে ক্ষমা করে অন্ধ ঋষি উচ্চারণ করেছে—

শোক তাপ গেল দূরে,
মার্জ্জনা করিনু তোরে! (ষষ্ঠ দৃশ্য)

'রুদ্রচন্ড'-এ যে বন্ধনমুক্তির আভাস আছে সেই বন্ধনমুক্তির কথাই 'বাল্মীকি প্রতিভা' হয়ে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করেছে। সামগ্রিক রবীন্দ্র দর্শনেরও প্রকাশ রয়েছে এই নাটকে। এই নাটকটি প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন—

> পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্য রচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার সমস্ত কাব্য রচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।... কাব্য হিসাবে প্রকৃতির প্রতিশোধের স্থান কি তাহা জানিনা, কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।[২৫]

অনেক পরে, ১৩১১ সালে পুনরায় রবীন্দ্রনাথ একই কথা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' সম্পর্কে লিখলেন—

> আমি বালক বয়সে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিয়াছিলাম—তখন আমি নিজে ভালো করিয়া বুঝিয়াছিলাম কি না জানি না—কিন্তু তাহাতে এই কথা ছিল

> যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি।[২৬]

সন্ন্যাসী অন্তকে বাদ দিয়ে অনন্তের সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিল বলেই তার মুক্তি সম্ভব হয়নি। অহং-এর বাতাবরণে সন্ন্যাসী যে স্বাতন্ত্র্যের জাল সৃজন করেছিল সেই জাল ছিন্ন হবার পরই সন্ন্যাসীর মুক্তিলাভ সম্ভব হল। সীমার মাঝে অসীমের প্রকাশ আর এই সীমার মাঝে অসীমকে প্রত্যক্ষ করতে পারাই হচ্ছে মুক্তি।

'মায়ার খেলা'তে দেখা দিল আত্মসুখের বিড়ম্বনা। সবাই সুখের জন্য প্রেম কামনা করে বলেই 'প্রেম মেলে না। শুধু সুখ চলে যায়।' এও এক বন্ধন, এ বন্ধন আত্মনিমগ্নতার। 'রাজা ও রানী' নাটকে বিক্রমদেব বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাণী সুমিত্রার প্রেমে আত্মনিমগ্ন হতে চেয়েছিল। এ কারণেই দেখা দিল বিপর্যয়। সুমিত্রার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে বিক্রমদেবের আত্মমগ্নতার অবসান হল, তার আত্মমুক্তি ঘটলো। 'বিসর্জন'-এর রঘুপতিও অন্ধবিশ্বাস এবং অহং-এর জালে বন্দী ছিল। জয়সিংহ আত্মঘাতী হয়ে রঘুপতির অন্ধবিশ্বাস এবং অহং-এর জাল ছিন্ন করে দিল, এর ফলেই রঘুপতির ঘটলো মুক্তি।

প্রথম পর্যায়ের নাটক গুলিতে আমরা যেমন pattern গত দিক থেকে পরিণত পর্যায়ের বীজের সন্ধান পেয়েছি তেমনি বিষয়বস্তুগত দিক থেকেও দেখা যাচ্ছে পরিণত পর্যায়ের বিষয়বস্তুর বীজ প্রথম পর্যায়ের নাটকগুলিতে বর্তমান। কাহিনীকাব্য গুলির কথা ছেড়ে দিলেও প্রথম নাটক 'রুদ্রচন্ড'-এ যে বিষয়বস্তুর আভাস রয়েছে তাই সম্প্রসারিত এবং সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে পরিণত পর্বের নাটকগুলিতে। লক্ষ করবার বিষয় যে 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯) এবং 'বিসর্জন' (১৮৯০) টেকনিক গত দিক থেকে শেক্সপিয়রীয় কিন্তু বিষয়গত দিকে রাবীন্দ্রিক। সেখানেও উঠে এসেছে বন্ধনমুক্তির কথা।

রবীন্দ্রনাথের স্বকালে অন্যান্য যে সব নাটক রচিত হয়েছিল সেই সব নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাটকের আঙ্গিকগত পার্থক্য যেমন রচিত হল তেমনি রচিত হল বিষয়গত পার্থক্য। এই পার্থক্যের পিছনে কাজ করেছে গীতিকবির আত্মোপলব্ধির প্রবণতা। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

> নানা-খানা করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে তাতে আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।[২৭]

সামাজিক নাটকে যেখানে উঠে আসে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের কথা সেখানে রবীন্দ্রনাটকে উঠে এলো ব্যক্তির আত্মিক সমস্যার কথা এবং আত্ম-মুক্তির কথা। এর পিছনে কাজ করলো গীতিকবির আত্মোপলব্ধি। আর সে কারণেই তাঁর নাটকের পাত্র-পাত্রীর রক্তমাংসের বহিরাবরণ গেল খুলে, বেরিয়ে এলো ভিতরের মানুষ। ব্যক্তিবোধের সঙ্গে বিশ্ববোধের দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে উত্তরণ ঘটলো বিশ্ববোধে। আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে তারা উন্নীত হল মানবিক idea তে। উত্তরণের মধ্যদিয়ে পরিণত হল দেশ-কালহীন চিরকালীন মানবসত্তায়। Individuality-র আবরণ ছিন্ন করে বৃহতের স্পর্শ লাভই হল মূল বিষয়বস্তু। প্রথমপর্বের নাটক গুলিতেই রইল এর আভাস। এই আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠলো পরিণত পর্যায়ের নাটকে। 'রাজা' নাটকের রাণী সুদর্শনার আত্মমুক্তি ঘটলো বাইরের সৌন্দর্যের মোহ ঘুচে যাওয়ার পর। আত্মোপলব্ধির মধ্যদিয়েই রাজার সাক্ষাৎ মিলল। আর এই সাক্ষাৎ হল ধুলিমাটির রাস্তায়, বৃহতের সঙ্গে মিলন হল উন্মুক্ত বিশ্বজগতের মধ্যে। 'ডাকঘর' নাটকেও মুক্তির কথা উঠে এসেছে। এখানেও বৃহতের সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। 'মুক্তধারা' নাটকে বন্ধন মুক্তির প্রকাশ দেখা দিল দুটি রাস্তায়। অভিজিৎ মুক্তধারার স্রোত খুলে দিয়ে আত্ম-বিসর্জন দিয়েছিল, আত্ম-বিসর্জন এখানে আত্ম-মুক্তির ভিন্ন প্রকাশ। আর এক দিকে মুক্তধারার স্রোত খুলে গিয়ে সাধারণ মানুষ যন্ত্রসভ্যতার অমানবিকতা থেকে মুক্তি পেয়েছিল। 'রক্তকরবী' নাটকেও একদিকে রাজার individuality-র আবরণ ছিঁড়ে গিয়ে মুক্তি ঘটলো, অন্যদিকে মুক্তি ঘটলো যক্ষপুরীর সাধারণ মানুষের। এই মুক্তির কথাই প্রকাশ পেয়েছে 'অচলায়তন' নাটকে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর গুরুত্ব দু'দিক থেকে এক. আঙ্গিকগত, দুই. বিষয়বস্তুগত। এই দু'দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে তাঁর নিজস্বতার সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু এই নিজস্বরীতির সন্ধান পেয়ে যাওয়ার পরও কেন তিনি তাতে আত্মস্থ হতে পারলেন না? আমাদের ধারণা সেই সময়ের ইউরোপীয় নাট্যাদর্শের চাপ এই আত্মস্থ হতে না পারার পিছনে কাজ করেছিল। তিনি স্থিত থাকতে পারেন নি তাঁর অবস্থানে এবং সম্ভব হয়নি নিজের প্রতি আস্থায় অবিচল থাকা। আর সে কারণেই লেখা হয়েছিল 'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন'। এরপর ১৯০৭ পর্যন্ত নাটক রচনার বিরতিকাল। ১৯০৮-এ লেখা হল 'শারদোৎসব'। এই বিরতির মাঝেই হিসেব-নিকেশ হয়েগিয়েছিল কি করা প্রয়োজন। প্রয়োজন এটাই ছিল বাংলা নাটককে জাতীয় মর্যাদায় উন্নীত করা। তাই করলেন রবীন্দ্রনাথ। ইউরোপীয় নাট্যাদর্শের আরোপিত প্রয়োগকৌশল থেকে বাংলা নাটকের মুক্তি ঘটলো রবীন্দ্রনাথের হাতেই।

নির্দেশিকা

১. "বাক্যের সৃষ্টির উপরে আমার সংশয় জন্মে গেছে। এত রকম চলতি খেয়ালের উপর তার দর যাচাই হয়, খুঁজে পাইনে তার মূল্যের আদর্শ।" ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। *চিঠিপত্র* - ১১। প্রকাশ আষাঢ় ১৩৮৯। বিশ্বভারতী। পৃ: ২২৪।

২. চৌধুরাণী, ইন্দিরা দেবী, *রবীন্দ্রস্মৃতি*। পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৯৬। বিশ্বভারতী। পৃ: ৩৮।

৩. Thompson, Edward, *Rabindranath Tagore Poet and Dramatist*.Oxford University Press. England. 1926. p. 51.

৪. বিশী, প্রমথনাথ, *রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ* - ২য় খন্ড। প্রথম ওরিয়েন্ট সংস্করণ - সেপ্টেম্বর ১৯৫৮। কোলকাতা। পৃ: ১৮।

৫. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সূচনা - *মালিনী*। *রবীন্দ্র রচনাবলী*। ৫ম খন্ড। জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৬. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'রঙ্গমঞ্চ', *বিচিত্র প্রবন্ধ*। *রবীন্দ্র রচনাবলী*। চতুর্দ্দশ খন্ড। জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃ: ৭৪৫।

৭. ঐ।

৮. ঐ, পৃ: ৭৪৪।

৯. সিকদার, অশ্রুকুমার, 'রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যাদর্শ', *বাক্যের সৃষ্টি: রবীন্দ্রনাথ*। দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮১। কোলকাতা। পৃ: ১২৬-১২৭।

১০. ঘোষ, শঙ্খ, 'পথ : প্রতীক ও পটভূমি', *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক*। দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৫। কোলকাতা। পৃ: ৬১।

১১. বিশী, প্রমথনাথ, *রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ* - ২য় খন্ড। পৃ: ১৯।

১২. ঘোষ, শঙ্খ, 'পথ : প্রতীক ও পটভূমি', *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক* । পৃ: ৬১- ৬২।

১৩. বিশী, প্রমথনাথ, *রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ* - ২য় খন্ড। পৃ: ১৮।

১৪. সিকদার, অশ্রুকুমার, *রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য*। প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৩। কোলকাতা। পৃ: ২০৯।

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, সংঘমিত্রা, *রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব*। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮ ।এস, গুপ্ত অ্যান্ড ব্রাদার্স, কলিকাতা। পৃ: ২৩৮।

১৬. ঠাকুব, রবীন্দ্রনাথ, সূচনা - *প্রকৃতির প্রতিশোধ। রবীন্দ্র রচনাবলী* - ১ম খন্ড। বিশ্বভারতী।

১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'মায়ার খেলা' নাটকের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন। *রবীন্দ্র রচনাবলী* - ১ম খন্ড। বিশ্বভারতী।

১৮. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* - প্রথম খন্ড। পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪০১। বিশ্বভারতী। পৃ: ১৯৩।

১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*।পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪০১। বিশ্বভারতী। পৃ: ১১৭।

২০. বিশী, প্রমথনাথ, *রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ* - ২য় খন্ড। প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ ১৫ই আগস্ট ১৯৬৬। পৃ: ৪৮৫ - ৮৬।

২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সংঘমিত্রা, *রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব*। পৃ: ২৩৭ - ৩৮।

২২. Thompson, Edward, *Rabindranath Tagore Poet and Dramatist*. p. 51.

২৩. সিকদার, অশ্রুকুমার, *রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য*। পৃ: ২০০।

২৪. ঐ। পৃ: ২০৯।

২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১৪১ - ৪২।

২৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *আত্মপরিচয়*। সংস্করণ চৈত্র ১৪০০। বিশ্বভারতী। পৃ: ২৬।

২৭. ঐ। পৃ: ৭৩।

চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাটকের প্রথম পর্যায় ও সমকালীন বাংলা নাটক

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যচর্চার সূচনালগ্ন থেকেই স্বতন্ত্রধারার সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্যতার প্রকাশ দু'দিক থেকেই হয়েছে, এক. নাটকের কাঠামোগত দিক, দুই. বিষয়বস্তুগত দিক। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় এই স্বাতন্ত্র্যে পূর্ববর্তী অথবা সমকালীন নাট্যকারদের কোন ছায়াই কি পড়েনি? শেষ বিচারে সে কথাই হয়তো আমরা স্পষ্ট করে তুলব যে রবীন্দ্রনাথ নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর নিজ প্রতিভার আলোকময়তায় স্বতন্ত্র। কেন এই ভিন্নতা? কোন জায়গা থেকে এবং কি ভাবে ভিন্ন হলেন রবীন্দ্রনাথ তার অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। তাই এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাট্যচর্চার প্রথম পর্যায়ে (১৮৮১ - ১৮৯০) অন্যান্য যে সমস্ত নাটক রচিত হয়েছে সে সবের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু নাটকের আলোচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাট্যের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের বিষয়টি উপস্থাপন করা হবে।

এক

রবীন্দ্রনাট্যচর্চার প্রথম পর্যায়ের (১৮৮১-১৮৯০) সমকালে যে সমস্ত নাটক রচিত হয়েছিল তার উল্লেখযোগ্য নাটকগুলিকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে নিয়েছি।

ক. পৌরাণিক

পার্থপরাজয় নাটক (১৮৮১)	—	মনোমোহন বসু
রামের বনবাস (১৮৮২)	—	রাজকৃষ্ণ রায়
সীতার বনবাস (১৮৮২)	—	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
বৃষকেতু (১৮৮৪)	—	গিরিশচন্দ্র ঘোষ

যদুবংশ ধ্বংস (১৮৮৪)	—	রাজকৃষ্ণ রায়
তরণীসেন বধ (১৮৮৪)	—	রাজকৃষ্ণ রায়
নল-দময়ন্তী (১৮৮৭)	—	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
দক্ষ-যজ্ঞ (১৮৮৯)	—	গিরিশচন্দ্র ঘোষ

খ. প্রহসন

তিল তর্পণ (১৮৮১)	—	অমৃতলাল বসু
চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে (১৮৮৪)	—	অমৃতলাল বসু
বিবাহ বিভ্রাট (১৮৮৪)	—	অমৃতলাল বসু
হঠাৎ নবাব (১৮৮৪)	—	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেল্লিক বাজার (১৮৮৭)	—	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
দাদা ও আমি (১৮৮৮)	—	উপেন্দ্রনাথ দাস
তাজ্জব ব্যাপার (১৮৯০)	—	অমৃতলাল বসু

গ. গীতাভিনয়

মায়াতরু (১৮৮১)	—	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
ব্রজবিহার (১৮৮৩)	—	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
হীরার ফুল (১৮৮৪)	—	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
আশালতা (১৮৮৮)	—	রাধানাথ মিত্র
নব-বাসর (১৮৮৮)	—	রাধানাথ মিত্র

ঘ. ঐতিহাসিক নাটক

স্বপ্নময়ী (১৮৮২)	—	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঙ. সামাজিক নাটক

আনন্দময় নাটক (১৮৯০)	—	মনোমোহন বসু
হারানিধি (১৮৯০)	—	গিরিশচন্দ্র ঘোষ

চ. জীবনচরিত মূলক নাটক

চৈতন্যলীলা (১৮৮৬) — গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বুদ্ধদেব চরিত (১৮৮৭) — গিরিশচন্দ্র ঘোষ

নাটকের এই শ্রেণীকরণ পূর্ববর্তী নাট্যধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অর্থাৎ ১৮৫২ সালে 'ভদ্রার্জুন' নাটক রচনার মধ্য দিয়ে তারাচরণ শিকদার যে মৌলিক নাটক রচনার সূত্রপাত করেন সেই থেকে— বিষ্ণু বসু যাকে বলেছেন প্রস্তুতি পর্ব,[১] —১৮৮১-এর পূর্ব পর্যন্ত যে নাট্যধারা সৃজন হয়েছে সেই ধারার মধ্যেই আমরা পৌরাণিক, প্রহসন, গীতাভিনয়, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকের সন্ধান পাই। তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' পৌরাণিক বিষয়বস্তু অনুসারে রচিত। ''প্রধানত কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতে অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা-হরণের বৃত্তান্তটি অবলম্বন করিয়া তারাচরণ তাঁহার 'ভদ্রার্জুন' নাটক রচনা করেন।''[২] পৌরাণিক নাটকের মধ্যে অন্যান্য যে সমস্ত নাটক রচিত হয়েছে তাদের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষের 'কৌরব বিয়োগ' (১৮৫৭), মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯), রামনারায়ণ তর্করত্নের 'ধর্মবিজয়' (১৮৭৫) ও 'কংসবধ' (১৮৭৫) নাটক উল্লেখযোগ্য। তবে পৌরাণিক নাটকের মধ্যে পুরাণ প্রয়োগের ভিন্নতা রয়েছে। একটি পুরাণের বিষয়কে অবলম্বন করে হয়ে উঠেছে ভক্তিরসাশ্রিত অন্যটি পুরাণাশ্রিত কিন্তু ভক্তি রসাত্মক নয়। যেমন মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা'। অনেক পরে রবীন্দ্রনাথ পুরাণের বিষয়কে অবলম্বন করে গেঁথে তুলেছেন ভিন্ন মাত্রার নাটক 'চিত্রাঙ্গদা'। প্রহসনমূলক নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০), 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রো' (১৮৬০), রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম তেমন ফল' (১৮৬৫), 'উভয় সংকট' (১৮৬৯), 'চক্ষুদান' (১৮৬৯), দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগল বুড়ো' (১৮৬৬), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'জামাই বারিক' (১৮৭২) ইত্যাদি নাটক।

বাংলা নাটকে গীতাভিনয় ধারার সূত্রপাত করেন মনোমোহন বসু (১৮৬৭-১৮৯০)। এই গীতাভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 'সতী' (১৮৭৩) নাটকের ভূমিকায় তিনি যে কথা লিখেছেন তা উদ্ধারযোগ্য —

> ইউরোপে নাটক কাব্যে গান অল্পই থাকে, আমাদের তথাবিধ গ্রন্থে গীতাধিক্যের প্রয়োজন। ইটী জাতীয় রুচিভেদে স্বাভাবিক। যে দেশের বেদ অবধি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ধারাপাত পাঠ পর্যন্ত স্বর-সংযোগ ভিন্ন সাধিত হয় না; যে দেশের লোক সঙ্গীতের সাহচর্য বিরহিত পুরাণ পাঠও শ্রবণ করে না; যে দেশের আপামর সাধারণ জনগণ পরাধীনতার জন্য সর্বপ্রকার হীনতা

> ও দীনতার হস্তে পড়িয়াও পূর্ব গান্ধর্ববিদ্যার উন্নত অঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নানা রঙ্গে অত্র বঙ্গে যাত্রা, কবি, পাঁচালী ফুল ও হাফ আখড়াই, কীর্তন, তর্জা, ভজন প্রভৃতি নিত্যনূতন সঙ্গীতামোদে আবহমান ঘোর আমোদী; অধিক কি যে দেশের দিবাভিক্ষু ও রাতভিকারীও গান না শুনাইলে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন পাইতে পারে না, যে দেশের দৃশ্যকাব্য যে সঙ্গীতাত্মক হইবে, ইহা বিচিত্র কি? একথা এত করিয়া লিখিবার কারণ আছে। ... অতএব চরিত্রগত স্বভাবের সমর্থন পূর্বক বাঙ্গালা নাটকে সৎসঙ্গীতের বাহুল্য যতই থাকিবে, ততই লোকের প্রীতির কারণ হইবে, সন্দেহ নাই। নাটকের অন্যান্য অঙ্গে কল্পনা ও বিচার শক্তি যেমন আবশ্যক, গীতি অংশেও তদপেক্ষা ন্যূন হওয়া উচিত নহে।[৩]

'সতী' নাটকের এই ভূমিকার থেকেও আরও পরিষ্কার ভাষায় বাংলা নাটকে গানের প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ গীতাভিনয়ের স্বপক্ষে মনোমোহন বসু বক্তব্য রেখেছিলেন ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম বাৎসরিক সভায়। আমরা সেই বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি —

> আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, নাট্যাভিনয়ে গানের বড় আবশ্যক হয় না। ইউরোপীয় রঙ্গভূমিতে নাটকাভিনয় কালে গানের অভাব দেখিয়াই তাহারা এই সংস্কারের বশ্যতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, ইউরোপীয় রুচি ও স্বদেশীয় রুচি যে সম্যক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা তাহারা ভাবিয়া দেখেন না। যে স্থানে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্যেই গান নহিলে চলে না... যে দেশে কালোয়াতি গান সকলে বুঝিতে পারে না বলিয়া অপর সাধারণের তৃপ্তির নিমিত্ত যাত্রা, কবি, পাঁচালী,মরিচা, তর্জা, ভজন, কীর্তন, ঢপ, আখড়াই, হাফ আখড়াই, পদাবলী—বাউলের গান প্রভৃতি বহুপ্রকার গীতি কাব্যের প্রচলন... যে দেশের হাড়ে হাড়ে যে সঙ্গীতের রস প্রবৃষ্ট হইয়া আছে, তাহাও কি আবার অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে? যাত্রাওয়ালারা স্বভাবের ঘাড় ভাঙ্গিয়া অপ্রাকৃত সং, রং, ঢং ইত্যাদি তামাসা দেখাইবার পরেও সহস্র সহস্র লোকের যে এতদূর চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, সে কি শুদ্ধ দেশস্থ লোকের অনভিজ্ঞতা ও গুণ গ্রহণে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত? কদাচ নহে।[৪]

মনোমোহন বসুর এই বক্তব্যে নাটককে দেশীয় করণ করার প্রতি তাঁর আগ্রহের কথা প্রকাশ পেয়েছে। ইউরোপীয় নাট্যকলার মাধ্যমে যে বাংলা নাটকের মুক্তিলাভ সম্ভব নয় তা পরিষ্কার হয়ে গেছে মনোমোহন বসুর এই বক্তব্যে। ১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা বাংলা নাট্য জগতের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ন্যাশনাল থিয়েটারকে ঘিরেই বাংলা নাটকের আত্ম-আবিষ্কারের সূচনা। অবশ্য তারও আগে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দু মেলা'র প্রতিষ্ঠায় স্বদেশ প্রীতির সূত্রপাত। শিকড় সন্ধানের মধ্য দিয়েই সম্ভব আত্ম-আবিষ্কার। "... আমরা চাই দেশে পূর্বে যাহা ছিল তাহা ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। আমরা চাই, সেই যাত্রার গান সংখ্যা কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে শোধিত করিয়া কথোপকথনাদি বিবৃত হউক।"[৫] এই আত্ম-আবিষ্কারের অনুপ্রেরণাতেই গীতাভিনয়ের সৃষ্টি। মনোমোহন বসু যার সূচনা করলেন তা গিরিশ ঘোষের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে এসে বিষয় বস্তু এবং pattern-এর দিক থেকে তার প্রকৃতি গেল ভিন্ন হয়ে।

ঐতিহাসিক নাটক রচনার সূত্রপাত হয়েছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাত দিয়েই। তাঁর রচিত 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটকই প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক নাটক। সমাজ সংস্কার মূলক নাটকও বাংলা নাটকের সূচনা লগ্ন থেকেই লেখা শুরু হয়েছিল। যেমন বহু বিবাহকে বিষয় করে রামনারায়ণ তর্করত্ন লিখলেন 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (১৮৫৪), 'নবনাটক' (১৮৬৬), তারকচন্দ্র চূড়ামণি লিখলেন 'সপত্নী নাটক' (১৮৫৮), হরিশচন্দ্র মিত্র লিখলেন 'সপত্নী কলহ' (১৮৭২)। প্রহসন গুলির মধ্যেও সামাজিক সমস্যার কথা এসেছে। সমাজ সংস্কারও প্রহসনের লক্ষ্য। যেমন মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা', রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' ইত্যাদি নাটকে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। এ কারণে প্রহসন ও সামাজিক নাটকগুলির অবস্থান খুব কাছাকাছি বলে ধরে নেওয়া যায়।

এই সময়কার উল্লেখযোগ্য নাট্যকাররা হলেন মনোমোহন বসু (১৮৬৭ - ১৮৯০), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭২ - ১৯০০), অমৃতলাল বসু (১৮৭৫ - ১৯২৮), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৭৭ - ১৯১২) এবং রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৭৫ - ১৮৯৩)। এই নাট্যকারদের নাট্যকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপন করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। মনোমোহন বসুর সৃষ্টি কর্মের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বাংলা নাটকে গীতাভিনয়ের তিনিই পথিকৃৎ। ইউরোপীয় আদর্শে মাইকেল-দীনবন্ধু যে নাট্যধারার সূচনা করেছিলেন বাংলা নাটকের আদিপর্বে মনোমোহন বসু সেখান থেকে সরে এসে প্রাচ্য আদর্শে নাটক রচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর এই সরে আসার পিছনে কি কারণ তা তিনি পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, সে কথাও আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। মনোমোহন বসুর এই প্রাচ্যরীতি সে কালে যে প্রশংসিত হয়েছিল তার প্রমাণ আমরা পাই সেকালের 'বান্ধব' পত্রিকার একটি লেখা থেকে। সেখানে লেখা হয়েছিল, "এ দেশের নাট্যকারগণ

দুই শ্রেণীতে বিভাজিত। এক শ্রেণীর নাম ইংরাজীনবিশ। আর এক শ্রেণীর নাম বাংলানবিশ। বাংলানবিশদের মধ্যে মনোমোহন বাবুই সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং আমরা এই জন্য বহুদিন হইতেই ইহার গুণ পক্ষপাতী।''[৬]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্য রচনার মূলত দু'টি ধারা। এক. ঐতিহাসিক, দুই. অনুবাদ। এছাড়া তিনি প্রহসন ও গীতিনাটক রচনা করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক প্রসঙ্গে অজিতকুমার ঘোষ মন্তব্য করেছেন, ''মাইকেল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' ঐতিহাসিক নাটক সমুহের পথ প্রদর্শণ করিয়াছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকের মধ্যে যে স্বাদেশিক ভাবোদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন ও অদৃষ্টপূর্ব।''[৭] এই 'স্বাদেশিক ভাবোদ্দীপনা'র পিছনে 'হিন্দুমেলা'র (১৮৬৭) ভূমিকার কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন, ''হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশ প্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন করিলে, হয়তো কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।''[৮] এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে নাটক রচনা করার সময় নিজের মতো করে তিনি তা প্রয়োগ করেছেন। এ কারণেই শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যকে মন্তব্য করতে হয়েছে— ''তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি একটি আধুনিক ভাব প্রকাশেরই বাহন হইয়াছে মাত্র, বস্তুনিষ্ঠা এবং ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনের দিক দিয়া ইহাদের প্রায় কোন মূল্যই নাই।''[৯] বাংলা নাট্যসাহিত্যে অমৃতলাল বসুর পরিচয় 'রসরাজ' হিসাবে। প্রহসন রচয়িতা রূপে পরিচিতি লাভ করলেও তিনি সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচনা করেছেন (হীরকচূর্ণ নাটক - ১৮৭৫)। এছাড়া সামাজিক বিষয় ('তরুবালা' - ১৮৯১, 'খাস-দখল - ১৯১২) এবং পৌরাণিক বিষয় ('যাজ্ঞসেনী' - ১৯২৮) নিয়েও তিনি নাটক রচনা করেছেন। ''অমৃতলাল বসু ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রয়াস কখনও করেন নাই।''[১০] বরং 'তিল তর্পন' (১৮৮১) নাটকে ইতিহাসের উপাদান নিয়ে নাটক লেখাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। ড: অরুণকুমার মিত্র লিখেছেন —

> বালক বয়স হইতেই অমৃতলালের মনোভাব শ্লেষাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল। মধূসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অনুকরণে তৎকালেই তিনি রচনা করিয়াছিলেন 'একেই কি বলে তোমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করা?' বিশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই 'মডেল স্কুল' প্রহসন রচনা করিয়া স্যার জন ক্যাম্বেলের শিক্ষা-পরিকল্পনাকেও করিয়াছিলেন বিদ্রূপ।[১১]

এই সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি বাংলা সাহিত্যের যে দুটি ধারা সে সময় প্রচলিত ছিল সেই দুটি ধারার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন—

> গিরিশচন্দ্রের যখন আবির্ভাব হয়, তখনও বাংলা নাট্য সাহিত্যের দুটি ধারা পরস্পর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিতেছিল— একটি গীতাভিনয়ের ধারা ও অপরটি ইংরাজী নাট্য সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব সৃষ্ট বাংলা নাটকের ধারা। পাশ্চাত্ত্য আদর্শে উদ্বুদ্ধ মাইকেল-দীনবন্ধু প্রবর্তিত ধারার সঙ্গে মনোমোহন বসু প্রমুখ নাট্যকারগণ প্রবর্তিত 'নূতন যাত্রা' বা গীতাভিনয়ের ধারাটির মধ্যে যোগস্থাপন করাই গিরিশচন্দ্রের জীবনের সর্বপ্রধান কীর্তি।[১২]

গিরিশচন্দ্র নানা শ্রেণীর নাটক রচনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে গীতিনাট্য, পৌরাণিক নাটক, সামাজিক নাটক ও ঐতিহাসিক নাটক। ঐতিহাসিক নাটক রচনা প্রসঙ্গে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন — " "ঐতিহাসিক নাটক" রচনায় ব্যর্থকাম হইয়া গিরিশচন্দ্র রাজকৃষ্ণ রায়ের অনুসরণে পৌরাণিক নাটক রচনায় হাত দিলেন।" [১৩] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গিরিশচন্দ্র ১৮৮৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের (১৮৩৬ - ৮৬) সংস্পর্শে আসেন। পরমহংসদেবের সান্নিধ্য লাভের পর থেকেই মূলত গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাশ্রিত নাটক রচনার সূচনা। ১৮৮৪ সালের পর রচিত নাটক গুলিতে রামকৃষ্ণের জীবনবাণীর প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়।

রাজকৃষ্ণ রায় প্রচুর নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনার ধারা মনোমোহন বসু প্রবর্তিত গীতাভিনয়ের ধারাকেই অনুসরণ করেছে। কিন্তু রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটক রচনা পৌরাণিক নাটক রচনাতেই স্ফূর্তি লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে অজিতকুমার ঘোষের মন্তব্য উদ্ধোরযোগ্য, "তিনি নানা ধরনের নাটক লিখলেও পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকেই তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের প্র চলিত কাহিনী অবলম্বন করিয়াই তিনি অধিকাংশ নাটক রচনা করিয়াছিলেন।"[১৪]

বিষয়বস্তু অনুসারে এই পর্বের (১৮৮১ - ১৮৯০) নাটকগুলির যে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে এখন সেই বিন্যাস অনুসারে নাটকগুলির আলোচনা করা যেতে পারে। এই আলোচনায় উঠে আসবে নাটকগুলির বিষয়বস্তুগত দিক ও আঙ্গিকগত দিক এবং এরই মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে রবীন্দ্রনাটকের সঙ্গে অন্যান্য নাটকের সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য।

ক. পৌরাণিক নাটক

'পার্থ পরাজয় নাটক'[১৫] (১৮৮১) - মনোমোহন বসু। পাঁচ অঙ্কের এই গদ্য নাটকটির নাম ছাপা হয়েছে এভাবে - 'পার্থ পরাজয় অর্থাৎ বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জ্জুনের পরাভব'। অর্জুনের অশ্বমেধের ঘোড়া বন্দী করেছিল চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহন। চিত্রাঙ্গদার অদেশে বভ্রুবাহন অর্জুনের কাছে নিজ পরিচয় দিয়ে ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে গেলে অর্জুন তাকে অপমান করে এবং বভ্রুবাহনকে নিজপুত্র ও চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে তার সম্পর্ককে অস্বীকার করে। এর ফলে অর্জুনের সঙ্গে বভ্রুবাহনের যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে অর্জুন পরাজয় বরণ করে। শেষে পিতা-পুত্রের মিলন হয়। এই কাহিনী নির্মাণের ক্ষেত্রে দৃশ্যপট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে মহাবন, প্রমীলা নগরী-উপবন, প্রমীলাপুরী-প্রমোদবন, বৃষ্ণদেশ, নগরের প্রান্ত, মণিপুর রাজন্ত:পুরী, মণিপুর-প্রান্তর, মণিপুর- পর্ব্বতোপরি অম্বিকার মন্দির, মণিপুর নগর, নগর বাহিরে ক্ষুদ্র পর্ব্বত—অপর দিগে বন, উপত্যকাভূমি, পর্ব্বতের পাদদেশ, হস্তিনাপুরী-কুন্তীদেবীর গৃহ, মণিপুর-রণস্থল। পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা 'পার্থ পরাজয়'-এ নাট্যকার মনোমোহন বসু কাহিনী বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ তাৎপর্য সৃষ্টি করতে পারেননি। নাটকে সঙ্গীতের প্রয়োগ রয়েছে। পুরাণাশ্রিত এই নাটকটি অবশ্য সাধারণ পৌরাণিক নাটকের মতো ভক্তিমূলক নয়।

'রামের বনবাস'[১৬] (১৮৮২) — রাজকৃষ্ণ রায়। 'রামের বনবাস' [পৌরাণিক ইতিবৃত্ত মূলক নাটক] পদ্যে লেখা পাঁচ অঙ্কের নাটক। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে লেখা এই নাটকটিতে কাহিনীগত দিক থেকে কোন বিশেষ মাত্রা যোগ হয়নি। দৃশ্যপট হিসেবে উঠে এসেছে রাজসভা, রাজপথ, রাজ্যোদান, সরযূতট, কক্ষ, মানস-সরোবর, রাজপ্রাসাদের ছাদ, রাজপ্রাসাদের সম্মুখ, রাজান্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ, উপবন, গঙ্গাতট পার্শ্বে নিবিড় অরণ্য। নাটকটিতে সঙ্গীতের প্রয়োগ রয়েছে। ১ম, ২য়, ৩য় এইভাবে প্রজা, ভৃত্য ও রমণী চরিত্রের উল্লেখ আছে। 'রাজপথ'-এর দৃশ্য আছে দু'টি। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য 'রাজপথ'। রামচন্দ্র রাজা হবেন পথে এই সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে। এখানে কয়েকজন ভৃত্য নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে যে রামচন্দ্র রাজা হলে তারা কে কি নেবে। যেমন—

১ম ভৃত্য। ... তুই কি নিবি?
২য় ,, । — টাকার তোড়া।
১ম ,, । — হুঁ ! আচ্ছা, তুই কি নিবি?
৩য় ,, । — শালের জোড়া।

১ম „ ।— বারে আরে এয়ার ছোঁড়া!

ভাল, ভাই, তুই কি নিবি?

৪র্থ „ ।— মোটা মোটা টাট্টু ঘোড়া।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটিও 'রাজপথ'। এই দৃশ্যে বাদ্য করতে করতে 'বাদ্যকারগণ' ও আনন্দ করতে করতে 'নাগরিকগণ' প্রবেশ করছে। রামচন্দ্র রাজা হবেন তারই জন্য এই আনন্দ-আয়োজন। এখানে মন্থরার সঙ্গে ভৃত্যদের কথোপকথনে সাধারণ মানুষের রঙ্গপ্রিয়তা প্রকাশ পেয়েছে—

মন্থরা ।— ওরে ও মিন্সে গুলো এগুনো কি?

১ম ভৃত্য ।— কিছু না — কিছু না।

মন্থরা ।— আমি কি কানা?

বল বলচি, দেখা বস্তা খুলে,

নৈলে গাল দেব বাপ তুলে।

২য় ভৃত্য ।— কুঁজ ভাঙবো এক কিলে।

'সীতার বনবাস'[১৭] (১৮৮২) —গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 'সীতার বনবাস' [পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য] চার অঙ্কের নাটক। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে লেখা। কাহিনীতে কোন বিশেষত্ব নেই। সঙ্গীতের প্রয়োগ রয়েছে। দৃশ্যপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে রাজসভা, অশোক-কানন, নদীর তীর, বাল্মীকির আশ্রম সংলগ্ন কুটীর, তপোবন, প্রান্তর, রণস্থল (বন), যজ্ঞস্থল।

'বৃষকেতু'[১৮] (১৮৮৪) —গিরিশচন্দ্র ঘোষ। এক অঙ্কের এই নাটকটির সংলাপ নির্মাণ হয়েছে গদ্যে ও পদ্যে। সঙ্গীতের প্রয়োগ রয়েছে। প্রচলিত দাতাকর্ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্যের মতে "নাটকটি বিশেষত্বহীন"।[১৯] দৃশ্যপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে রাজসভা ও রাজপথ। তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 'রাজপথ'। পথে নানাশ্রেণীর মানুষের চলাচল। রাস্তার চলমানতার প্রকাশ রয়েছে এই দৃশ্যে, কিন্তু তাঁর নাটকে পথ রবীন্দ্রনাটকের মতো কখনই প্রতীক হয়ে দেখা দেয় নি।

'যদুবংশ ধ্বংস'[২০] (১৮৮৪)—রাজকৃষ্ণ রায়। 'যদুবংশ ধ্বংস' [পৌরাণিক ইতিবৃত্ত মূলক নাটক] পাঁচ অঙ্কের নাটক। পদ্যে রচিত নাটকটিতে সঙ্গীতের প্রয়োগ রয়েছে। যদুবংশ ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কালপুরুষ ভাবছে এই বংশ কি ভাবে ধ্বংস করা যায়। একথা কালপুরুষ কৃষ্ণকে জানায় এবং এও জানায় যে এই বংশ বৃদ্ধির ফলে পৃথিবী পীড়িত হচ্ছে, এর প্রতিকার প্রয়োজন। কৃষ্ণ কালপুরুষের এই কথা স্বীকার করে নেয়। তার মনে হয় এতদিন সে মোহিনীমায়ায় মোহিত ছিল তাই এই সংকট বুঝতে পারে নি।

কালপুরুষের কথায় তার চেতনা হল —

পৃথিবীতে আর না রাখিব যদুকুল;
করিব নির্ম্মূল;
নিরাকুল করিব ধরারে।

এরপর কৃষ্ণ মায়াদেবীকে আদেশ দেয় দ্বারকাকে মায়াশূন্য করবার জন্য। এদিকে কৃষ্ণের মনে পড়ে যায় সতীর অভিশাপের কথা —

কৃষ্ণ তব চক্রের কৌশলে
পুত্রহীনা হ'য়ে কাঁদি আমি,
কিন্তু তুমি শোনো চক্রপাণি,
তব পুত্রপৌত্রগণ সহ
যদু বংশ হইবে নির্ম্মূল;
আত্মীয় বিয়োগ শোক জ্বালা
মোর মত তুমিও ভুঞ্জিবে।

আরেক দিকে কৃষ্ণের পুত্রদের পরিহাস সহ্য করতে না পেরে দুর্ব্বাসা অভিশাপ দেয়—''যদুবংশ- ধ্বংস সুনিশ্চয়''। এর পর কৃষ্ণের লীলায় যদুবংশে একে অপরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। কৃষ্ণের কাছে এ ''অনিবার্য নিয়তির গতি''। নিজেদের মধ্যে এই আত্মঘাতী যুদ্ধে সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। যদুবংশের সদস্যদের সৎকারের জন্য অর্জুনকে দায়িত্ব দিয়ে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ ধামে চলে যায়। এই 'অনিবার্য নিয়তির গতি'র কাছে কৃষ্ণের অসহায়ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। নাটকে দৃশ্যপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে পর্ব্বত, মায়াপুরী, অরণ্য, রাজপথ, গৃহ, যজ্ঞভূমি, উদ্যান, রাজপ্রাসাদের সম্মুখ, রাজসভা, দেবালয়, প্রভাসতীর্থ, শিবির ও অরণ্যপথ। রাজপথের দৃশ্য আছে ৬টি ও অরণ্যপথের দৃশ্য ১টি। পথ কোন প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত না হলেও সাধারণ মানুষের পদসঞ্চালনে এই সব পথদৃশ্য মুখরিত। যেমন - প্রথম অংকের চতুর্থ দৃশ্যে দৃশ্যপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে 'রাজপথ'। এই পথে যদুবংশীয় নাগরিকগণ উপস্থিত। দ্বারকা নগরীতে যে অমঙ্গল দেখা দিয়েছে সেই অমঙ্গলের কথাই 'নাগরিকগণ' আলোচনা করছে। দ্বারকা নগরীর এই বিপদের কথা আলোচিত হয়েছে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে। এখানেও দৃশ্যপট 'রাজপথ'। দু'জন রাজভৃত্যের আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে দ্বারকা নগরীর বিপদের কথা। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি 'রাজপথ'। একজন মৎস্যজীবী তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে। এই সংলাপে সাধারণ মানুষের রঙ্গপ্রিয়তা প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণ হিসেবে সংলাপের কিছু

অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে —

পত্নী । — আমার, মিন্সে, পোড়ার মুখো,
বড় যে দিচ্চিস খোটা?
মারবো মুখে মুড়ো ঝাঁটা।
এই নে তোর মাছের ঝুড়ি,
এই আমি চলনু বাড়ী;
হাটে যদি যাই,
তো তোর মাথা খাই!

মৎস্যজীবী। —দোহাই —দোহাই!
বৌ তোর পায়ে পড়ি, যাসনে বাড়ী,
তুলেনে মাছের ঝুড়ি।

পত্নী । —কোন্ বেটী আর হাটে যা'বে,
কোন্ শালী তোর ভাত বা খা'বে।

মৎস্যজীবী। —ও বাবা! এত রাগ।
মাগী যেন মদ্দা বাঘ!...

'তরণীসেন বধ'[২১] (১৮৮৪) —রাজকৃষ্ণ রায়। 'তরণীসেন বধ' [পৌরাণিক ইতিবৃত্ত মূলক নাটক] পদ্যে লেখা পাঁচ অঙ্কের নাটক। এতে প্রচুর গান রয়েছে। কাহিনী রামায়ণ থেকে গৃহীত। তরণী সেন বিভীষণের পুত্র। বিভীষণ ও তরণী দুজনেই রামভক্ত। সীতা উদ্ধারের সময় তরণী সেনের সঙ্গে রামের যুদ্ধ হয়। তরণী সেন রামের শরাঘাতে মৃত্যুবরণ করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। ব্রহ্মার আদেশে মায়াদেবী বিভীষণের অন্তর থেকে পুত্র স্নেহ হরণ করে নেয়। রাম প্রথমে দ্বিধাগ্রস্থ থাকলেও পরে তরণী সেনকে বধ করে। কাহিনীর মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই। দৃশ্যপট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সমুদ্র, কক্ষ, অশোকবন, উদ্যান, অরণ্য, শিবমন্দির, রাজসভা, দুর্গসম্মুখ, রাজপ্রাসাদ-সম্মুখ, সমুদ্র তটে শিবির, যুদ্ধক্ষেত্র।

'নল-দময়ন্তী'[২২] (১৮৮৭)—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 'নল-দময়ন্তী' [পৌরাণিক নাটক] পদ্যে লেখা চার অঙ্কের নাটক। সংগীতের প্রয়োগ রয়েছে। বিদূষকের সংলাপে কখনো কখনো এসেছে গদ্যভাষা। যেমন —

মহাশয়, না হয় একটু হাসলেন, — না হয় দু'দন্ড লোকালয়ে বসলেন; —

মনের কপাট না হয় খানিক খুল্লেন। বলি, মহাশয়, হাসতে কি দিব্যি দেওয়া আছে? (দ্বিতীয় অঙ্ক/ প্রথম গর্ভাঙ্ক)

নল-দময়ন্তীর আখ্যান ব্যাসদেব রচিত মহাভারতের বনপর্বে বিবৃত হয়েছে। নল (নিষধরাজ) বিদর্ভ রাজকন্যা দময়ন্তীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্যদিকে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কলি সবাই দময়ন্তীর প্রতি অনুরক্ত। তারা সয়ম্বর সভায় নলকে যোগ দিতে নিষেধ করে। কিন্তু নল তাদের কথা না শুনে সয়ম্বর সভায় যোগ দেয়। এদিকে অন্য সবাই নলের ছদ্মবেশ ধারণ করে সয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়। কিন্তু দমনয়ন্তী আসল নলকে চিনতে পারে এবং তার গলায় মালা পরায়। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, এবং যম নলকে বর প্রদান করে। কিন্তু কলি এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মায়াজাল সৃষ্টি ক'রে নলের ভাই পুষ্করের সঙ্গে নলের পাশা খেলার আয়োজন করে। খেলায় নল তার রাজ্য হারায় এবং দময়ন্তী সহ রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়। কলির তবুও মন ভরে না, একসময় ছলনার মাধ্যমে নলকে দময়ন্তীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত অনেক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে নল ও দময়ন্তী পুনরায় মিলিত হয় এবং নল তার রাজ্য ফিরে পায়।

'নল-দময়ন্তী' প্রসঙ্গে শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন—

> গিরিশচন্দ্রের বহু পূর্ব থেকে 'নল-দময়ন্তী' যাত্রা পালার প্রচলন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন: কালিয় দমন, বিদ্যাসুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রার আমোদ আছে কিন্তু তত্ত্বাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত উপায়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহাতে আমোদ-প্রমত্ত ইতরলোক ব্যতীত ভদ্রসমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না। [সংবাদ প্রভাকর; ২৮ জুন, ১৮৪৮] এর থেকে বোঝা যায় 'নলোপাখ্যান' যাত্রা নিম্নরুচির ছিল।... গিরিশচন্দ্রের নাটক নলবৃত্তান্ত-ধারার শ্রেষ্ঠ নাটক।"[২৬]

এই নাটকে দৃশ্যপট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে উপবন, প্রাঙ্গন, কক্ষ, রাজপথ, নগর-প্রান্তর, কানন, বন ও রাজবাটীর সম্মুখ। এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্কে দৃশ্যপট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 'রাজপথ'। নল রাজ্যচ্যুত হওয়ার পর বিদূষক নলের জন্য খাবার নিয়ে যাওয়ার সময় এই পথে রক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে। তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চম গর্ভাঙ্কে দৃশ্যপটটি 'চেদিনগর রাজবাটীর সম্মুখ'। রাজবাটীর সম্মুখ কারণেই দৃশ্যটি পথে সংঘটিত হচ্ছে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই দৃশ্যে প্রথমে দেখা যায় দময়ন্তী উন্মাদিনী হয়ে স্বামীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। রাজমাতা প্রাসাদের উপর থেকে দময়ন্তীকে দেখাত পেয়ে তাকে প্রাসাদে ডেকে নিয়ে যান। এর কিছুক্ষণ পর দেখা যায় বিদূষকে। বিদূষক কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে নল রাজাকে খুঁজতে খুঁজতে চেদিনগরের এই রাজবাটীর সম্মুখে চলে এসেছে। এই দৃশ্যে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি রয়েছে।

এই সাধারণ মানুষের প্রকৃতি রবীন্দ্রনাটকের সাধারণ মানুষের কাছাকাছি।

'দক্ষ-যজ্ঞ'[২৪] (১৮৮৯) —গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 'দক্ষ-যজ্ঞ' [পৌরাণিক নাটক] পদ্যে লেখা চার অঙ্কের নাটক। শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য এর কাহিনী প্রসঙ্গে লিখেছেন, '' 'শিবপুরাণ' বা 'দেবীভাগবত' থেকে গিরিশচন্দ্র 'দক্ষ-যজ্ঞ' নাটকের আখ্যান গ্রহণ করেছেন।''[২৫] আবার আশুতোষ ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে পোষণ করেছেন ভিন্নমত। তাঁর মতে, ''এই কাহিনী রচনায় গিরিশচন্দ্র বিশেষ কোন পুরাণকে অবলম্বন করিবার পরিবর্তে প্রচলিত কথকতাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।''[২৬] যেখান থেকেই কাহিনী গ্রহণ করা হোক না কেন এই নাটকের কাহিনীতে কোন বিশেষত্ব প্রকাশ পায় নি। দৃশ্যপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে - কানন, উদ্যান, কক্ষ, উদ্যানস্থ বিল্বমূল, কৈলাসপুরী। নাটকটিতে সঙ্গীতের প্রয়োগ আছে।

খ. **প্রহসন**

'তিল তর্পণ নাটক'[২৭] (১৮৮১)—অমৃতলাল বসু। 'তিল তর্পণ' দুই অঙ্কের ছোট নাটক। গদ্যে লেখা এই প্রহসনটিতে গানের প্রয়োগ আছে। নাটকের শুরুতে 'পূর্বদৃশ্য' রয়েছে। 'পূর্বদৃশ্য - নাটকশালা'। এই দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে একটি অপেরা দলের ম্যানেজার, অপেরা মাস্টার এবং কয়েকজন অভিনেতা মিলে একটি নাটক অভিনয়ের পরিকল্পনা করছে। এই পরিকল্পনার সময় সেখানে একজন নাট্যকার উপস্থিত হয়ে তার লেখা 'তিল তর্পণ' নাটকটি অভিনয় করার জন্য অনুরোধ করে। সকলে তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে 'তিল তর্পণ' অভিনয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঐতিহাসিক নাটককে ব্যঙ্গ করে এই প্রহসনের কাহিনী নির্মাণ করা হয়েছে। চিতোরের রাজা বাপ্পা রাও-এর কণ্যা হিমাঙ্গিনী একজন মালীর প্রেমে পড়ে এবং বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। এদিকে বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁ চিতোর আক্রমণ করতে এসেছে। হিমাঙ্গিনী ও মালী পালিয়ে গিয়ে আলিবর্দি খাঁর শিবিরে আশ্রয় নেয়। শেষে স্বর্গ থেকে নারদ এসে কণ্যাহারা বাপ্পা রাওকে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে, মালী একজন শাপভ্রষ্ট রাজপুত্র। ড: অরুণকুমার মিত্র এই নাটকটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> তৎকালীন ঐতিহাসিক নাটকের কালাতিক্রমণকেই শুধু ব্যঙ্গ করিয়া অমৃতলাল ক্ষান্ত হন নাই। ইতিহাসকে পুরাণের পথে টানিয়া সহসা নারদের শেষ উক্তিতে তাহাকে রূপকথায় পরিণত করিয়া তিনি ঐতিহাসিক নাট্য রচয়িতাদের যথেচ্ছ কল্পনার প্রতি চরম বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন।[২৮]

শেরিডানের 'দি ক্রিটিক' থেকে গৃহীত 'তিল তর্পন'-এর কাহিনী নির্মাণে দৃশ্যপট হিসাবে দেখা দিয়েছে রাজ-অন্তপুর, রাজবাটীর সংলগ্ন উদ্যান, চিতোরের গড়ের মাঠ, শিবির, রঙ্গমঞ্চ (ক্রোড়াঙ্ক) ও রাজবাটী।

'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে' (১৮৮৪)—অমৃতলাল বসু। 'Cox and Box' এবং 'Box and Cox' নামক দুটি ইংরেজী প্রহসন অবলম্বনে 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে' রচিত। একটি মাত্র দৃশ্যের এই প্রহসনটিতে কোন গান নেই। এর কাহিনী হচ্ছে চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে একই ঘর ভাড়া নেবার পর দু'জনের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। জানা যায় বাঁড়ুজ্যের পরিত্যাক্তা পাত্রী দিগম্বরীকে বিয়ে করছে চাটুজ্যে। এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে বিরোধ। বাঁড়ুজ্যে প্রমাণ করতে চায় চাটুজ্যে দিগম্বরীর পাত্র, আবার অন্যদিকে চাটুজ্যে প্রমাণ করতে চায় বাঁড়ুজ্যে দিগম্বরীর পাত্র। এই জটিলতার মাঝে দু'জনেই দিগম্বরীকে পরিত্যাগ করতে চায়। শেষে যখন জানা গেল দিগম্বরীর অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়েছে তখন দু'জনেই এই সংকট থেকে মুক্তি পেল এবং দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হল।

'বিবাহ বিভ্রাট'[২৯] (১৮৮৪) —অমৃতলাল বসু। 'বিবাহ বিভ্রাট' (সামাজিক নাট্যলীলা, A society comedieta, In two Acts, ১২৯১ সালে স্টার থিয়েটারে অভিনীত।) গদ্যে লেখা দুই অঙ্কের প্রহসন। গানের সংখ্যা কম। সে সময়কার যৌতুক প্রথা এবং নব্য সাহেবিআনাকে কশাঘাত করা হয়েছে এই প্রহসনে। গোপীনাথ সরকারের ছেলে নন্দলাল সরকার লেখাপড়া শিখে সাহেবিআনা ধরেছে। গোপীনাথ অনেক টাকা যৌতুকের বিনিময়ে ছেলের বিয়ে ঠিক করেছে। যৌতুকের সম্পূর্ণ টাকা নিয়ে ছেলে বিয়ের রাতে বাসর ঘর থেকে পালিয়ে যায়। ছেলের বাসনা বিলেতে গিয়ে লেখাপড়া শিখবে। এই হচ্ছে 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এর কাহিনী। এই প্রহসনটি সম্পর্কে ড: অরুণকুমার মিত্র মন্তব্য করেছেন—

> ১৮৮৪ সনে মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের কয়েকটি বাস্তব সমস্যাকে জ্বলন্ত নাট্যরূপ দিলেন অমৃতলাল তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রহসন 'বিবাহ বিভ্রাটে'।... মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজে বরপণের নৃশংস বর্বরতা, বেপরোয়া স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং জাতীয়তা বিসর্জন দিয়া সাহেব সাজিবার উৎকট আগ্রহ এখানে নির্মম ব্যঙ্গে কশাঘাত হইয়াছে।[৩০]

'বিবাহ বিভ্রাট' প্রহসনটি সে সময় ভীষণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এ প্রসঙ্গে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার যোগেশচন্দ্র বসুর একটি লেখার কথা উল্লেখ করেছেন ড: অরুণকুমার মিত্র। আমরা সেখান থেকে উদ্ধৃত করছি—" 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র তুলনা নাই, ইহার দাম হওয়া উচিত এক আনা, আর 'ধারাপাত' 'বর্ণপরিচয়ে'র মত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ইহার অবাধ প্রবেশ থাকা একান্ত আবশ্যক।"[৩১]

'হঠাৎ নবাব'[৩২] (১৮৮৪)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই প্রহসনটির শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে, ''প্রসিদ্ধ ফরাসী প্রহসন-কার মলিয়ের প্রণীত 'লে বুর্জোয়া জাঁতিয়ম' নামক প্রহসন হইতে শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক নামান্তরিত স্বাধীন অনুবাদ।'' গদ্যে লেখা পাঁচ অঙ্কের প্রহসনটিতে সঙ্গীতের প্রয়োগ রয়েছে। জুর্দ্দন খাঁ একজন অশিক্ষিত লোক। হঠাৎ করে সে বড়লোক হয়ে যায়। একজন অশিক্ষিত লোকের হঠাৎ বড়লোক হওয়ার বিড়ম্বনা নিয়ে এই প্রহসনের কাহিনী নির্মাণ হয়েছে।

এই প্রহসনটিতে কোন দৃশ্যপটের উল্লেখ নেই। কিছু কিছু দৃশ্য একেবারেই ছোট, শুধুমাত্র দু'একটি সংলাপ রয়েছে। যেমন ২য় অঙ্ক-২য় দৃশ্য, ২য় অঙ্ক-৫ম দৃশ্য। এছাড়া ২য় অঙ্কের ১০ম দৃশ্যে কোন সংলাপ নেই, শুধু উল্লেখ করা হয়েছে —

(নৃত্যকারীগণের দ্বিতীয়বার প্রবেশ)

(চারিজন কারিকর নাচিতে নাচিতে জুর্দ্দনের জয় জয়াকার করিতে লাগিল)।

মলিয়ের থেকে 'হঠাৎ নবাব' অনুবাদ প্রসঙ্গে অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন—''অনুবাদ অবিকল ভাবে মূল নাটকের অনুসরণ করিয়াছে, সে জন্য একমাত্র ভাষা ব্যতীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিকতা কিছুই নাই।''[৩৩] মলিয়েরের (Jean Baptiste poquelin) 'বুর্জোয়া জাঁতিয়ম' (Le Bourgeois gentihomme - 1670) অনুবাদের মাধ্যমেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদ জগতে পদচারণা শুরু হয়। 'হঠাৎ নবাব'-এর বিষয়বস্তু স্মরণ করিয়ে দেয় উনবিংশ শতাব্দীর নব্যবাবুয়ানাকে।

'বেল্লিক বাজার'[৩৪] (১৮৮৭)—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 'বেল্লিক বাজার' [বড় দিনের পঞ্চরং] আটটি দৃশ্যের গদ্যে লেখা প্রহসন। এই প্রহসনটিতে নব্যবাবুয়ানা ও ইংরেজদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। প্রহসনটি সম্পর্কে শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

> প্রতিবছর বড়দিনের সময় এই ধরণের 'পঞ্চরং' গিরিশচন্দ্রকে লিখতে হত। 'বড়দিনের বখশিশ', 'পাঁচ কনে' প্রভৃতি নকশাগুলি তার দৃষ্টান্ত। এটি উঁচু দরের প্রহসন নয়, মধুসূদন বা দীনবন্ধুর মতো ব্যঙ্গ সৃষ্টির প্রতিভা গিরিশচন্দ্রের ছিল না। সাধারণ দর্শকদের রুচি তৃপ্তিকারী রঙ্গরসের নাটক।... রচনাটি বিদ্রূপাত্মক নকশাধর্মী ঈষৎ 'হুতোম' প্রভাবিত।... পূর্বের যাত্রার কালুয়া-ভুলুয়া, মেথর-মেথরানীর সঙের অনুসরণ বেল্লিক বাজারে আছে।[৩৫]

দৃশ্যপট হিসেবে প্রহসনটিতে ব্যবহৃত হয়েছে, নিমতলার ঘাট, কক্ষ, রঙ্গপট, উঠান, রাজপথ ও উদ্যান - মধ্যস্থ কক্ষ। সপ্তম দৃশ্যটি 'রাজপথ'। এই দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে বড়দিনের উৎসব করতে পথে বেরিয়েছে মানুষ।

'দাদা ও আমি'[৩৬] (১৮৮৮) — উপেন্দ্রনাথ দাস। 'দাদা ও আমি'র বিজ্ঞাপনে পাঠকদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে—

> "প্রহসন" স্বরূপে কল্পিত ও আরব্ধ হয়। যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতেও এমন কিছুই নাই "বিকাল বেলার জল খাবার" বলিলেও অত্যুক্তি হইবে কিনা, জানি না। ইহা পাঠে বা দর্শনে আপনার ওষ্ঠ প্রান্তে যদি একবার মাত্রও স্মিতের রেখা মাত্রও উদিত হয়, অন্তরের সহিত আহ্লাদিত হইব।

উপেন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডে থাকার সময় 'ব্রাদার জিল অ্যান্ড আই' প্রহসন অবলম্বনে 'দাদা ও আমি' রচনা করেন। ধীরেন্দ্রকুমার ও অনন্তকুমার দুই ভাই-এর মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। এই দু'জনের বিয়ের বিষয় নিয়ে 'দাদা ও আমি' প্রহসনটির কাহিনী নির্মাণ হয়েছে। এতে শুধুই হাস্যরস পরিবেশন করা হয়েছে।

'তাজ্জব ব্যাপার'[৩৭] (১৮৯০) —অমৃতলাল বসু। 'তাজ্জব ব্যাপার' (হাস্যরসোদ্দীপক সাময়িক গীতিরঙ্গ) সাতটি দৃশ্যে গদ্যে লেখা প্রহসন। সঙ্গীতের প্রয়োগ আছে। শুরুতেই প্রস্তবনা অংশে বঙ্গনারীগণ গান গাইছে - "ফটকে আটক রবনা/ আপন করে যতন করে খুলে দেছ ডানা।" নারী স্বাধীনতাকে ব্যঙ্গ করে এই প্রহসনটির কাহিনী গড়ে উঠেছে। দৃশ্যপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে - বিবাহ সভা, দরদালান, ছাঁদনা তলা, রাস্তা, সভাগৃহ, গড়ের মাঠ। চতুর্থ দৃশ্য 'রাস্তা'। এই রাস্তায় বিভিন্ন মানুষের চলাচল। যেমন রাস্তায় রয়েছে কয়েকজন স্ত্রীলোক, দু'জন উড়ে, কয়েকজন পাণ্ডা ও সাধারণ মানুষ।

গ. গীতাভিনয়

গীতাভিনয়ের সূচনা করেছিলেন মনোমোহন বসু একথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি এবং মনোমোহন বসুর গীতাভিনয় রচনার পিছনে কিসের প্রেরণা কাজ করেছিল সে কথাও আমরা উল্লেখ করেছি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই গীতাভিনয়ের ধারায় কয়েকটি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য গিরিশচন্দ্রের গীতিনাট্য রচনার পিছনে Dramatic Performances Control Bill-এর ভূমিকা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর এই মন্তব্যটি উদ্ধার যোগ্য—

> ১৮৭৬ সালের 'গজদানন্দ' অভিনয়ের অপ্রীতিকর ঘটনা ও গ্রেফতার পর্বের পর গভর্নমেন্ট নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল পাশ করার চেষ্টা করেন ও একটি সিলেক্ট কমিটি গঠন করেন। ঐ সিলেক্ট কমিটি বিলটির সমর্থনে মত প্রকাশ করেন।

> ১৮৭৬ সালের ২৫ মার্চ তারিখে বিলটি 'ইন্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত হয়। নানা প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ সত্ত্বেও গভর্নর জেনারেল ১৮৭৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর তারিখে Dramatic Performances Control Bill পাশে সম্মতি দান করেন। পুলিশের অনুমতির প্রয়োজন বোধে মৌলিক নাট্য রচনার উৎসাহ কমে গিয়েছিল। 'গীতিনাট্য' ধরনের নাট্য রচনায় কোন ঝুঁকি নেবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। সে জন্যই গিরিশচন্দ্র গীতিনাট্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন।[৩৮]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৮৮১ থেকে ১৮৮৪-এর মধ্যে তিনটি গীতিনাট্য রচনা করেন। 'মায়াতরু' (১৮৮১), 'ব্রজবিহার' (১৮৮৩), 'হীরার ফুল' (১৮৮৪)।[৩৯] এই তিনটি গীতিনাট্যই অভিনীত হয়। 'মায়াতরু' প্রথম অভিনীত হয় ২৫ জুন ১৮৮১, 'ব্রজবিহার' ১লা এপ্রিল ১৮৮২ (গ্রন্থ প্রকাশের এক বছর পূর্বেই নাটকটি অভিনীত হয়েছিল), 'হীরার ফুল' প্রথম অভিনয় ২৬ এপ্রিল ১৮৮৪। গীতিনাট্য রচনায় গিরিশচন্দ্র তেমন দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি। কাহিনী বিন্যাসের ক্ষেত্রেও তেমন কোন নতুনত্ব নেই। 'মায়াতরু' তিনটি দৃশ্যের ছোট নাটিকা। গীতিনাট্য হলেও সম্পূর্ণ সংলাপ গদ্যে রচিত হয়েছে। সংলাপের মাঝে মাঝে এসেছে সঙ্গীতের প্রয়োগ। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা অবলম্বনে 'ব্রজবিহার'-এর কাহিনী নির্মাণ হয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য 'ব্রজবিহার'কে '' 'ইতালীয় অপেরা' জাতীয় গীতিনাট্য''[৪০] বলে উল্লেখ করেছেন। একই মন্তব্য করেছেন শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য ''গীত সর্বস্ব নাটক বা 'অপেরা' খানি 'ইটালিয়ান অপেরার' মতোই।''[৪১] 'হীরার ফুল' এক অঙ্কের গীতিনাট্য। মদন ও রতির কাহিনী নিয়ে এই গীতি নাট্য নির্মাণ হয়েছে। কাহিনীতে কোন বিশেষত্ব নেই।

'আশালতা'[৪২] (১৮৮৮)—রাধানাথ মিত্র। 'আশালতা' তিন অঙ্কের গীতিনাট্য। সংলাপ নির্মাণ হয়েছে পদ্যে। নাটকের শুরুতেই 'প্রস্তাবনা' অংশে দেখা যায় অপ্সরীগণ গান গাইছে ''প্রেম নিকেতন, এ বিশ্ব-ভূবন, /প্রেমিক বিনা কে জানে প্রেম কি অমূল্য ধন... ।'' অপ্সরীগণের এই গান মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের মায়াকুমারীগণের গানকে। 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যটিও শুরু হয়েছে মায়াকুমারী গণের গানের মধ্য দিয়ে। দুটি নাটকের বিষয় বস্তু প্রেম হলেও প্রেমের প্রকাশ রীতিতে দুটি নাটকের দুই প্রান্তে অবস্থান। রুদ্রদ্বীপের অধীশ্বর ভূপতি, কৃষক শিশুপালের পালিত কন্যা প্রতিভা এবং উগ্রদ্বীপাধিপতির পুত্র প্রফুল্লের কাহিনী 'আশালতা'। ভূপতি বিয়ে করতে চায় প্রতিভাকে কিন্তু প্রতিভা ও প্রফুল্ল একে অন্যকে ভালবাসে। এক সময় দেশে যুদ্ধ শুরু হলে প্রফুল্ল ও প্রতিভা গোপনে মিলিত হয়। এই মিলনের কথা শুনে ভূপতি প্রফুল্লকে হত্যার আদেশ দেয়। প্রফুল্লকে হত্যা করতে নিয়ে যাওয়ার সময় দেবী প্রজাপতির আবির্ভাব হয়। প্রজাপতি নির্দেশ দেয় এই হত্যাকান্ড বন্ধ করে প্রতিভার

সঙ্গে প্রফুল্লর বিয়ে দেবার জন্য। ''কারণ যে যাহারে ভালবাসে সে থাকিবে তাহার পাশে, ...'' (৩য় অঙ্ক/ ১ম দৃশ্য)। ভূপতি প্রজাপতির নির্দেশ মেনে নেয়। এরপর প্রজাপতির মুখে প্রফুল্লর পরিচয় জানা যায়। ভূপতির বন্ধু উগ্রদ্বীপাধিপতির একমাত্র পুত্র প্রফুল্ল। প্রফুল্ল বনিকের কন্যা প্রতিভার প্রেমে পড়ে। বনিকের কন্যা কারণেই প্রফুল্লের পিতা এ প্রণয়ে বাধা দেয় এবং প্রতিভাকে দেশান্তরে পাঠিয়ে দেয়। এর ফলে প্রফুল্লও দেশান্তরী হয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রফুল্ল ও প্রতিভার মিলন হয়।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে রবীন্দ্র-কাহিনীকাব্য গুলির সঙ্গে এক ধরণের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। নাটকের শেষ দৃশ্যে পুনরায় 'অপ্সরীগণের' আবির্ভাব হয়। এই অপ্সরীগণের গানের সঙ্গে 'মায়ার খেলা' - এর প্রথম দৃশ্যের মায়াকুমারীগণের গান যেন মিলে যেতে চায়। অপ্সরীগণ গাইছে—

মিলাই প্রেমিক জনে সুসময় হেরিয়ে।
প্রেম-ভরে প্রেম-সরে দেই দোঁহে ডুবায়ে।
রবি সহ কমলিনী
শশী সহ কুমদিনী,
তরু সহ লতিকায় দিই সদা মিলায়ে।
কুসুমের হিয়া খুলে, বসাই মধুপকুলে,
সুরভি সমীর অঙ্গে দিই প্রেমে ঢালিয়ে
নির্ঝরের বারিবিন্দু, ল'য়ে যাই যথা সিন্ধু
অপার প্রেমের নীরে দিই সদা মিলায়ে। (৩য় অঙ্ক/ ২য় দৃশ্য)

মায়াকুমারীগণ অবশ্য মায়াজাল গাঁথার কথা বলছে, ''মোরা জলে স্থলে কতছলে মায়াজাল গাঁথি।'' এই মায়াজাল প্রেমেরই মায়াজাল, দুটি হৃদয়কে বাঁধার মায়াজাল ''নরনারী-হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে''। অপ্সরীগণও প্রায় একই কথা বলছে, ''মিলাই প্রেমিক জনে সুসময় হেরিয়ে''। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাচ্ছে যে দু'টি গানের বক্তব্য যেন মিলে যেতে চায়। লক্ষ করবার বিষয় 'আশালতা' এবং 'মায়ার খেলা'র প্রকাশকাল ১৮৮৮। তবে এই সাদৃশ্যের আভাস দ্বারা প্রমাণের অবকাশ থাকে না যে দু'টি নাটক একই মাত্রাপ্রাপ্ত হয়েছে। 'মায়ারখেলা'র বিষয়বস্তু ভিন্ন মাত্রায় উজ্জ্বল।

'নব-বাসর'[৪৩] (১৮৮৮)—রাধানাথ মিত্র। 'নব-বাসর' [বৈকুণ্ঠ মিলন] তিন অঙ্কের নাটিকা। সংলাপ রচিত হয়েছে পদ্যে। সঙ্গীতের প্রয়োগ রয়েছে। রাধাকৃষ্ণের মিলনের বিষয় নিয়ে এর কাহিনী নির্মাণ হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে দ্বারকায় চলে গেছে। দ্বারকার রাজা হিসেবে কৃষ্ণের অভিষেক হবে।

এই অভিষেকের দিন বৃন্দাবনবাসী ও রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন হয়। রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় মিলন হয় বলে এই নাটকের নামকরণ হয়েছে 'নব-বাসর'। 'নব-বাসর'-এ দৃশ্যপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বৃন্দাবনের রাজপথ, বৃন্দাবন যমুনা-পুলিন, নন্দালয়, পার্ব্বতীয় পথ, দ্বারকার রাজবাটী, প্রভাসের প্রথম তোরণ, প্রমোদ-উদ্যান, গোলকধাম। 'বৃন্দাবনের রাজপথ' দৃশ্যে বৃন্দাবনবাসীর উপস্থিতিতে পথ মুখরিত।

ঘ. সামাজিক নাটক

'আনন্দময় নাটক'[৪৪] (১৮৯০)— মনোমোহন বসু। পাঁচ অংকের এই নাটকটিতে সঙ্গীতের প্রয়োগ রয়েছে। এর কাহিনী হচ্ছে, হাঁসপুরের জমিদার আনন্দময় চৌধুরীর পুত্র ভূষণবাবু স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দূরদেশে থাকেন। মায়ের মৃত্যুর পর পিতাকে দেখার জন্য তিনি দেশে ফিরছিলেন। কান্তচন্দ্র মিত্র আনন্দময়বাবুর সর্বাধ্যক্ষ । আনন্দময়বাবুর ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে তিনি তার বিষয়-সম্পত্তি আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছিলেন। ভূষণবাবু স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দেশে ফিরছেন শুনে তিনি ডাকাত দিয়ে তাদের নৌকার উপর হামলা চালান। এতে মা, বাবা ও ছেলে তিনদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ভূষণবাবুর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তিনি হাঁসপুরের ঘাটে এসে ওঠেন। এখানে তিনি একজনের বাড়িতে আশ্রয় পান। যথা সময়ে তিনি ছেলে সন্তান প্রসব করেন এবং কান্তচন্দ্রের স্ত্রী একই দিনে কন্যা সন্তান প্রসব করেন। ধাই-এর কারসাজিতে দু'জনের সন্তান বদল হয়। কারণ কান্তচন্দ্রের স্ত্রী এর আগে সবগুলি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। এর জন্য কান্তচন্দ্র স্ত্রীর উপর ক্ষিপ্ত। এবারও যদি কন্যাসন্তান জন্ম গ্রহণ করে তবে কান্তচন্দ্র স্ত্রীর উপর নির্যাতন করবেন। এই কারণেই এই সন্তান বদল করা হয়। ভূষণ বাবুর স্ত্রী সন্তান বদলের কথা জানতেন। পরিস্থিতির কারণে তাকে সব সহ্য করতে হয়। শেষপর্যন্ত অনেক বিপর্যয়ের মধ্যদিয়ে নাটকের শেষে ভূষণবাবু ও তার স্ত্রী-পুত্রের মিলন হয় এবং আনন্দময়বাবু তার ছেলে, ছেলে বউ ও নাতীকে ফিরে পান। কান্তচন্দ্র তার ভুল বুঝতে পেরে আনন্দময়বাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করেন।

'আনন্দময় নাটক'কে পুরোপুরি সামাজিক নাটক বলা যায় না। আমাদের একথার সমর্থন মেলে অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীলের লেখায়। তাঁর মতে, ''সামাজিক নাটক না বলিয়া পারিবারিক রোমান্স বলা যায়। 'আনন্দময়' নাটকের উপর সমাজশক্তির প্রভাব কিছুই নাই।... 'আনন্দময়' নাটকে দৈব দুর্ঘটনা, সন্ন্যাসীর কৃপা, ভৈরবীর সহায়তা ইত্যাদিই ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে।''[৪৫]

'হারানিধি'[৪৬] (১৮৯০)—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 'হারানিধি' পাঁচ অঙ্কের গদ্যে লেখা সামাজিক নাটক।

কাহিনীতে তৎকালীন নব্যবাবুয়ানার ছবি ফুটে উঠেছে। মোহিনীমোহন ও হরিশ বাল্যকালের বন্ধু। কিন্তু সম্পত্তির লোভে মোহিনীমোহন এক সময় হরিশের সমস্ত সম্পত্তি দখল করে তাকে মিথ্যে মামলায় আসামী করে। কাহিনীর শেষে গিয়ে মোহিনীমোহন তার ভুল বুঝতে পারে, হরিশ তার সম্পত্তি ফিরে পায় এবং দুই বন্ধুর মিলন হয়। নাটকটিতে সঙ্গীতের প্রয়োগ আছে। দৃশ্যপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বৈঠকখানা, রাস্তা, কক্ষ, বাড়ির সম্মুখ, পথ, হাবড়ার পুলের ধার, কুটীর পার্শ্বে জঙ্গল, খিড়কির বাগান, বাড়ির ছাদ, কক্ষ-পার্শ্বের রাস্তা, উকিলের অফিস।

ঙ. ঐতিহাসিক নাটক

'স্বপ্নময়ী নাটক'[৪৭] (১৮৮২)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'স্বপ্নময়ী নাটক'-এ সময় হিসেবে আরংজীবের রাজত্বকালকে দেখানো হয়েছে। ঐতিহাসিক মূল ঘটনা শুভ সিংহের বিদ্রোহ। পাঁচ অংকের এই নাটকটি গদ্যে লেখা। নাটকে উনিশটি গান ব্যবহার করা হয়েছে। এই উনিশটি গানের মধ্যে পনেরোটিই রবীন্দ্রনাথের লেখা। এ প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন—

> নাটকে ব্যবহৃত মোট উনিশটি গানের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যাই পনেরোটি। তাছাড়া হিন্দুমেলার একাদশ অধিবেশন উপলক্ষে রচিত তাঁর 'দিল্লী দরবার' কবিতাটি কিছু পরিবর্তিত আকারে শুভ সিংহের স্বগতোক্তিরূপে চতুর্থ অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।[৪৮]

'স্বপ্নময়ী'র কাহিনী হচ্ছে, চিতোয়া ও বর্দ্দার তালুকদার শুভসিংহ তার অনুচর সূরজমল-এর প্ররোচনায় দেবতার ছদ্মবেশ ধারণ করে। এই ছদ্মবেশ ধারণ করার কারণ সাধারণ মানুষদের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের বিদ্রোহী করে তোলা এবং দেশকে মোঘলদের হাত থেকে উদ্ধার করা। বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায় মোঘল সম্রাটের অধীন। শুভসিংহের মতে সে কারণেই সে দেশের শত্রু। শুভসিংহের বাসনা প্রজাবিদ্রোহ ঘটিয়ে সে কৃষ্ণরামের কোষাগার লুঠ করবে এবং সেই অর্থে অস্ত্র ও সৈন্য সংগ্রহ করে দিল্লী আক্রমণ করবে। এদিকে কৃষ্ণরাম রায়ের কন্যা স্বপ্নময়ী শুভসিংহকে সত্যিকারের দেবতা বলে ভুল করে। শুভসিংহ তাকে বোঝায় যে তোমার বাবা দেশের শত্রু তাই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তার কোষাগার লুঠ করতে হবে। স্বপ্নময়ীর মনে দ্বন্দ্বের সুত্রপাত হয়, তারপরও একদিন তারই নেতৃত্বে শুভসিংহ ও সূরজমল কিছু বিদ্রোহী নিয়ে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। কিন্তু কৃষ্ণরাম ও তার পুত্র জগৎরায় শুভসিংহকে চিনতে পারে। শুভসিংহ এতদিন মিথ্যা দেবতা সেজে থাকার গ্লানিতে ভুগছিল। আজ সে তার ছদ্মবেশ ত্যাগ করে।

এদিকে সূরজমল বিদ্রোহীদের নিয়ে প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দেয়। রাজার মৃত্যু হয় এবং শুভসিংহ আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা করে। স্বপ্নময়ী শুভসিংহকে মনে প্রাণে দেবতা বলে গ্রহণ করেছিল। যখন তার দেবতার ছদ্মবেশ খুলে গেল এবং সে আত্মহত্যা করল আর তার পিতা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করল তখন স্বপ্নময়ী এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে উন্মাদিনী হয়ে যায়।

'স্বপ্নময়ী নাটক'কে পুরোপুরি ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না। কল্পনার তীব্রতায় এ নাটক রোমান্টিকতা প্রাপ্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল মন্তব্য করেছেন—

> কৈলাসচন্দ্র সিংহের লেখা একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ থেকে রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর বউঠাকুরাণীর হাট উপন্যাস রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন, আমাদের ধারণা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উক্ত নাটিকার সূত্র তেমনি তাঁর অপর একটি প্রবন্ধ 'ক্ষিতিশ-বংশাবলী-চরিত' [ভারতী, ভাদ্র ১২৮৮। ১৯৭-২০৬] থেকে লাভ করেছিলেন। অবশ্য নাটকটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুবই সামান্য, ইতিহাসের একটি ক্ষীণ সূত্র অবলম্বন করে রোমান্টিক গীতি মুখর নাট্য রচনার প্রয়াসই এখানে সমধিক পরিলক্ষিত হয়।[৪৯]

'স্বপ্নময়ী'র ঐতিহাসিকতা প্রসঙ্গে অজিতকুমার ঘোষ একই মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, ''স্বপ্নময়ী'কে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় কি না সন্দেহ, কারণ ইতিহাসের পটভূমিকায় লিখিত হইলেও ইহা ঐতিহাসিক অতীত হইতে আমাদের দৃষ্টিকে বিসারিত করিয়া সামাজিক বর্তমানের উপর নিবদ্ধ করে।''[৫০] বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দেলনের চিত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রধান প্রেরণা হওয়ার কারণেই নাটকে ঐতিহাসিকতার সঙ্গে রোমান্টিক স্বদেশ প্রীতির মিশেল ঘটেছে। 'স্বপ্নময়ী' নাটকেও এই প্রেরণা কাজ করেছে।

'স্বপ্নময়ী নাটক'-এর কাহিনীতে এক বিশেষ তাৎপর্য যুক্ত হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। এই সময়কালের এই একটিমাত্র নাটক যেখানে শুধুই কাহিনীর উপস্থাপন না হয়ে কাহিনী গভীর কোন অর্থ প্রকাশের প্রয়াস নিয়েছে। মানুষের বাইরের রূপে মুগ্ধ হলে বিপর্যয় অনিবার্য। এই রূপমুগ্ধতার কারণেই 'স্বপ্নময়ী নাটকে' বিপর্যয়ের সূচনা। এই নাটকের কাহিনীর ইংগিতময়তা রবীন্দ্রনাটকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

'স্বপ্নময়ী নাটকে' দৃশ্যপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বাটী, রাজসভা, গ্রাম্যপথ, ঘাট, অরণ্য, রাজ প্রাসাদ, রাজবাটীর বহিরুদ্যান, উদ্যান, বন, সমুদ্রতীর।

চ. জীবন চরিত মূলক নাটক

'চৈতন্যলীলা'[৫১] (১৮৮৬)— গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নিমাই-এর জন্ম এবং তার সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করার বিষয় বস্তুকে নিয়ে লেখা হয়েছে 'চৈতন্যলীলা'। চার অঙ্কের এই নাটকটিতে সংলাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে গদ্য ও পদ্য ভাষা। নাটকটিতে সঙ্গীতের প্রয়োগ রয়েছে। 'চৈতন্যলীলা' প্রথম অভিনীত হয় ২ আগস্ট ১৮৮৪। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল নাটকটি। অমৃতলাল বসুর লেখা থেকে এই নাটকটির জনপ্রিয়তা অনুমান করা যায়। অমৃতলাল বসুর এই লেখাটির উল্লেখ করেছেন শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য। অমৃতলাল বসু লিখেছেন—

> নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল, গীতা ও চৈতন্য-চরিতের বিবিধ সংস্করণে দেশ ছাইয়া পড়িল। বিলাত-প্রত্যাগত বাঙালী সন্তানও লজ্জিত না হইয়া সগর্বে আপনাকে হিন্দু হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল।[৫২]

নাটকটিতে দৃশ্যপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে - পাপের সভা, বনপথ, চন্ডীমন্ডপ, বাটী, গঙ্গাতীর, কানন-পথ, বাটীর সম্মুখ, রাজপথ, প্রাঙ্গণ এবং পথ।

'বুদ্ধদেব চরিত'[৫৩] (১৮৮৭)— গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সিদ্ধার্থের জন্ম এবং সন্ন্যাস গ্রহণ এই নাটকের কাহিনী। গিরিশচন্দ্র এডুইন আরনল্ড (১৮৩২ - ১৯০৪) রচিত 'Light of Asia' নামক কাব্য গ্রন্থটি পাঠ করে 'বুদ্ধদেব চরিত' রচনা করেন। পাঁচ অঙ্কের পদ্যে লেখা এই নাটকটিতে সঙ্গীতের প্রয়োগ রয়েছে। বিদূষক ও সাধারণ মানুষের সংলাপে এসেছে গদ্য ভাষা। এই নাটকের ছাগবলি বন্ধের প্রসঙ্গটি রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের কথা স্মরণ করায়। বলি বন্ধের ক্ষেত্রে এই নাটকের প্রভাব তৎকালীন সমাজে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

> শিল্পরূপে 'বুদ্ধদেব চরিত' গিরিশচন্দ্রের রচিত সার্থক নাটকগুলির অন্যতম। এই নাটকের প্রভাব সমাজে কীভাবে পড়েছিল তার উল্লেখ করেছেন অবিনাশচন্দ্র তাঁর 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে: "শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্বে এই নাটকের অভিনয় দর্শনে বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের জীবহিংসায় এতদূর বিরাগ জন্মিয়াছিল যে, সেই বৎসর হইতেই তিনি তাঁহার বাটীতে "পূজায় বলিবন্ধ করেন এবং বলির নিমিত্ত সদ্যক্রীত ছাগগুলিকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।" (পৃ: ৩১১)।[৫৪]

দুই

১৮৮১ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে রচিত (রবীন্দ্রনাথ বাদে) উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির বিস্তারিত আলোচনার পর আমরা এই সময়ের নাট্য রচনার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারি। বিষয়বস্তু হিসেবে এই সময়ের নাটকে উঠে এসেছে ধর্ম, ইতিহাস ও সমাজ। পূর্বের পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণে নাটক রচনা করা হলেও এই সময় মনোমোহন বসু প্রবর্তিত গীতাভিনয়ের ধারাই মূল স্রোতধারা হয়ে উঠেছে। এই স্রোতধারা কি কারণে উৎসারিত হল এবং মনোমোহন বসুর প্রেরণা কোথা থেকে জাগ্রত হল সে প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই আলোকপাত করেছি। এই অংশে আমরা মিলিয়ে দেখতে চাই রবীন্দ্রনাট্য চর্চার প্রথমপর্যায়ে অন্যান্য নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাটকের সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য কোথায়।

বাংলা নাটকে গানের প্রয়োগ বাংলা নাটক রচনার সূচনালগ্ন থেকেই প্রত্যক্ষ করা যায়। যতই পাশ্চাত্য রীতির অনুকরণে বাংলা নাটকের উদ্ভব হয়ে থাকুক না কেন সঙ্গীতের প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা বাংলা যাত্রা পালারই স্পর্শ পেয়েছে। এই স্পর্শ হিন্দুমেলা এবং স্বাদেশিকতার হাওয়ায় মনোমোহন বসুর হাতে তীব্রতা লাভ করে। গীতাভিনয়ের প্রবর্তনা বলা যায় বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে এক দিক বদলের ইংগিত। এই বদলের প্রবাহমানতায় রবীন্দ্রনাথ বিচ্ছিন্ন নন। এখানে এসেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গীতাভিনয় ধারার নাট্যকাররা মিলে যান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই মিলে যাওয়া মানে আত্মবিসর্জন নয়। বরং, শঙ্খ ঘোষ যাকে বলেছেন 'আত্ম আবিষ্কার', যদিও তার জন্য সময় লেগেছে অনেকটাই। শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন—

> জনরুচিকে একদিক থেকে আরেক দিকে টান দেবার ইচ্ছা থেকেই কিছু যৌতুক দিতে হতো কখনো, গিরিশচন্দ্রদের তাই যাত্রা প্রভাবিত না হয়ে উপায় ছিল না। এই অর্থে যাত্রা অথবা সংস্কৃত নাটক এঁদের কাছে ছিল এমন এক বন্ধন, যাকে এড়িয়ে চলাই ছিল সমস্যা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে এটাই এল মুক্তি পন্থা হিসেবে। কেননা তিনি তো আত্মরক্ষার কারণে আনেন নি এর ব্যবহার, এনেছিলেন আত্ম-আবিষ্কারের জন্য।[৫৫]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মনোমোহন এবং গিরিশচন্দ্রদের এখানেই তফাৎ। কিন্তু তফাৎ থাকলেও সবারই নজর পড়েছিল গিয়ে যাত্রার দিকে এবং সবারই মৌল চিন্তা ছিল একই, তা হল নাটককে দেশীয় করণ করা।

মনোমোহন বসু গানের জন্য নজর দিলেন যাত্রার দিকে আর রবীন্দ্রনাথ নজর দিলেন যাত্রার মঞ্চ স্বাধীনতার দিকে এবং ১৩০৯-এ লিখলেন, ''আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐ জন্য ভালো লাগে।''[৫৬] এই ভাললাগার সূত্র ধরেই নাটকে গানের প্রয়োগের বিষয়টিও চলে আসে। এ প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে, ''মঞ্চ ও দৃশ্যের পরিকল্পনায় যাত্রার সমীপবর্তী হবার সঙ্গে সঙ্গে ওই একই অভিপ্রায় তাঁর নাটকে বয়ে আনে গান।''[৫৭]

নাটকে সঙ্গীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আনুকুল্য পেয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গীতের আবহাওয়ার। স্মরণ করা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে স্বর্ণকুমারী দেবী 'বসন্ত উৎসব' (১৮৭৯) নামে গীতিনাটক রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে পশুপতি শাশমল লিখেছেন—

> ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথের পূর্বে গীতিনাট্য রচনা করেন; স্বর্ণকুমারীর প্রথম গীতিনাট্য বসন্ত উৎসব (নভেম্বর ১৮৭৯) রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য বাল্মীকি-প্রতিভার (ফাল্গুন ১২৮৭) পূর্বেই রচিত।[৫৮]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও লিখেছেন 'মানময়ী' (১৮৮০) নামে একটি ছোট গীতিনাট্য। পরে ১৮৯৯-এ নাটকটির কলেবর বৃদ্ধি করে 'পুনর্বসন্ত' নামে প্রকাশ করা হয়। সুতরাং নাট্যরচনার সূচনা লগ্নেই রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করেছিল গীতাভিনয়ের ধারা এবং ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গীতের আবহাওয়া। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নাট্য বিষয়ের ক্ষেত্রে নাট্য রচনার সূচনালগ্ন থেকেই যেমন হয়ে পড়লেন স্বতন্ত্র তেমনি নাটকে সঙ্গীতের প্রয়োগের ক্ষেত্রে নাট্যচর্চার প্রথম পর্যায়ে তিনি কোন স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রাখতে পারেন নি। তাঁর পরিণত পর্যায়ের নাটকে সঙ্গীত যেমন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়ে উঠেছে, একাত্ম হয়ে গেছে নাট্যবিষয়ের সঙ্গে তেমনভাবে প্রথমপর্যায়ের নাটকে সঙ্গীত নাট্যবিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে নি। মনোমোহন বসু বা গিরিশচন্দ্ররা যেভাবে ব্যবহার করার কারণেই গানকে ব্যবহার করেছেন নাটকে তেমনি রবীন্দ্রনাটকের প্রথমপর্যায়ে গান দেখা দিয়েছে - শঙ্খঘোষের ভাষায় 'কুড়িয়ে-পাওয়া জিনিসের মতো'। তিনি লিখেছেন, ''অভ্যাসের প্রতাপ যে কতই ব্যাপক তা আমরা ধরতে পারি যখন দেখি রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রাথমিক নাট্য চর্চায় গানকে ব্যবহার করেন যেন কুড়িয়ে-পাওয়া জিনিসের মতো, ইতস্তত, অনেকটাই প্রথাসিদ্ধ ধরনে।''[৫৯] সুতরাং রবীন্দ্রনাট্য চর্চার প্রথম পর্যায়ের নাটকগুলির সঙ্গে অন্যান্য নাটকের প্রধান এবং মূলত: একমাত্র সাদৃশ্য রইল সঙ্গীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে আর অন্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরিভাবেই রইলেন স্বতন্ত্র। তবুও ছোট খাটো যে দু'একটি সাদৃশ্য আমাদের নজরে এসেছে তা আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাটকে সাধারণ জনতার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই জনতা চরিত্রের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। তারা ভীরু এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। রবীন্দ্র নাট্যচর্চার প্রথমপর্যায়ে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন' নাটকে এই জনতা চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই সময়ের অন্যান্য নাটকে সাধারণ জনতার উপস্থিতি থাকলেও তারা রবীন্দ্রনাটকের বিশিষ্ট জনতার মতো নয়। এই পর্যায়ের অন্যান্য নাটকে যেমন 'বৃষকেতু', 'যদুবংশ', 'বেল্লিক বাজার', 'স্বপ্নময়ী' ইত্যাদি নাটকে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি রয়েছে। কিন্তু একমাত্র 'স্বপ্নময়ী' নাটকের জনতা চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন' নাটকের জনতা চরিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। 'স্বপ্নময়ী' নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাধারণ জনতাকে চিহ্নিত করেছেন 'ইতরলোক' হিসেবে। এই 'ইতরলোক' ভীরু এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তারা শুভসিংহের দেবতার সাজকে খুব বিশ্ময় নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছে এবং তাদের অন্তরের কামনা-বাসনার কথা প্রকাশ করেছে এই মিথ্যা দেবতার কাছে। এ প্রসঙ্গে ভূদেব চৌধুরী যথার্থ মন্তব্য করেছেন, ''রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকে জনসাধারণের স্বভাব-বর্ণনায় তাদের সরলতা, অস্থির-চিত্ততা, পরমুখাপেক্ষিতা ইত্যাদি সহজ দুর্বলতা নিয়ে সস্নেহ কৌতুক করা হয়েছে। 'স্বপ্নময়ী'র 'ইতরলোক'-এর চিত্রনে এই রস প্রকরণের সার্থক পূর্বসূত্র লক্ষিত হয়ে থাকে।''[৬০]

রবীন্দ্র নাটকে 'পথ'-এর প্রয়োগ ভিন্ন তাৎপর্যে সমুজ্জল। এ প্রসঙ্গে আমরা ''রবীন্দ্রনাটকের প্রথমপর্যায়ে পরিণত পর্যায়ের বীজানুসন্ধান'' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দৃশ্যপটে পথের অনুষঙ্গ এই সময়ের অন্যান্য নাটকে দেখা যায়। কিন্তু 'পথ' কোন প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করতে পারেনি। যেমন 'স্বপ্নময়ী', 'বৃষকেতু', যদুবংশ ধ্বংস', 'বেল্লিক বাজার', 'নব-বাসর', হারানিধি' প্রায় প্রতিটি নাটকে দৃশ্যপট হিসেবে দেখা দিয়েছে 'পথ'। এইসব পথে নানা শ্রেনীর মানুষের উপস্থিতি দেখা যায়, যেমন রবীন্দ্রনাটকে পথের দৃশ্যপটে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি আমাদের নজরে আসে। কিন্তু রবীন্দ্রনাট্য চর্চার প্রথম পর্যায়ের কোন কোন নাটকে 'পথ' যেমন প্রতীকের পরমার্থত্ব লাভ করেছে তেমনি সেই সময়কালের বিভিন্ন নাটকে পথের অনুষঙ্গ এলেও 'পথ' শুধু পটভূমিই রয়ে গেছে প্রতীক হতে পারেনি অথবা সম্পৃক্ত হতে পারেনি নাট্যবিষয়ের সঙ্গে।

গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকের সঙ্গে 'বিসর্জন' নাটকের একটি জায়গায় সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। সাদৃশ্যটি হচ্ছে - বলি প্রথা বন্ধের ক্ষেত্রে। রাজা বিম্বিসা পুত্রসন্তান কামনায় যজ্ঞের আয়োজন করে। সেই যজ্ঞে ছাগ বলি দেওয়া হবে বলে এক রাখাল রাজার আদেশে তার ছাগ নিয়ে চলেছে যজ্ঞ স্থলে। রাখালের সঙ্গে সিদ্ধার্থের দেখা হয়। সিদ্ধার্থ রাখালের কাছে এই বলির কথা জানতে পেরে যজ্ঞস্থলে গিয়ে হাজির হয় এবং রাজাকে এই বলি বন্ধ করতে অনুরোধ করে। সিদ্ধার্থ রাজাকে বোঝাতে সক্ষম হয়

যে এই নিরীহ প্রাণী হত্যা করা উচিত নয়। রাজা বিম্বিসা সিদ্ধার্থের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে বলি বন্ধ করেন এবং তার রাজ্যে বলি নিষিদ্ধ করে দেন। এখানে লক্ষ করবার বিষয় যে দুটি নাটকেই ('বুদ্ধদেব চরিত' এবং 'বিসর্জন') ছাগবলির আয়োজন হয়েছে সন্তান কামনা থেকে। পার্থক্য শুধু 'বিসর্জন'-এ সন্তান কামনা করেছে 'রানী' আর 'বুদ্ধদেব চরিত'-এ রাজা।

রাধানাথ মিত্রের 'আশালতা' নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের সাদৃশ্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া মনোমোহন বসুর 'পার্থপরাজয়' নাটকের একটি দৃশ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র একটি দৃশ্যের সাদৃশ্য লক্ষ করা গেছে। 'পার্থপরাজয়' নাটকে অর্জুন ও বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জুন পক্ষের সৈন্য ঘ'নো ও র'নো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসে নিজেদের মধ্যে যে কথা বলে তা 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র শিকার থেকে পালিয়ে আসা দস্যুদের সংলাপকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা দু'টি নাটক থেকে কিছু সংলাপ উদ্ধৃত করছি —

ঘ'নো । তোর কপালে দুঃখ আছে, তা আমি কর্ব্বো কি? ব'ল্লুম "ছোঁড়া পালিয়ে আয়"—মদ্দানি করে তাল ঠুকে রণ ক'ত্তে গেলেন!—বড় নাকি বীরের বেটা বীর... ।

র'নো । আমি কি সাদে গ্যালাম, হয়গ্রীব খুড়ো গলাটিপে ব'ল্লে, পালাবি তো ম'র্ব্বি —ডেকে ব'লতি না'গ্‌লো, শুত্তি পেলিনে—যে পালাবে বের্ষোকেতু তারি কাটি ফেলাবে।

ঘ'নো । আ হাবা'তে। এও জানিসনে "নুকিয়ে খায়, শুকিয়ে যায়!" সে কতাতো সব্বাইকে ব'ল্লে, তবে অনেকে পালালো কেমন করে? আমি সরে এনু কি করে? ... ('পার্থপরাজয়' নাটক)

প্রথম দস্যু। প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছিরে, করবি এখন কী!
ওরে বরা, করবি এখন কী!
বাবারে, আমি চুপ করে এই কচুবনে লুকিয়ে থাকি। ...
(খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আর একজন দস্যুর প্রবেশ)।

অন্য দস্যু। বলব কী আর বলব খুড়ো — উঁ উঁ!
আমার যা হয়েছে বলি কার কাছে —
একটা বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে টুঁ।

প্রথম দস্যু। তখন যে ভারি ছিল জারি জুরি,
এখন কেন করছ বাপু উঁ উঁ উঁ —
কোনখানে লেগেছে বাবা, দিই একটু ফুঁ। (বাল্মীকি-প্রতিভা)

এই সাদৃশ্য গুলি হয়তো রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত সারেই দেখা দিয়েছে তাঁর নাটকে। অন্যান্য নাটকে যে পথের অনুষঙ্গ এসেছে, সাধারণ জনতা ভীড় করেছে নাট্য কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ হয়তো সেখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন নাটকে পথ এবং জনতা চরিত্রের প্রয়োগ ঘটাতে। যদিও রবীন্দ্রপ্রতিভায় 'পথ' পেল প্রতীকের পরমার্থতা এবং জনতা চরিত্র হয়ে উঠল রাবীন্দ্রিক বিশিষ্ট জনতা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্য রচনার শুরু থেকেই কখনো জনরুচির দিকে নজর রেখে নাটক রচনা করেননি কিন্তু অন্যান্য নাট্যকারদের মূল নজর ছিল জনরুচির দিকেই। রবীন্দ্রনাথ সূচনা লগ্ন থেকেই নাটক রচনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্রতা দেখা দিয়েছে pattern-এর দিক থেকে এবং বিষয় বস্তুর দিক থেকে। রবীন্দ্রসমকালে অন্যান্য নাট্যকর্মে বিষয়বস্তু প্রধানত তিন ভাবে ধরা দিয়েছে —

এক. ধর্মীয় মাহাত্ম্য প্রচার মূলক ।
দুই. সমাজ বিষয়ক।
তিন. ঐতিহাসিক ।

পুরাণের বিষয়বস্তু নিয়ে কাহিনী রচিত হলেও পুরাণ কালোপযোগী হয়নি অথবা হয়নি কালোত্তীর্ণ। পুরাণে বর্ণিত কাহিনী ঠিক যেন ফটোকপির মতো উঠে এসেছে নাটকে। এ কারণেই ধর্মীয় মাহাত্ম্য প্রচারই যেন এ সময়কার নাটকগুলির মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে অর্থাৎ ১৮৮১ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যা লিখলেন তা সমকালীন নাট্যচর্চার মূল স্রোত থেকে বিষয়গত দিক থেকে হয়ে পড়লো স্বতন্ত্র। তিনি সমকালীন নাট্য কাহিনীর কোন কিছুই গ্রহণ না করে কাহিনীতে নিয়ে এলেন দেশকাল হীন এক চিরকালীন ভাবসত্যের প্রকাশ। আমরা 'রবীন্দ্রনাট্যের অভিব্যক্তির ধারা' অধ্যায়ে এই কাহিনী বিন্যাসের বিশ্লেষণ করেছি। সেই বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে 'রুদ্রচন্ড' (১৮৮১) থেকে 'বিসর্জন' (১৮৯০) পর্যন্ত একই কাহিনী বিন্যাসের সম্প্রসারণ। যেখানে রয়েছে মানবিক উত্তরণের বিষয়, আত্মমুক্তির বিষয়, সর্বোপরি অশ্রুকুমার সিকদার যাকে বলেছেন ''বন্ধন থেকে মুক্তি।''[৬১] এখানে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে উত্থাপিত হতে পারে রবীন্দ্রনাথ কেন প্রচলিত প্রথায় নাট্য রচনায় মনোনিবেশ করলেন না? শুরুতেই কেন বিষয়গত দিক থেকে হয়ে পড়লেন স্বতন্ত্র? কোন অনুপ্রেরণা কাজ করছিল এর পিছনে? আমরা এ প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথ কবি ও নাট্যকার' এবং 'রবীন্দ্রনাটকের প্রথম পর্যায়ে পরিণত পর্যায়ের বীজানুসন্ধান' অধ্যায়ে আলোচনা

করেছি। সে আলোচনায় আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে রবীন্দ্রনাথের স্বকালে অন্যান্য নাটক থেকে রবীন্দ্রনাটক পৃথক হয়ে যাওয়ার পিছনে কাজ করেছে গীতিকবির আত্মোপলব্ধির প্রবণতা। এই আত্মোপলব্ধির কারণেই নাট্যকাহিনীতে সৃজন হয়েছে আত্মমুক্তির কথা। কবির রোমান্টিক মনোভঙ্গিই ভিন্ন করে দিয়েছে অন্যান্য নাট্যকারদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাট্য-পথের। সে পথ চিরকালীন, স্থান এবং কালের গন্ডী অতিক্রম করা এক idea-র প্রকাশ।

নির্দেশিকা

১. বসু, বিষ্ণু , *বাংলা নাট্যরীতি*, প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ ১৯৯৬, কলকাতা। পৃ: ১৩।

২. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খন্ড), আদিযুগ, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৮। এ, মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রা: লি: কলকাতা। পৃ: ১১৬।

৩. এই উদ্ধৃত অংশটি আশুতোষ ভট্টাচার্য-এর *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খন্ড), মধ্য যুগ, থেকে গৃহীত, ঐ, পৃ: ৯।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস*, ১৩৬৮। পৃ: ১৭-১৮।

৫. ঐ, পৃ: ১৮।

৬. *বান্ধব*, বৈশাখ, ১২৮৮।

৭. ঘোষ, অজিতকুমার, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাব্‌লিশার্স প্রা: লি:। কলকাতা। পঞ্চম সংস্করণ মার্চ ১৯৭০। পৃ: ১৫২।

৮. এই উদ্ধৃত অংশটি অজিতকুমার ঘোষ-এর *বাংলা নাটকের ইতিহাস গ্রন্থ* থেকে গৃহীত। পৃ: ১৫২।

৯. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খন্ড), মধ্যযুগ। পৃ: ৩১।

১০. মিত্র, ড: অরুণকুমার, *অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য*, নাভানা, কলকাতা। প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৭০। পৃ: ১৬৭।

১১. ঐ, পৃ: ২২৭।

১২. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খন্ড), মধ্যযুগ। পৃ: ৫৩ - ৫৪।

১৩. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (২য় খন্ড), ইস্টার্ণ পাব্‌লিশার্স, কলকাতা। সপ্তম সংস্করণ ১৯৮৬। পৃ: ৩৪১।

১৪. ঘোষ, অজিতকুমার, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*। পৃ: ১১৭।

১৫. বসু, শ্রী মনোমোহন, *পার্থপরাজয়*, দ্বিতীয় মুদ্রণ। ফাল্গুন ১২৯৩ সাল। কলিকাতা ৩৩ নং করন্‌ওয়ালিস স্ট্রীট, মধ্যস্থ যন্ত্রে বেঙ্গল পাবলিশিং কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১৬. ব্যবহৃত গ্রন্থটির প্রথম পৃষ্ঠা না থাকার কারণে এর প্রকাশনা সংস্থার নাম এবং সন-তারিখ পাওয়া যায় নি।

১৭. ঘোষ, গিরিশচন্দ্র, *সীতারবনবাস*, *গিরিশ রচনাবলী*—১ম খন্ড। সম্পাদনা ড: রথীন্দ্রনাথ রায় ও ড: দেবীপদ ভট্টাচার্য। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ - আগষ্ট ১৯৬৯।

১৮. ঘোষ, গিরিশচন্দ্র, বৃষকেতু *গিরিশ রচনাবলী*— ৪র্থ খন্ড। সম্পাদনা ড: দেবীপদ ভট্টাচার্য। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ - ১৯৭৪।

১৯. ভট্টাচার্য, ড: দেবীপদ, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ সাহিত্য সাধনা', *গিরিশ রচনাবলী*— ৪র্থ খন্ড। ঐ, পৃ: সতের।

২০. রায়, শ্রী রাজকৃষ্ণ, *যদুবংশ ধ্বংস*, ৯৭ নং কলেজ স্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রী গুরুদাস চট্টপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ৩৭ নং মেছুয়া বাজার স্ট্রীট বীণা যন্ত্রে শ্রী শরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ১২৯০।

২১. রায়, শ্রী রাজকৃষ্ণ, *তরণী সেন বধ*। ঐ, ১২৯১।

২২. ঘোষ, গিরিশচন্দ্র, *নল দময়ন্তী*, *গিরিশ রচনাবলী*—প্রথম খন্ড। ১৯৬৯।

২৩. ভট্টাচার্য, ড: দেবীপদ, *'গিরিশচন্দ্র ঘোষ সাহিত্য সাধনা'*, ঐ, পৃ: একচল্লিশ।

২৪. ঘোষ, গিরিশচন্দ্র, দক্ষযজ্ঞ, গিরিশ রচনাবলী—২য় খন্ড। সম্পাদনা - ড: দেবীপদ ভট্টাচার্য। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ - মে ১৯৭১।

২৫. ভট্টাচার্য, ড: দেবীপদ, ঐ, পৃ: একুশ।

২৬. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খন্ড), মধ্যযুগ। পৃ: ১৬৩।

২৭. *অমৃত গ্রন্থবলী* - চতুর্থ ভাগ। শ্রী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কত্তৃক প্রকাশিত, বসুমতী কার্য্যালয়। ১৩১৭।

২৮. মিত্র, ড: অরুণকুমার, *অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য*, নাভানা, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী ১৯৭০। পৃ: ২৪০।

২৯. বসু, অমৃতলাল, *বিবাহ-বিভ্রাট*, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ২০৩/১/১ করন্ওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। অষ্টম সংস্করণ।

৩০. মিত্র, ড: অরুণকুমার, *অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য*। পৃ: ২৪৩।

৩১. ঐ, পৃ: ২৪৪।

৩২. *জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলী* (চতুর্থ ভাগ), বসুমতি সাহিত্য মন্দির। শ্রী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট।

৩৩. ঘোষ, অজিতকুমার, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*। পৃ: ১৬৩।

৩৪. *গিরিশ রচনাবলী*—প্রথম খন্ড। সম্পাদনা - ড: ঁরথীন্দ্রনাথ রায় ও ড: দেবীপদ ভট্টাচার্য। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ - আগস্ট ১৯৬৯।

৩৫. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপদ, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ সাহিত্য সাধনা', ঐ, পৃ: তেতাল্লিশ।

৩৬. দাস, উপেন্দ্রনাথ, *দাদা ও আমি*, কলিকাতা বহুবাজার, শ্রীনাথ দাসের গলি, ১৭ নং ভবন, "সময়" কার্যালয়ে শ্রী অমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৯৫।

৩৭. বসু, অমৃতলাল, *তাজ্জব ব্যাপার*,কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ৭৯ নং করন্ওয়ালিস স্ট্রীট, ষ্টার থিয়েটার হইতে শ্রী অমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১২৯৭ সাল।

৩৮. ভট্টাচার্য, শ্রী দেবীপদ, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ সাহিত্য সাধনা', *গিরিশ রচনাবলী*—২য় খন্ড। পৃ: বাহান্ন।

৩৯. *গিরিশ রচনাবলী*—২য় খন্ড। ঐ।

৪০. ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, *বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস* -১ম খন্ড, মধ্যযুগ। পৃ: ১৬০।

৪১. ভট্টাচার্য, ড: দেবীপদ, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ সাহিত্য সাধনা', *গিরিশ রচনাবলী*—২য় খন্ড। পৃ: আটাশ।

৪২. *রাধানাথ গ্রন্থাবলী*, শ্রী রাধানাথ মিত্র প্রণীত। কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, "বসুমতি ইলেক্টো মেসিন যন্ত্রে" শ্রী পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৩১৯।

৪৩. ঐ।

৪৪. বসু, শ্রী মনোমোহন, *আনন্দময় নাটক*, কলিকাতা, বসু কোম্পানি কর্ত্তৃক ২৯/১ নং করন্ওয়ালিস স্ট্রীট, মনোমোহন লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। আষাঢ়, ১২৯৭।

৪৫. শীল, অধ্যাপক বৈদ্যনাথ, *বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা*, এ. কে. সরকার এ্যান্ড কোং, কলকাতা। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ । পৃ: ১৫২।

৪৬. *গিরিশ রচনাবলী*—২য় খন্ড।

৪৭. *জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলী* - পঞ্চম ভাগ, শ্রী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা। ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, বসুমতি সাহিত্য মন্দির।

৪৮. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯০। পৃ: ১৩৪।

৪৯. ঐ, পৃ: ১৩৩।

৫০. ঘোষ, অজিতকুমার, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*। পৃ: ১৫৯।

৫১. *গিরিশ রচনাবলী*—২য় খন্ড।

৫২. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপদ, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ: সাহিত্য সাধনা', *গিরিশ রচনাবলী*—২য় খন্ড, পৃ: তেতাল্লিশ।

৫৩. *গিরিশ রচনাবলী*—২য় খন্ড, ঐ।

৫৪. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপদ, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ: সাহিত্য সাধনা', *গিরিশ রচনাবলী*—২য় খন্ড, পৃ: ছত্রিশ।

৫৫. ঘোষ, শঙ্খ, 'নাট্যমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ', *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৫ । পৃ: ১৫।

৫৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রঙ্গমঞ্চ', *বিচিত্র প্রবন্ধ*, *রবীন্দ্ররচনাবলী* - চতুর্দ্দশ খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ । পৃ: ৭৪৪।

৫৭. ঘোষ, শঙ্খ, 'নাটকে গান', *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক*, দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৫ । পৃ: ১৩৪।

৫৮. শাশমল, পশুপতি, *স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য*, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৭৮। পৃ:৩০১।

৫৯. ঘোষ, শঙ্খ, 'নাটকে গান', *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক*। পৃ: ১৩৩।

৬০. চৌধুরী, শ্রী ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*, [দ্বিতীয় পর্যায়], বুকল্যান্ড প্রা: লি: কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৪ । পৃ: ৪৯৭।

৬১. "রবীন্দ্রনাট্যে প্রধান বিষয় বন্ধন থেকে মুক্তি।" - অশ্রুকুমার সিকদার, *রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য*, প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৩। কোলকাতা। পৃ: ২০৯।

উপসংহার

আমরা রবীন্দ্রনাট্যের প্রথম পর্যায়ের বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল প্রথম পর্যায়ের নাটকগুলিতে পরিণত নাট্যের বীজানুসন্ধান। অনুসন্ধানে অপরিণতির মধ্যেও পরিণতির আভাস লক্ষ করা গেছে। এই আভাস নাটকগুলির Content এবং Form দুই-এর মধ্যেই আমরা পেয়েছি। কবি রবীন্দ্রনাথ এবং নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ-এর মধ্যে যোগ সূত্রের বিষয়টির প্রতিও আমরা আলোকপাত করেছি। এ ছাড়াও প্রথম পর্যায়ের নাট্য রচনার সমকালে অন্যান্য নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোথাও কোন যোগসূত্র রয়েছে কিনা তার সন্ধান করেছি।

রবীন্দ্রনাট্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে দু'টি বিপরীত ভাবের মধ্যে। একদিকে অবরুদ্ধতা আর একদিকে মুক্তি, একদিকে অসত্যের অন্ধকার আর একদিকে সত্যের আলো। এই দুই বিরুদ্ধ বিষয়ের উপস্থাপনার মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের মানুষকে সত্যরূপে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। বন্ধন-মুক্তি, আত্ম-অবরুদ্ধতার বাতাবরণ ছিন্ন করা এবং অহং-এর সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসা এসবই হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাট্যের প্রধান বিষয়। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে রাজ্যটাই রাজা প্রতাপাদিত্যের বন্ধন হয়ে দেখা দিয়েছিল। ধনঞ্জয় বৈরাগী যখন তাকে বুঝিয়ে দিল যে, 'মহারাজ রাজ্যটাও তো রাস্তা' তখনই প্রতাপাদিত্যের বন্ধন গেল খসে। 'রাজা' নাটকের সুদর্শনাও বন্দীছিল বাইরের রূপসৌন্দর্য-মোহের আবরণে। এ কারণেই তার মুক্তিলাভ ঘটেনি। মোহ ঘুঁচে যাওয়ার পর ধূলোমাটির রাস্তায় নেমে এসে তার আত্ম-মুক্তি ঘটলো, দেখা মিললো রাজার। 'রক্তকরবী' নাটকে রাজা তার জালের আবরণ খুলে একদিন বাইরে বেরিয়ে এল। 'অচলায়তন'-এ প্রাচীন বিশ্বাসের দেয়াল গেল ভেঙে। 'মুক্তধারা', 'ডাকঘর' নাটকেও উঠে এলো মুক্তির কথা এবং মানুষকে তার সত্যরূপে পৌঁছে দেওয়ার কথা।

রবীন্দ্রনাট্যের এই ভাবচেতনার কথা আমরা তাঁর প্রথম পর্বের নাটকগুলিতে লক্ষ করেছি। 'রুদ্রচন্ড' থেকে 'বিসর্জন' পর্যন্ত প্রতিটি নাটকেই উঠে এসেছে অবরুদ্ধতা এবং অহং-এর গন্ডি থেকে উত্তরণের কথা। এই আত্ম-মুক্তির ঈষৎ আভাস সে সময়ের কাহিনী কাব্যগুলির মধ্যেও লক্ষ করা গেছে। 'রুদ্রচন্ড' নাটকে পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে রুদ্রচন্ডের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির অবসান ঘটলে তার অন্তরে ফুটে ওঠে

পিতৃত্বের আলো। রুদ্রচন্ডের ক্ষুদ্র অহং-এর আবরণ যায় খসে। 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় প্রকাশ পেয়েছে বাল্মীকির মানবিকতায় উত্তরণের কথা। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ দেখা দিয়েছে আত্ম-অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তির কথা। সন্ন্যাসীকে একদিন তার আবরণ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। 'মায়ার খেলা'ও বন্ধনমুক্তির নাটক। এই মুক্তি আত্মসুখের অবরুদ্ধতা থেকে। 'রাজা ও রানী'তেও দেখা দিয়েছে আত্ম-নিমগ্নতার বন্ধনের কথা এবং তার থেকে রাজা বিক্রমদেবের উত্তরণের কথা। 'বিসর্জন'-এর রঘুপতি আবদ্ধ ছিল তার অন্ধবিশ্বাস এবং প্রথাবদ্ধতার দেওয়ালে। সে দেওয়ালও একদিন গেল ভেঙে। রঘুপতির উত্তরণ হ'ল সত্যালোকে। সুতরাং রবীন্দ্রনাট্যের পরিণত পর্যায়ে যে ভাবচেতনার সন্ধান পাওয়া যায় তার প্রকাশ আমরা প্রথম পর্বের নাটকগুলিতে প্রত্যক্ষ করি। হয়তো এই ভাবচেতনা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হতে পারে নি। তবু তা পরিণত পর্যায়ের নাট্যবীজরূপে এখানে নিহিত আছে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্য pattern-এর মধ্যে লোক ঐতিহ্যের চিহ্ন লক্ষ করা গেছে। গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ তাদের সরলতা, হাসি-ঠাট্টা নিয়ে নাটকে দেখা দিয়েছে। দেখা দিয়েছে গানের দল, বাউল সন্ন্যাসী। 'পথ' দেখা দিয়েছে কখনো পটভূমি, কখনো প্রতীক, কখনো বিষয়বস্তু হিসেবে। Pattern-এর সামগ্রিক উপস্থাপন আমরা প্রথম পর্বের নাটকগুলিতে লক্ষ না করলেও কিছু কিছু বীজ-এর সন্ধান পেয়েছি। প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতা শুদ্ধ দেখা দিয়েছে মানুষ, 'পথ'-এর বৈচিত্রময় প্রয়োগ এসেছে এবং এসেছে তাঁরই পরিণত নাটকের বিশিষ্ট জনতা চরিত্রের উপস্থাপনা। বিশেষ করে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নাট্যরীতির পরিচয় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। 'পথ'-এর প্রতীকী প্রয়োগ, গ্রামবাংলার সাধারণ জনতার উপস্থিতি এ সবেরই প্রকাশ আমাদের ধারণায় 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া 'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন'-এ জনতা চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। 'বাল্মীকি প্রতিভা' এবং 'কালমৃগয়া'র মধ্যে লোকপালার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

কবি রবীন্দ্রনাথ এবং নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোথাও কি কোন যোগ রয়েছে? প্রথম পর্যায়ের নাটক ও কাব্যগুলি আলোচনা করে আমরা এই ঐক্যের ভিত্তি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি। আমাদের মনে হয়েছে কবি জীবনের একই ভাবনা থেকে উঠে এসেছে আত্ম-মুক্তির বিষয়টি। অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তি - এ ভাবনা একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে কাব্যে ও নাট্যে। রবীন্দ্রজীবনী পাঠে জানা যায় সাহিত্য সৃষ্টির এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত এক দুঃখময়তার আবরণে আচ্ছন্ন ছিল। চিত্তের অবরুদ্ধতা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি প্রতিয়িত সংগ্রাম করেছিলেন। কবিচিত্তের এই অবরুদ্ধ যন্ত্রণার কথাই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সে সময়ে রচিত কাব্যে। 'শৈশব সংগীত' থেকে 'প্রভাত সংগীত' পর্যন্ত এই যন্ত্রণা এবং তার থেকে উত্তরণের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে আছে। নাটকেও উঠে এসেছে এই অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তিরই কথা। একাকীত্ব থেকে সংযোগের

দিকে, অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তির দিকে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে অভিযানের কথাই কবি রবীন্দ্রনাথ এবং নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করে গেছেন। নাট্যচরিত্রের কাঠামোয় যা দৃশ্যমান তাই গীতিকবির আত্মগত উচ্চারণে প্রকাশিত। একই বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার কারণে উপমা বা ইমেজও কখনো কখনো হয়ে পড়েছে একই রকম।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ধারার সূচনা করেছেন। সমকালীন নাট্যকারদের সঙ্গে তাঁর কোন যোগ নেই। রবীন্দ্রনাট্য চর্চার প্রথম পর্যায়েও এই স্বাতন্ত্র্য পরিষ্কার ভাবে দেখা দিয়েছে। প্রথম পর্যায়েও সমকালীন নাট্য চর্চার সঙ্গে রবীন্দ্রনাটকের কোন যোগসূত্র ধরা পড়ে নি। এই সময়কার অন্যান্য নাটকের বিষয়বস্তুকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়। এক. ধর্মীয় মাহাত্ম্য প্রচার মূলক, দুই. সমাজ বিষয়ক, তিন. ঐতিহাসিক। পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক রচিত হলেও পুরাণ হয় নি কালোপযোগী অথবা কালোত্তীর্ণ। ধর্মীয় মাহাত্ম্য প্রচারই হয়ে উঠেছে এ সময়ের নাট্য চর্চার প্রধান অবলম্বন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ যা লিখলেন বিষয়গত দিক থেকে হয়ে পড়লো পুরোপুরিভাবে স্বতন্ত্র। কেন এই স্বতন্ত্রতা? আমাদের ধারনা গীতিকবির আত্মোপলব্ধির প্রবণতার কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্য বিষয়কে স্বতন্ত্র করতে পেরেছিলেন। বিষয়বস্তুতে তাই দেখা দিয়েছে মানুষের চিরকালীন আত্মিক সমস্যার কথা। সে জন্যই মনে হয় রবীন্দ্রনাট্য সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয় নেবার ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম পর্বের নাটকগুলির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কি ভাবে প্রস্তুত হলেন রবীন্দ্রনাথ, কি ভাবে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের হাতে সৃষ্টি হলো স্বতন্ত্র ধারার নাট্যকোরক, কি ভাবে সাধিত হল ক্রমিক উত্তরণ তার পরিচয় রবীন্দ্রনাট্য সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ের নাটকগুলির মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

অবশ্য আমাদের এই চর্চা কেবল পরিণত পর্যায়ের নাটকে পৌঁছানোর প্রথম আভাস কি ভাবে ফুটে উঠলো তা দেখা। রবীন্দ্রনাথের নিজস্বধারার নাটকে পৌঁছাতে এখনও বেশ কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। এ কেবল তাঁর নাটকে পৌঁছানোর প্রস্তুতিপর্বেরই বিশ্লেষণ। পরিণত নাটক যে ভাবচেতনা থেকে গড়ে উঠেছে—কিভাবে রবীন্দ্রনাথ কাব্যে ও নাটকে প্রস্তুত হচ্ছেন তাঁর সেই বিশিষ্ট ভাবাদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে—এখানে আমরা তারই আভাস ধরবার চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থপঞ্জী

প্রাথমিক উৎস

অমৃত গ্রন্থাবলী - চতুর্থভাগ, বসুমতি কার্যালয়। ১৩১৭।

আনন্দময় নাটক, শ্রী মনোমোহন বসু, মনোমোহন লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, কলিকাতা। আষাঢ়, ১২৯৭।

গিরিশ রচনাবলী, ১ থেকে ৪ খন্ড। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলী - চতুর্থ ও পঞ্চমভাগ, বসুমতি সাহিত্য মন্দির। কলিকাতা।

তরণীসেন বধ, শ্রী রাজকৃষ্ণ রায়, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী। কলকাতা। ১২৯১।

তাজ্জব ব্যাপার, অমৃতলাল বসু, ৭৯ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১২৯৭ সাল।

দাদা ও আমি, উপেন্দ্রনাথ দাস, "সময়" কার্যালয়ে শ্রী অমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত, কলিকাতা। সন ১২৯৫।

পার্থ পরাজয়, শ্রী মনোমোহন বসু, বেঙ্গল পাবলিশিং, কলকাতা। ফাল্গুণ ১২৯৩ সাল।

বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), প্রথম তুলিকলম সংস্করণ নববর্ষ ১৯৮৬। কলকাতা।

বিবাহ-বিভ্রাট, অমৃতলাল বসু, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা। অষ্টম সংস্করণ।

বিহারীলাল কাব্য সংগ্রহ, সম্পাদনা: রতন সিদ্দিকী, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ঢাকা। প্রকাশ কাল বইমেলা ১৯৯৭।

যদুবংশ ধ্বংস, শ্রী রাজকৃষ্ণ রায়, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী। কলকাতা।১২৯০।

রবীন্দ্র গ্রন্থ সূচী, স্বপন মজুমদার, প্রকাশ শ্রাবণ ২২, ১৩৯৫। কলকাতা।

রবীন্দ্র রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ থেকে ৩০ খন্ড। বিশ্বভারতী প্রকাশিত।

রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ থেকে ১৫ খন্ড। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

রাধানাথ গ্রন্থাবলী, শ্রী পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলিকাতা। ১৩১৯।

রামের বনবাস, রাজকৃষ্ণ রায়, গ্রন্থটির প্রথম পৃষ্ঠা না থাকার কারণে ঐর প্রকাশনা সংস্থার নাম এবং সন-তারিখ দেওয়া গেল না।

স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাবলী, সম্পাদনা শ্রীমতী বাণী রায়, রামায়ণী প্রকাশ ভবন। কলকাতা। ১ম প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৩৮৪।

সহায়ক গ্রন্থ (বাংলা)

অ

অ[illegible]ন্দ্র চৌধুরী, *বাঙালীর নাট্য চর্চা*, প্রথম প্রকাশ শুভ মহালয়া, ১৩৭৯।

অজিতকুমার চক্রবর্তী, *রবীন্দ্রনাথ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৯১।

অজিতকুমার চক্রবর্তী, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা। সংস্করণ ৬ মাঘ ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।

অজিতকুমার চক্রবর্তী, *রবীন্দ্রনাথ (কাব্যগ্রন্থ পাঠের ভূমিকা)* ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১৯।

অজিতকুমার চক্রবর্তী, *রবীন্দ্রসাহিত্যের চার ভুবনের কিনারে*, প্রকাশ ৭ অক্টোবর ১৯৮৯।

অবন্তীকুমার সান্যাল, *প্রাচীন নাট্য প্রসঙ্গ*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৭৭।

শ্রী অব[illegible]নাথ ঠাকুর/ শ্রীমতী রাণী চন্দ, *ঘরোয়া*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৯৮।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *নানা রবীন্দ্রনাথ*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা। দ্বিতীয় মুদ্রণ, আশ্বিন ১৩৮৯।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *অন্যোন্য দর্শন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ*, ক্লাসিক প্রেস, ৩/১ এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশ কার্তিক ১৩৭৮।

অন্নদাশঙ্কর রায়, *রবীন্দ্রনাথ*, ডি, এম লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬২।

অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত, *সুন্দরের অভ্যর্থনা*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রকাশ: ২৭ নভে: ১৯৯৭।

অরবিন্দ পোদ্দার, *রবীন্দ্র মানস*, ইন্ডিয়ানা, কলকাতা। ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭।

অশোক কুন্ডু সম্পাদিত, *বঙ্কিম মৃত্যুবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ*, দি নিউ বুক স্টল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ৯ মে ১৯৯৪।

অশ্রুকুমার সিকদার, *রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা। প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯৩।

অজিতকুমার ঘোষ, *নাটকের কথা*, সাহিত্যলোক, কলকাতা। পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯৬।

অবন্তীকুমার সান্যাল, *কবির অভিনয়*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশ: ২৫ শে ডিসেম্বর ১৯৯৬।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ*-১ম খন্ড, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৭৬।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ*-২য় খন্ড, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৮০।

অমিয়কুমার সেন, *প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ২২ শ্রাবণ ১৩৬৮।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, *কবিগুরু (রবীন্দ্র-কাব্যের মূলসূত্র)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, রাসপূর্ণিমা ১৪০৩।

অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলার লোকনাট্য যাত্রা ও সাতটি রবীন্দ্র নাটক*, তুলনামুলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশ: ১৩৯৪।

অশোক রুদ্র, *হে বন্ধু হে প্রিয়*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা। প্রথম সংস্করণ, ২৫শে বৈশাখ ১৩৯৪।

অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ মার্চ ১৯৭০।

ড: অরুণকুমার মিত্র, *অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য*, নাভানা, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৭০।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতি কাব্য*, প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭, কলকাতা।

অশ্রুকুমার সিকদার, *বাক্যের সৃষ্টি: রবীন্দ্রনাথ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮১।

অরবিন্দ পোদ্দার, *রবীন্দ্রনাথ/ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব*, উচ্চারণ, কলকাতা, আগস্ট ১৯৮৮।

আ

আদ্য রঙ্গাচার্য, *ভারতীয় থিয়েটার*, ন্যাশনাল বুক-ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ১৯৭৫।

আবু সয়ীদ আইয়ুব, *পথের শেষ কোথায়*, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ: অক্টোবর ১৯৯২।

আবু সয়ীদ আইয়ুব, *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: এপ্রিল ১৯৯৫।

আবু সয়ীদ আইয়ুব, *পান্থজনের সখা*, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ১৯৮৪।

আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১ম খন্ড), এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা: লি: কলকাতা, ৩য় সংস্করণ ১৯৬৮।

আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, *দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার, ঢাকা। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫।

আলপনা রায়, *আলাপ থেকে বিস্তার*, প্যাপিরাস, কলকাতা। বৈশাখ ১৩৯৯।

আলী আনোয়ার, *আধুনিক ইউরোপীয় নাটক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৮৫।

ই

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, *রবীন্দ্র স্মৃতি*, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৯৬।

উ

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ - বৈশাখ ১৩৬১।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, *রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির উজ্জ্বল স্রোতে*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা। প্রথম সংস্করণ, ১ বৈশাখ ১৪০০।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পাদিত, *রাতের তারা দিনের রবি*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা। প্রথম সংস্করণ, ১ বৈশাখ ১৩৯৫।

ক

কমলকুমার সান্যাল, *বাংলা নাটক সমীক্ষা*, বর্ণালী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: আগস্ট ১৯৭৬।

কাজী আব্দুল ওদুদ, *কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ*, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রা: লি:, কলকাতা। ৭ই আষাঢ়, ১৮৮৪ শকাব্দ।

কাজী আব্দুল ওদুদ, *রবীন্দ্র কাব্য পাঠ*, মোসলেম পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৩৩৪।

কুমার রায়, *নাট্য ভবিতব্য ও রবীন্দ্রনাথ*, এপ্রিল ১৯৮৭।

গ

ড: গৌরী শংকর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১লা অক্টোবর ১৯৭২।

জ

জ্যোতির্ময় ঘোষ, *রবীন্দ্র মনন ও সৃষ্টিলোক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৯৮।

ড: জলি সেনগুপ্ত, *রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রথম পর্যায়*, সাহিত্য লোক, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৮৯।

জীবনকৃষ্ণ শেঠ, *রবীন্দ্র নাটক প্রসঙ্গ*, প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৬৩।

দ

দেব নারায়ণ গুপ্ত, *একশো বছরের নাট্য প্রসঙ্গ*, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৮৯।

শ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রচর্যা*, জেনারেল, কলকাতা, ১৯৭৩।

ন

নীহাররঞ্জন রায়, *রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা। পঞ্চম সংস্করণ ২২ শে শ্রাবণ ১৩৬৯।

নিমাইচন্দ্র পাল, *রবীন্দ্র নাটকে আঙ্গিক রূপক সাংকেতিক*, রত্নাবলী, কলকাতা। ১ বৈশাখ ১৩৯৪।

পশুপতি শাশমল, *স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য*, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৭৮।

পবিত্র সরকার, *নাট্যমঞ্চ নাট্যকলা*, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, ১ বৈশাখ ১৩৯৭।

পম্পা মজুমদার, *রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৬ জুলাই ১৯৭২।

প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ (পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ)*, ১৫ আগস্ট ১৯৬৬।

পূর্ণেন্দু পত্রী, *রবীন্দ্রনাথের শেকস্‌পীয়র*, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রা: লি:, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ বইমেলা, জানুয়ারী ১৯৯৩।

প্রবোধচন্দ্র সেন, *ভোরের পাখী ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, সম্পাদনা - গার্গী দত্ত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৮।

প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা। তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৮১।

শ্রী প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্র-সাহিত্য-বিচিত্রা*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৭৪।

প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী - প্রথম খন্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ পৌষ ১৪০০।

প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী - দ্বিতীয় খন্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা। জানুয়ারি ১৯৯০।

প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী - তৃতীয় খন্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা। ১ লা বৈশাখ ১৩৯৪।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবিজীবনী - প্রথম খন্ড*, বিশ্বভারতী, পুনর্‌মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৯২।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবিজীবনী - ২য় খন্ড*, বিশ্বভারতী, পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ চৈত্র ১৩৮৩।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবিজীবনী - ৩য় খন্ড*, বিশ্বভারতী, পুনর্‌মুদ্রণ আষাঢ় ১৪০৩।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবিজীবনী - ৪র্থ খন্ড*, বিশ্বভারতী, ৩য় সংস্করণ আষাঢ় ১৪০১।

পুলিন দাস, *মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ ২৫ শে বৈশাখ ১৩৯৮।

শ্রী পুলিন বিহারী সেন সম্পাদিত, *রবীন্দ্রায়ণ (১ম খন্ড)*, বাক্-সাহিত্য,কলিকাতা, সংস্করণ মাঘ ১৩৭২।

প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস, *রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বসাহিত্য*, কথাশিল্প, কলকাতা। সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯।

ব

বুদ্ধদেব বসু, *কবি রবীন্দ্রনাথ*, দে'জ সংস্করণ, কলকাতা। নভেম্বর ১৯৮০।

বুদ্ধদেব বসু, *সঙ্গ: নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৬৩।

বিষ্ণু বসু, *রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার*, প্রতিভাস, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৮৭।

বিষ্ণু বসু, *বাংলা নাট্যরীতি*, পুনশ্চ, কলকাতা, বইমেলা ১৯৯৬।

শ্রী বিজন বিহারী সম্পাদিত, *রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা* — প্রথম খন্ড, নভেম্বর ১৯৬৫,

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস*, ১৩৬৮।

অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীল, *বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা*, এ. কে. সরকার এ্যান্ড কোং, কলকাতা, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ।

বার্ণিক রায়, *রবীন্দ্রনাটকের উৎস*, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭ ডিসেম্বর, কলকাতা।

ভ

শ্রী ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (দ্বিতীয় পর্যায়)*, বুকল্যান্ড প্রা: লি:, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৪।

শ্রী ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের ইতিকথা (প্রথম পর্ব)*, প্রথম প্রকাশ: আষাঢ়, ১৮৯২ শকাব্দ।

শ্রী ভূদেব চৌধুরী, *রবীন্দ্র ভাবনা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৬।

ম

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, *আত্মজীবনী, সম্পাদনা — অরবিন্দ মিত্র*, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৬২।

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার, *কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য (১ম খন্ড)*, প্রথম সংস্করণ ১৩৫৯।

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার, *কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য (২ম খন্ড)*, প্রথম সংস্করণ ১৩৬০।

মৈত্রেয়ী মিত্র, *দ্বিজেন্দ্রনাথ মন ও শিল্প*, প্রকাশ: বৈশাখ ১৩৮৮।

র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ*, বিশ্বভরতী, পুনর্মুদ্রণ চৈত্র ১৩৯৫।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পিতৃস্মৃতি* জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন (প্রা:) লি: কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ মহালয়া ১৪০০।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি* বিশ্বভরতী, পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪০১।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, বিশ্বভরতী, অগ্রহায়ণ ১৩৯৯।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মপরিচয়*, বিশ্বভরতী, সংস্করণ ১৪০০।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র - ৮*, বিশ্বভরতী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র - ১১*, প্রকাশ আষাঢ় ১৩৮৯। বিশ্বভরতী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্ন পত্রাবলী*, নূতন সংস্করণ চৈত্র১৩৯৯। বিশ্বভরতী।

রশীদুল আলম, *রবীন্দ্রকাব্যে আমির ক্রম বিকাশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৮৮।

রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, *রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ/ সমকালীন প্রতিক্রিয়া*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা। প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৯৫।

রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, *সাধারণ রঙ্গালয় ও রবীন্দ্রনাথ*, বিশ্বভরতী, শ্রাবণ ১৪০৬।

শ

শান্তিকুমার দাসগুপ্ত, *রবীন্দ্রনাট্য পরিচয় (১ম খন্ড)*, বুকল্যান্ড প্রা: লি:, কলকাতা, ১ লা অক্টোবর ১৯৬৩।

ড: শান্তিকুমার দাসগুপ্ত, *ট্রাজেডি ও রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ ২৭ সেপ্টে : ১৯৮৫।

শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্র সংগীত বিচিত্রা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা। পঞ্চম মুদ্রণ এপ্রিল ১৯৯৭।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *ত্রয়ী/ বাল্মীকি কালিদাস রবীন্দ্রনাথ*, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১ লা বৈশাখ ১৩৯৬।

শিবনারায়ণ রায়, *রবীন্দ্রনাথ শেকস্‌পীয়র ও নক্ষত্র সংকেত*, প্যাপিরাস, কলকাতা। ২৩ জানুয়ারী ১৯৮৩।

শম্ভু মিত্র, *নাট্যভাষ* (আলপনা রায় সম্পাদিত), রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, ২২ আগস্ট ১৯৯৭।

শম্ভু মিত্র, *নাটক রক্তকরবী*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রা: লি:, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ১৯৯৫।

শঙ্খ ঘোষ, *এ আমির আবরণ*, প্যাপিরাস, কলকাতা। তৃতীয় সংস্করণ: জুন ১৯৯১।

শঙ্খ ঘোষ, *উর্বশীর হাসি*, প্যাপিরাস, কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ: আগস্ট ১৯৯৩।

শঙ্খ ঘোষ, *নির্মাণ আর সৃষ্টি*, প্যাপিরাস, কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ: ৩০ চৈত্র ১৩৯৯।

শঙ্খ ঘোষ, *কালের যাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। চতুর্থ সংস্করণ: ১৯৯৫।

শান্তনু কায়সার, *কাব্য নাটক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ৪ ডিসেম্বর ১৯৮৯।

শেখর সমাদ্দার, *নাট্যমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ*, প্যাপিরাস, কলকাতা। প্রকাশ: জানুয়ারী ১৯৯৮।

শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রর-সৃষ্টি-সমীক্ষা (২য় খন্ড)*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা। প্রথম সংস্করণ: ১৯৬৯।

শঙ্কর ভট্টাচার্য, *বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, আগস্ট ১৯৮২।

শেখর সমাদ্দার, *'বিসর্জন' রূপে, রূপান্তরে*, প্যাপিরাস, কলকাতা। প্রকাশ: জুন ১৯৯২।

শোভন সোম, *বিচিত্রের দূত*, অনুষ্টুপ, কলকাতা। আগস্ট ১৯৯২।

ড: শান্তিকুমার দাশগুপ্ত, *রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য*, বুকল্যান্ড প্রা: লি:, কলকাতা।

স

সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক*, সাহিত্য নিকেতন, কলকাতা, ১৩৮১।

শ্রী সজনীকান্ত দাস, *রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য*, শতাব্দী গ্রন্থভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - রথযাত্রা ১৩৬৭।

সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র সাহিত্যের আদিপর্ব*, এস গুপ্ত এন্ড ব্রাদার্স, কলিকাতা, ১৫ এপ্রিল ১৯৭৮।

শ্রী সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস - ২য় খন্ড*, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ৭ম সংস্করণ ১৩৮৬।

সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস - ৩য় খন্ড*, মর্ডান বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৩৫৩।

সোমেন্দ্রনাথ বসু, *রবীন্দ্রনাটকে ট্রাজেডী*, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, জুলাই ১৯৯৬।

ড: সাধনকুমার ভট্টাচার্য, *নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার ১ম খন্ড*, পুঁথিঘর, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৫৫।

সন্‌জীদা খাতুন, *অধরা মাধুরীর ছন্দোবন্ধন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, নভেম্বর ১৯৮৯।

শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, *রবীন্দ্রনাথ*, এ, মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রা: লি:, কলকাতা, নববর্ষ ১৩৯৩।

সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস - চতুর্থ খন্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলিকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৬।

ড: সুশীলকুমার গুপ্ত, *রবীন্দ্রনাট্য প্রসঙ্গ: কাব্যনাটক*, প্রকাশকাল ১৩৬৮।

সৌমিত্র বসু, *রবীন্দ্র নাটকের নির্মাণ শৈলী: উনিশ শতক*, প্রথম প্রকাশ ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৯৩।

সুশীল রায়, *জ্যোতিরিন্দ্রনাথ*, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা। এপ্রিল ১৯৬৩।

স্বপন মজুমদার, *রবীন্দ্র গ্রন্থসূচী*, শ্রাবণ ২২, ১৩৯৫।

শ্রী সনৎকুমার মিত্র, *শেক্‌স্‌পীয়র ও বাংলা নাটক*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা। ১৩৯০।

হ

হুমায়ুন আজাদ, *বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময়*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা। ২৮ এপ্রিল ১৯৯৭।

ক্ষ

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস, *রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়*, ৭ই পৌষ ১৮৮৮।

সহায়ক গ্রন্থ (ইংরাজী)

A Comprehensive History of India. Volume Five. The Delhi Sultanat (A.D.1206 - 1526). August 1970.

Tripathi, Dr. R. S. *History of Kanauj*. First Edition - 1937.

Rabindranath Tagore - A Centenary Volume. 1861 - 1961. Sahitya Akademi.

Dent J. Edward.*Opera.* Penguin 1949.

Kripalini, Krishna. *Rabindranath Tagore A biography.* Visva-Bharati. Calcutta. Second Revised edition. Nov. 1980.

Kripalini, Krishna. *Victoria Ocampo* - Tagore Research Institute. Calcutta. Second edition March 1982.

Thompson, Edward .*Rabindranath Tagore Poet and Dramatist* - Second edition 1948. London.

The English Writing of Rabindranath Tagore vol - Two. Sahitya Academi - 1996.

Eliot, T. S., *On Poetry and Poets*, Faber & Faber. London 1969.

পত্রিকা (বাংলা)

বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন - ১৪০১।

বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন - ১৩৮৩।

বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫১।

বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন - ১৩৬৮।

বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৮৭৯ শক।

বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫৭।

প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩২৯।

প্রবাসী, বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৪৭।

প্রবাসী, কার্তিক-চৈত্র, ১৩৪৭।

প্রবাসী, বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৪৮।

প্রবাসী, কার্তিক-চৈত্র, ১৩৪৮।

প্রবাসী, বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৪৯।

প্রবাসী, ফাল্গুণ, ১৩৪৯।

রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি সাহিত্যপত্র, ২৫ শে বৈশাখ, ১৩৮৮, কলকাতা।

ভারতী, কার্তিক, ১২৮৫।

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮।

গীতবিতান পত্রিকা, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮।

রবীন্দ্রচর্চা-২য় সংখ্যা ১৯৯৭, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা।

এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা ১৩৭২।

গ্রুপথিয়েটার পত্রিকা, রবীন্দ্রনাট্য সংখ্যা ১৯৮৭, কলকাতা।

দেশ পত্রিকা, ১৯ জুলাই, ১৯৫২, কলকাতা।

দেশ পত্রিকা, ১০ ভাদ্র, ১৩৫৬, কলকাতা।

জিজ্ঞাসা, ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৯৬, কলকাতা।

শনিবারের চিঠি, বৈশাখ, ১৩৬৭। কলকাতা।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি, রবীন্দ্র সংখ্যা, ১৩৮২। কলকাতা।

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কলকাতা।

পূর্ব্বাশা, ১৩৫৬। কলকাতা।

বহুরূপী, সংখ্যা ৬৫, ১লা মে ১৯৮৬। কলকাতা।

রবীন্দ্রবীক্ষা, সংকলন -১৩, শ্রাবণ ১৩৯২। বিশ্বভারতী।

নাট্য আকাদেমি পত্রিকা - ৩, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৩, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি।

নাট্য আকাদেমি পত্রিকা - ৫, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি। কলকাতা।

পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্র সংখ্যা, ১৪০২, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্র সংখ্যা, ১৪০৩।

পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্র সংখ্যা, ১৪০৫।

পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্র-স্মরণ সংখ্যা, ১৪০৬।

পশ্চিমবঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী রবীন্দ্র-স্মরণ সংখ্যা, ১৪০৭।

বান্ধব, আষাঢ়, ১২৮৮। কলকাতা।

পত্রিকা (ইংরাজী)

The Visva-Bharati Quarterly, Tagore Centenory Number.

The Visva-Bharati Quarterly, vol. 45, Number 1 and 2: May 1979 - Oct 1979.

The Modern Review, vol. XXXVII No. 4, April 1925.